

নিউ এজ প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৪
তৃতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক
সোমা প্রকাশন
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

॥ ভূমিকা ॥

বাল্যকাল হইতেই রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমার নিকট সুপরিচিত। লাহিড়ী মহাশয় আমার পূজ্যপাদ মাতামহ স্বর্গীয় হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কিছুদিন বাড়ীতে পড়িয়াছিলেন। কতদিন এবং কোন সময়ে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, সেই স্বল্পকাল মধ্যে আমার মাতামহ তাঁহার শিষ্যের এমন কিছু গুণ দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই : সর্ব্বদা তাঁহার প্রশংসা করিতেন। এইরূপে শৈশব হইতেই আমার পিতা মাতার মুখে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছি। উত্তরকালে বড় হইয়া ও কলিকাতাতে আসিয়া যত লোককে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তন্মধ্যে এই সাধু পুরুষ একজন। আমার প্রতি বিধাতার এই এক কৃপা যে, আমি যত মানুষকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, কোন না কোনও সূত্রে তাঁহাদের অধিকাংশকেই দেখিযাছি।

১৮৬৯ সালে যখন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, তখন যেমন চুম্বকে লৌহকে টানে, তেমনি তিনি আমাকে টানিয়া লইলেন। আমাকে একেবারে আপনার লোক করিয়া ফেলিলেন। তদবধি তাঁহার পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সকলেই আমাকে আত্মীয় বলিয়া লইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের সদাশয়তার প্রমাণ।

তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তাঁহার পুত্র শরৎকুমারও আমাকে সে বিষয়ে অনুরোধ করিলেন। গৃহে আসিয়া ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু অগ্রে ভাবিয়াছিলাম বিশেষ ভাবে তাঁহার অনুরক্ত ব্যক্তিগণের জন্য একখানি ক্ষুদ্রাকার জীবন-চরিত লিখিব। যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে কখনও কোনও লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রণী হন নাই, যাঁহাদের গুণাবলী বনজাত কুসুমের ন্যায় কেবলমাত্র কতিপয় হৃদয়কে আমোদিত করিয়াছে, যাঁহাদের জীবন ব্যাপ্তিতে বড় না হইয়া কেবলমাত্র গভীরতাতেই বড় ছিল, তাঁহাদের জীবন এই প্রকারেই লিখিত হওয়া ভাল ; কারণ সাধুতার রসাস্বাদন অনুরাগী মানুষেই করে, অপরে সেরূপ করে না ; যে কথা শুনিয়া বা যে কাজ দেখিয়া একজন মুগ্ধ হয়, অপরের নিকট তাহা হয় ত পাগলামি মাত্র। অতএব প্রথমে তদনুরাগী লোকদিগের জন্যই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে

মনে হইল, লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোদ্যমে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাগুরু তাঁহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি ঘটিয়াছে; এবং সেই প্রভাব এই সুদূর সময় পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে। আবার সেই উন্নতির স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয়া অত্যগ্রসর দলের সঙ্গে মিশিয়াছেন, এরূপ দুই একটি মাত্র মানুষ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় একজন। অতএব তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়া লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

ইহার আর একটু কারণও আছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোনও লেখক ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যদলের প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাদিগকে নাস্তিক ও সমাজ-বিপ্লবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী লোক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অমূলক অপবাদ আর হইতে পারে না।

ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যদি কেহ গুরুর সমগ্র-ভাব পাইয়া থাকেন, যদি কেহ চিরদিন গুরুকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া পূজা করিয়া থাকেন, তবে তাহা রামতনু লাহিড়ী। পাঠক! এই গ্রন্থে দেখিবেন ঈশ্বরে তাঁহার কি বিমল ভক্তি ছিল। আমাদের গৃহে যখন তিনি বাস করিতেন, তখন সর্ব্বদা দেখিতাম যে, অতি প্রত্যূষে তিনি উঠিয়াছেন, এটি ওটি করিতেছেন এবং গুন্ গুন্ স্বরে গাইতেছেন—"মন সদা কর তাঁর সাধনা"। আমার বিশ্বাস, এই সাধনা তাঁর নিরন্তর চলিত। এই কি নাস্তিক গুরুর নাস্তিক শিষ্য? অতএব প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা দেখাইয়া ইঁহাদিগকে অকারণ অপবাদ হইতে রক্ষা করাও আমার অন্যতর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার ফল চরমে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করিবেন। স্থানে স্থানে বাহিরের কথা প্রকৃত বিষয় অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সন্তোষের কারণ এইমাত্র যে, যে সকল মানুষ, যে সকল ঘটনা ও যে সকল অবস্থা চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা গেল, ভবিষ্যতে কাহারও কাজে লাগিতে পারে। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যে ঘটনা বা যে মানুষের উল্লেখ আবশ্যক হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতেও আনুষঙ্গিক কথার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এজন্য বহু অন্বেষণ ও বহুল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছে। বিলম্বের ইহাও একটা কারণ। আমি ইহা নিজেই অনুভব করিতেছি যে, এই প্রথম সংস্করণে অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটী থাকিয়া গেল। যদি জীবদ্দশায় দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার অবসর আসে, তবে সে সকল সংশোধন করা যাইবে।

মোটের উপর, এই সাধু পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া একটা উপদেশ সকলেই পাইবেন। এ সংসারে যে থেলে সে কাণা কড়ি লইয়াও

খেলে, যে ভাল হইতে চায়, ভাল থাকিতে চায়, তার জন্য পথ সর্বদাই উন্মুক্ত। এত দারিদ্র্য, এত সংগ্রাম, কয়জন লোকের জীবনে ঘটিয়াছে? এত পাপ প্রলোভনের মধ্যে কয়জন বাস করিয়াছে? এত কুসঙ্গ কয়জন দেখিয়াছে? অথচ সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থাতে এত ভাল কয়জন থাকিতে পারিয়াছে? তিনি সকল দলের, সকল রঙ্গের, লোকের সহিত মিশিতেন; কিন্তু তাহাদের মত হইয়া মিশিতেন না। কস্তুরী যেমন যে ঘরে থাকে সেই ঘরকে আমোদিত করে, তেমনি তিনি যে দলে মিশিতেন, যে ঘরে গিয়া বসিতেন, সেখানে এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য অথচ হৃদয়-মনের পবিত্রতা-বিধায়ক বায়ু প্রবাহিত হইত। তিনি যেন মানুষকে ভাল করিয়া সেই সময়ের জন্য আপনার মত করিয়া লইতেন। অথচ তিনি নিজে তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এই যে নিজের অজ্ঞাত প্রকৃতি-নিহিত সাধুতা, ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল; ইহার মূল্য ভাষাতে কে ব্যক্ত করিতে পারে? এই সাধুতার ছবি একবার দেখিলে আর ভুলা যায় না। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারাও আর ভুলিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থের অতিরিক্তের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র কোন্নগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের একখানা পত্র প্রকাশিত হইল। দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন তিনি তাঁহার গুরুকে কি ভাবে স্মরণ করিতেছেন। এইরূপে অনেকের স্মৃতিতে তিনি জাগরূক রহিয়াছেন এবং চিরদিন থাকিবেন। ইতি

বালীগঞ্জ
১১ই ডিসেম্বর, ১৯০৩

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

রামতনু লাহিড়ীর জীবন-রচিত ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে পূর্বেকার কোন কোনও বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে ; আবার অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ বাহির হইলে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সংস্করণে তাহার অনেকগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তথাপি এ সংস্করণটি যে নির্দোষ হইল এমন মনে করা যায় না। জীবিত কালের মধ্যে যদি তৃতীয় সংস্করণের সময় আসে, তবে বর্ণনীয় বিষয়গুলি আরও নির্দোষ করা যাইতে পারিবে।

মনে এই একটা সন্তোষ রহিল যে, বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের কয়েক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া গেলাম ; এবং যে সকল মানুষ জন্মিয়া বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের স্থূল স্থূল কথা রাখিয়া গেলাম।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে অনেকে আমার সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এরূপ কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হইত না। ইতি

কলিকাতা
১৩ই মার্চ্চ, ১৯০৯

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ও কৃষ্ণনগরে লাহিড়ীদিগের বাস

যে লাহিড়ী পরিবার কৃষ্ণনগরের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে অগ্রে কৃষ্ণনগরের বিষয়ে কিছু বলিতে হয়; আবার কৃষ্ণনগরের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই নদীয়ার রাজাদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়; কারণ তাঁহাদিগকে লইয়াই কৃষ্ণনগর; তাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা; তাঁহারা ইহার গৌরব, তাঁহারাই ইহার শ্রীসমৃদ্ধির মূল। কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সহিত লাহিড়ী বংশীয়গণের বহুকালের যোগ। লাহিড়ীবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ এই বংশের রাজগণের সাহায্যে ও তাঁহাদের আশ্রিত দেওয়ানদিগের সংশ্রবেই কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঐ বংশের অনেকে মধ্যে মধ্যে এই রাজপরিবারে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত শেষ তিন রাজার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। অতএব সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে অগ্রসর হইতেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণনগর দক্ষিণবঙ্গের রাজধানী ছিল। এখনও কলিকাতার পরে কৃষ্ণনগর অপরাপর কতিপয় সমৃদ্ধশালী ও সভ্যতালোকসম্পন্ন প্রধান নগরের মধ্যে একটি প্রথম-শ্রেণী-গণ্য নগর। কলিকাতাতে যে কিছু নূতন আলোচনা উঠে, যে কিছু চিন্তা বা ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার আন্দোলন ত্বরায় কৃষ্ণনগরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; এজন্ত কলিকাতার সহিত কৃষ্ণনগরের ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ আছে। ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বঙ্গদেশের যে নব যুগের সূচনা ও বিকাশক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই ক্ষেত্রের সমগ্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরের সামাজিক জীবনকে এক সঙ্গে দেখা আবশ্যক। একারণেও কৃষ্ণনগর ও কৃষ্ণনগরের রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত অগ্রে বলার প্রয়োজন। উক্ত ইতিবৃত্ত আমি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণন করিব। কিন্তু তাহা হইলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা শ্রীশচন্দ্র এই রাজদ্বয়ের বিবরণ অপেক্ষাকৃত সবিস্তররূপে বর্ণনা করিতে হইবে; কারণ ইঁহারা কৃষ্ণনগরের শুধু কৃষ্ণনগরের কেন সমগ্র নদীয়ার, খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভ বিষয়ে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছেন।

নদীয়ার রাজারা এদেশে বহুকাল সুপ্রসিদ্ধ। আমরা বাল্যকালে পঞ্জিকাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িতাম "শ্রীশচন্দ্র নৃপতেরনুজ্ঞয়া" অর্থাৎ শ্রীশচন্দ্র নৃপতির আজ্ঞা ক্রমে সংকলিত। অনুসন্ধান করিলেই শুনিতাম নদীয়ার রাজারা হিন্দুসমাজপতি, কুলধর্ম্মের রক্ষক ও গুণিগণের উৎসাহ দাতা। এই দেশীয় রাজগণ একসময়ে দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যখন সমগ্র দেশ যবন রাজাদিগের করকবলিত হইয়া মুহ্যমান হইতেছিল, তখন তাঁহারা স্বীয় মস্তকে ঝড়বৃষ্টি সহিয়া দেশমধ্যে জ্ঞানী ও গুণীজনকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং শিল্প, সাহিত্য, কলাদির উৎসাহদান করিয়াছেন। যবনাধিকার কালে দেশীয় রাজগণ অনেক পরিমাণে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের দেয় নির্দ্ধারিত রাজস্ব দিলেই তাঁহারা স্বীয় অধিকার মধ্যে যথেচ্ছ বাস করিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহারা পাত্র মিত্র সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখেই বাস করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ইঁহাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া নিরাপদে স্বীয় স্বীয় প্রতিভাকে বিকাশ করিবার অবসর পাইতেন। ইহার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও পুরাতন রাজধানী সকলের সন্নিকটেই, বিষ্ণুপুরের সুগায়ক ও কৃষ্ণনগরের সুকারিকরদিগের ন্যায়, শিল্প সাহিত্যাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে মহাকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, বিক্রমাদিত্যের রাজসভা না থাকিলে যেমন আমরা কালিদাসের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি পাইতাম না, তেমনি গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা না থাকিলে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাইতাম না।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর দিবসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ জব চার্ণক বাঙ্গালার সুবাদারের সহিত বিবাদ করিয়া, হুগলীর কুঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণী পত্নী সমভিব্যাহারে, হুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুতানুটি নামক গ্রামে আসিয়া এক নিম্ববৃক্ষতলে আপনার শিবির ও নূতন কুঠীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে চার্ণক কিছু দিনের জন্য সেখান হইতেও তাড়িত হইয়া হিজলীর নিকটে গিয়া কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় ১৬৯০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরিয়া আসিয়া সুতানুটিতে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহাই কালে মহানগরী কলিকাতারূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে ইহা একটি বাণিজ্যের স্থানমাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজধানীরূপে নির্ণীত হয়। সেই সময় হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়; এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহা ভারতের একটি সর্ব্বাগ্রগণ্য নগরীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কলিকাতার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপে রাজাদিগের রাজধানী কৃষ্ণনগরই বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রধান স্থান ছিল, এবং নদীয়া জেলা সকল প্রকার সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এই সকল সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎস-স্বরূপ ছিলেন। যেমন

একদিকে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ জ্ঞান-প্রভা-দ্বারা দেশকে সমুজ্জল করিয়াছেন এবং নবদ্বীপের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি নদীয়া জেলার লোকের সভ্যতা, শিষ্টাচার, সুরসিকতা, শিল্প-কুশলতা, সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতির খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল। যে রাজবংশের আশ্রয়ে থাকিয়া নদীয়ার এই খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অগ্রে দিতেছি।

উক্ত রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—এরূপ জনশ্রুতি যে, ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর আদিশূর কোনও যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই ভট্টনারায়ণ হইতে উনবিংশ পুরুষ পরে কাশীনাথ নামে একজন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভূম্যধিকারী ও ধনবান ছিলেন। বিক্রমপুর ইঁহাদের আদিস্থান ছিল। কাশীনাথ সম্রাট আকবরের অধিকার কালে বাঙ্গালার নবাবের দৌরাত্ম্যে বিক্রমপুর হইতে তাড়িত হন। পথে নবাবের সেনানী কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। কাশীনাথের আসন্ন-প্রসবা বিধবা পত্নী আন্দুলিয়া নিবাসী, বাগওয়ান পরগণার জমিদার, হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের ভবনে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। সমাদ্দারের ভবনে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মে। তাহার নাম রামচন্দ্র রাখা হয়। নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ তাহাকে স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সমাদ্দার উপাধি প্রদান করেন। রামচন্দ্র সমাদ্দারের চারিটি পুত্র তন্মধ্যে ভবানন্দই সুপ্রসিদ্ধ। এই ভবানন্দ, বিদ্রোহী যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের দমনার্থে প্রেরিত, সম্রাট জাহাঙ্গিরের সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করেন। তন্নিবন্ধন সম্রাট তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার জমিদারী ও মজুমদার উপাধি প্রদান করেন। এই ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা।

পূর্ব্বে মাটীয়ারী নামক স্থানে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। কিন্তু ভবানন্দের পৌত্র রাঘব বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানীর পত্তন করেন। তখন ঐ স্থানে রেউই নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে বহুসংখ্যক গোপ-জাতীয় লোকের বাস ছিল। ঐ সকল গোপ মহাসমারোহ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করিত বলিয়া রাঘবের পুত্র রুদ্র রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর রাখিলেন। তদবধি কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিল। তদবধি কৃষ্ণনগরই এই রাজগণের বাসস্থান হইয়া রহিয়াছে। কেবল মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার ছয় ক্রোশ দূরে, নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে শিবনিবাস নামক এক নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে অবস্থিত হন। সুতরাং রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে কৃষ্ণনগর ঐ রাজবংশের

রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিবনিবাস নামক ষ্টেশন ঐ শিবনিবাসের পরিচয় দিতেছে।

ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে ইঁহাদের জমিদারির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৮টি পরগণা এই রাজ্যের অন্তভূ্ত হয়। কবিবর ভারতচন্দ্র তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা,
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ,
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা-ভাগীরথী খাদ।
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা-সাগরের ধার,
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥

নদীয়ার রাজগণ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী ছিলেন; বহু সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্ত রাখিতেন; সর্ব্বদাই দেশের অপরাপর রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিতেন; এবং নামতঃ যবন রাজাদিগের অধীনে থাকিয়াও সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন রাজার স্থায় বাস করিতেন।

এই রাজবংশের রাজগণের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। রুদ্রের পুত্র রামজীবন; রামজীবনের পুত্র রঘুরাম; রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার জীবদ্দশাতেই বঙ্গদেশ মুসলমান-রাজাদিগের হস্ত হইতে ইংরাজদিগের হস্তে নিপতিত হয়। এই কারণে ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

যখন রঘুরামের দেহান্ত (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে) হয়, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র ছিল। কিন্তু এই স্বল্প বয়সেই কৃচষ্ণন্দ্রের কার্য্যকুশলতা ও স্বীয় অভীষ্ট সাধনে চাতুরীর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ জনরব তাঁহার পিতা কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণে তাঁহাকে উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তদনুসারে রামগোপাল নবাব সন্নিধানে রাজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নাকি এক অপূর্ব্ব চাতুরী খেলিয়া স্বীয় পিতৃব্যকে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গদেশের দক্ষিণ বিভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব অত্যন্ত প্রবল হয়। দিল্লীর সম্রাট, মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীকে শান্ত রাখিবার মানসে, তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশের চৌথ অর্থাৎ উৎপন্ন শস্তের চারিভাগের এক ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০ খ্রী:) পরে একশতাব্দীর মধ্যেই একদিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুত্থান অপরদিকে দিল্লীশ্বরের শক্তির অবাসান হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাগপুরবাসী মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদের প্রাপ্য চৌথ আদায়ের জন্ম

করিয়া দিল্লীর সম্রাটের অধিকারভুক্ত নানাস্থান আক্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের উপদ্রব বঙ্গদেশেও ব্যাপ্ত হইল। এই মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব বঙ্গদেশের ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামা বঙ্গদেশে ধনী দরিদ্র সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময় হইতেই এই বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। গঙ্গার পূর্ব্বপারের স্থান সকলে সমৃদ্ধশালী নগর অধিক ছিল না বলিয়া বর্গীগণ প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। এজন্য পশ্চিম পারের অনেক লোক গঙ্গার পূর্ব্বপারে পলাইয়া আসে। অনেকে ফরাসডাঙ্গাতে ফরাসীদিগের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করে। অনেকে কলিকাতাতে ইংরেজদের শরণাপন্ন হয়। এই সময়েই বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদের জননী পুত্রসহ পলাইয়া মুলাযোড়ের সন্নিহিত কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সেখানে রাজভবনের গড় এখনও বিদ্যমান। ক্রমে বর্গীরা পূর্ব্বপারেও পদার্পণ করিতে আরম্ভ করে। তখন কলিকাতার চারিদিকে "মারহাট্টা ডিচ্" নামক পরিখা খনন করা হয়। সেই সময়ে নদীয়াপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোনও নিরাপদ স্থানে বাস করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণনগরে ছয় ক্রোশ উত্তরে একটি স্থান মনোনীত করিয়া, সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন; এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামে তাহার নাম শিবনিবাস রাখেন। ঐ নগরকে তিনি রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির ও আত্মীয় কুটুম্বের বাসভবনে পূর্ণ করিয়াছিলেন। "শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণপুর নামক এক গ্রাম পত্তন করিয়া তথায় বহুসংখ্যক গোপজাতির বসতি করান। তাহারা রাজসরকারের নানাবিধ কার্য্য করিত। এক্ষণে তাহারা কৃষ্ণপুরে গোড়ো বলিয়া খ্যাত।" নগরের এক ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তরে ইছামতী নদীতীরে এক গঞ্জ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখেন। ঐ গঞ্জের নিকটস্থ গ্রামও কৃষ্ণগঞ্জ বলিয়া খ্যাত।

কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যকালে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পরলোক গমন করেন; এবং তাঁহার দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিরাজদ্দৌলা সুখপ্রিয় তরলমতি অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার বিবিধ অত্যাচারে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন; এবং কিরূপে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যোগ্যতর কোনও ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে পারেন এই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ নামক একজন ধনবান ব্যক্তির ভবনে এই মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। এইরূপে জনশ্রুতি যে, রাজা মহেন্দ্র, রাজা রাম নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি প্রথমে এই মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা আহূত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরে আসিয়া তাহাতে যোগ দেন; এবং তাঁহারই পরামর্শক্রমে

ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করা স্থিরীকৃত হয়। কোনও কোনও ইতিহাস লেখক এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন কৃষ্ণচন্দ্রের এই মন্ত্রণা সভার সহিত যোগ ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক বলিয়াছেন কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে এ প্রবাদ চলিত আছে, যে পলাসী যুদ্ধের পর ক্লাইব সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে পাঁচটি কামান উপহার দিয়াছিলেন। সে পাঁচটি কামান অদ্যাপি কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা নিহত হইলে আলীবর্দ্দী খাঁর জামাতা মীরজাফর তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় হইতে ইংরাজগণ বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিল না। মীরজাফর অল্পদিনেব মধ্যেই স্বীয় পুত্র মীরণকে রাজকীয়পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হইল, এবং মীরজাফবের জামাতা মীরকাসিম নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজদিগেব সহিত মীরকাসিমের মনোবাদ ঘটে। তিনি ইংরাজদিগেব রাজধানী হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিবার আশায় মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পরে তিনি দেশের মধ্যে যে যে বড় লোককে ইংরাজদের বন্ধু মনে করিতেন, বা ইংরাজদিগকে তুলিবার পক্ষে সহায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগকে ধরিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে বন্দী ও হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। তদনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখেন। ইংরাজদিগের ভয়ে হঠাৎ মুঙ্গের ছাড়িয়া পলায়ন করা আবশ্যক না হইলে, মীরকাসিম বোধ হয় সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকেও হত্যা করিতেন। কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়া পড়াতে পিতাপুত্রে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রাজস্বের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। কিন্তু তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়া গেল। কি জানি কিরূপ দাঁড়ায় এই ভয়ে জমিদারগণ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় বাকি প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। অনেক প্রজা নিঃস্ব হইয়া গেল। ইহার উপরে ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ এই দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া শস্যের সম্পূর্ণ ক্ষতি করিল। তাহার ফলস্বরূপ দেশে ভয়ানক মন্বন্তর উপস্থিত হইল। এরূপ দুর্ভিক্ষ এদেশে আর হয় নাই। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" নামে চিরদিন বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই ভয়ানক মহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৭৭০ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই নয়মাসের

মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় এক কোটি লোকের এবং কেবলমাত্র কলিকাতা নগরে ১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬০০০ লোকের মৃত্যু হয়। এরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, খানা খন্দে, দলে দলে মানুষ মরিয়া পড়িয়া থাকিত, ফেলিবার লোক পাওয়া যাইত না। আশ্চর্যের বিষয় এই, নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজরাজগণ এই মহামারী নিবারণের বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

ইহার পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশকে নানা পরগণাতে ভাগ করিয়া, জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে জমিদারির নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা এক দান পত্র লিখিয়া শিবচন্দ্রকে সমুদয় জমিদারির মালিক করেন। তৎপরে কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ পূর্বে অলকানন্দ নদীতীরে গঙ্গাবাস নামে এক সুরম্য ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করেন। এই স্থানে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। প্রথমার গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন; কনিষ্ঠার গর্ভে শম্ভুচন্দ্রের জন্ম হয়। শম্ভুচন্দ্র পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাঁহার অপ্রিয় হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র রাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় জননীর সহিত হরধাম নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন। অপরেরা শিবনিবাসেই রহিলেন। এখনও শিবনিবাস ও হরধামে এই রাজবংশের শাখাদ্বয় বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র কার্যাক্ষম দৃঢ়চেতা অধ্যবসায়শীল লোক ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকার কালে রাজ্য মধ্যে যতপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল, এরূপ কোনও এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায় না। অথচ কোনও বিপদ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অসীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে তিনি সমুদয় বিপজ্জাল কাটিয়া বাহির হইতেন। চতুর্দ্দিকে যখন বিপদ ঘিরিয়া আসিত তখনও তিনি পাত্র-মিত্র-সভাসদ লইয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেন। গুণগ্রাহিতা ও গুণীগণের উৎসাহদান কার্য্যে ইনি বিক্রমাদিত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজসভা সুপণ্ডিত, সুকবি, সুগায়ক ও সুরসিকগণে পূর্ণ ছিল। ইঁহারই অধিকার কালে নবদ্বীপে হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি, গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ সুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি, শান্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি, সুপণ্ডিতগণ যশঃ-প্রভাতে বঙ্গদেশকে সমুজ্জল করিতেছিলেন। রাজা ইঁহাদের অনেককে বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি-দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই রাজসভাতে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরাজিত ছিলেন।

ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানান্তর্গত পেঁড়ো-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা পূর্ব্বক, নানাদেশ পরিভ্রমণান্তর, অবশেষে ফরাসডাঙ্গাতে ফরাসি রাজ্যের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণচন্দ্র বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ফরাসডাঙ্গাতে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিতেন। সেখানে তাঁহার সহিত ভারতের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া যান। এখানে রাজাদেশে তিনি "অন্নদামঙ্গল" রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট-গ্রাম-বাসী বৈদ্যজাতীয় কবি সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনও এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ না হইয়াও তাঁহার সাহায্যে লাভে বঞ্চিত হন নাই। এই সময়েই গোপালভাঁড় প্রভৃতি বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা ও সুরসিকগণ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, বঙ্গদেশ যে আজিও ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সুরসিকতা প্রভৃতির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তাহার পত্তন-ভূমিস্বরূপ ছিল।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রভূতশক্তিশালী হইয়াও ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এমন কি যে প্রাচীন কুরীতি-জালে দেশ আবদ্ধ ছিল, সে জালকে তিনি আরও দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা রাজবল্লভ স্বীয় স্বল্পবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য-দুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া দেশ মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত প্রতিকূল আচরণবশতঃই তিনি সে সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের যে সকল বিধি ব্যবস্থার ভারে প্রাচীন বঙ্গসমাজ বহুদিন ক্লেশ পাইতেছিল, কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভার লঘু না করিয়া বরং দুর্ব্বহ করিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তিনিই যশোহর জেলাস্থ পিরালী ব্রাহ্মণদিগের উপবীত গ্রহণাধিকার রহিত করিয়া তাহাদিগকে জাত্যংশে অতি হীন করিয়া ফেলেন ; এবং এ প্রদেশের বৈদ্যগণের উপবীত ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরে রাজা শিবচন্দ্র, (১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ পর্য্যন্ত) তৎপরে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, (১৭৮৮ হইতে ১৮০২ পর্য্যন্ত) নদীয়ার রাজসিংহাসনে আসীন হন। শিবচন্দ্র অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, উদার ও স্বজন-পোষক ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অকারণ অনেক অর্থের অপব্যয় করিতেন। একবার একটি বানরের বিবাহ দিয়া লক্ষাধিক টাকা উড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই বাকি খাজনার জন্য জমিদারী বিক্রয় হইতে আরম্ভ হয়।

রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা বিধান, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন, ও দুর্ভিক্ষাশঙ্কা নিবারণাদির অভিপ্রায়ে, ১৭৮৯ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য বার্ষিক দেয় রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন। কথা থাকে যে, বিলাতের কর্তৃপক্ষের অভিমত হইলে এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী হইবে। তদনুসারে ১৭৯৩ সালে সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়। প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হইয়াছিল বলিয়া অদ্যাপি ইহা দশশালা বন্দোবস্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই দশশালা বন্দোবস্তের প্রচলন হইতেই বঙ্গদেশের অনেক জমিদারের জমিদারি হ্রাস হইতে লাগিল। মুসলমান নবাবদিগের সময়ে যদিও ভূম্যধিকারিগণ বাকি থাজনার জন্য সময়ে সময়ে কারারুদ্ধ ও নিগৃহীত হইতেন, তথাপি তাঁহাদের জমিদারি অক্ষুণ্ণ থাকিত। সময়ে সময়ে নবাবের কৃপাকটাক্ষ পড়িলে নিষ্কৃতি লাভও করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাজগণ একদিকে যেমন ভূম্যধিকারিগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, অপরদিকে তেমনি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলামে চড়াইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই নিলামের কিস্তির প্রভাবে অনেকের জমিদারি হস্তান্তর হইয়া যাইতে লাগিল। তাই কৃষ্ণচন্দ্রের সময় যে নদীয়া রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের সময় হইতে তাহা নিলামে চড়িতে লাগিল ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পর গিরিশচন্দ্র রাজা হন। (১৮০২ হইতে ১৮৪১ পর্য্যন্ত)। গিরীশচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৪ পরগণা নদীয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; গিরীশচন্দ্রের সময়ে তাহা ৫।৭ খানি পরগণা ও কতকগুলি নিষ্কর গ্রামে দাঁড়াইল। এই রাজার সময়ে ইঁহাদের জমিদারির সারভূত প্রসিদ্ধ উখড়া পরগণা নিলাম হইয়া যায়। এই দারুণ দুর্ঘটনার পর গিরীশচন্দ্র একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় নিতান্ত সুরাসক্ত ও অমিতব্যয়ী হইয়া পড়েন। গিরীশচন্দ্র নিঃসন্তান হওয়াতে একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ও তাহার নাম শ্রীশচন্দ্র রাখেন। এই দত্তক পুত্রকে জমিদারির ভার দিয়া ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র লোকান্তরিত হন। পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় এই রাজাও গুণীগণের উৎসাহদাতা, কাব্যরসামোদী ও সঙ্গীতাদির অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার অধিকার কালে দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক কায়েম খাঁ ও তাঁহার তিন সুবিখ্যাত পুত্র মিয়া খাঁ, হস্মু খাঁ ও দেলাওর খাঁ আসিয়া কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহাদের আগমনে কৃষ্ণনগরে সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছিল। যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র ইহাদেরই নিকটে গীতবাদ্য শিখিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ

অনেক ভদ্রলোককে সমবেত করিয়া রাজবাটীতে এক সাধারণ হিতকরী সভা স্থাপন করিলেন; এবং স্বয়ং তাহার সভাপতি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সভার সাহায্যে রাজা একটি মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, ভূম্যধিকারিদিগের দ্বারা আবেদন করাইয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছিলেন। ভূম্যধিকারিগণের এই মহদুপকার সাধন করিয়াই শ্রীশচন্দ্র নিরস্ত হন নাই। দেশের ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ পণ্ডিতগণের সহিত স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও শ্রীশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, গবর্ণর জেনেরল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অধিকারকালে, কৃষ্ণনগর কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শ্রীশচন্দ্র, পূর্ব্ব পুরুষের রীতি লঙ্ঘন পূর্ব্বক, স্বীয় পুত্রকে কৃষ্ণনগর কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; এবং নিজে কালেজ কমিটীর সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজবাটীতে একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন; এবং তাঁহারই প্রার্থনানুসারে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাজারিলাল নামক একজন প্রচারককে সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না পাঠাইয়া হাজারিলালকে প্রেরণ করাতে রাজা দুঃখিত হইয়া রাজবাটী হইতে ব্রাহ্ম সমাজকে স্থানান্তরিত করেন।

ইহার কিঞ্চিৎপরে কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে মিশনারিদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই সময়ে শ্রীশচন্দ্র নিজভবনে একটি অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীশচন্দ্রের জীবনের অবসানকাল যেরূপ হইল তাহা অতীব শোচনীয়। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "রাজা বাল্যাবস্থা হইতে পঁয়ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, নিজের ও স্বদেশের হিত বিধান ও মঙ্গলসাধনে সতত রত ছিলেন। তাহার পর কলিকাতাবাসী কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির সুধাচ্ছাদিত বিষপূরিত সংসর্গে তাঁহার আন্তরিক ও বাহ্যিক ভাবের বিস্তর বিপর্য্যয় হইতে লাগিল। তাঁহার বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করা অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল; এবং সুহৃদ্বর্গের সুহৃদ্বাক্য কর্ণকুহরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়া উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন, সকলই নিয়ম-বহির্ভূত হইতে আরম্ভ হইল; দিবানিশি কেবল মদিরাপানে

ও গীতবাদ্যের আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর মধ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া উঠিল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। অবশেষে ১২৬৩ বাং (ইংরাজী ১৮৫৭) অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের একবিংশ দিবসে ৩৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।"

শ্রীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে রাজা সতীশ চন্দ্র তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। এই রাজার সময়ে বর্ণনীয় বিষয় অধিক কিছুই নাই। ইনি বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিষয় কার্য্যে অবহেলা পূর্ব্বক কেবল কুসঙ্গীদের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণে কালযাপন করিতে লাগিলেন। গিরীশ চন্দ্রের ন্যায় আয়ব্যয়ের প্রতি ইঁহারও দৃষ্টি ছিল না।

ইনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ অক্টোবর দিবসে গুরুতর সুরাপান নিবন্ধন উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া মশুরি পাহাড়ে গতাসু হন।

সতীশ চন্দ্র বিলাতী সভ্যতা ও বিলাতী রীতি নীতির অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন ; এবং মধ্যে মধ্যে এদেশীয় ও ইংরাজ ভদ্রলোকদিগকে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন। এই কারণে তাঁহার দেহান্ত হইলে কৃষ্ণনগর কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ লব সাহেব বলিয়াছিলেন—"এখানকার ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজা গ্রন্থিস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অভাবে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, এবং অচিরাৎ আর কেহ যে ঐরূপ গ্রন্থিস্বরূপ হইবেন তাহারও প্রত্যাশা নাই।"

সতীশ চন্দ্রের পত্নী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তাঁহার নাম ক্ষিতীশ চন্দ্র রাখা হয়। ইনিই এক্ষণে নদীয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার জন্য সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যেমন একদিকে নদীয়ার রাজগণের রাজশক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে, ইংরাজ-রাজ্য স্থাপন ও বিষয় বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে লাহিড়ীগণ প্রধানরূপে উল্লেখ-যোগ্য, কারণ তাঁহাদের যশঃপ্রভা ত্বরায় দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী বংশের আগমন সম্বন্ধে আদি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ রাজসাহী পরগণার কোনও স্থানে বাস করিতেন। সেখান হইতে বোধ হয় বিবাহ-সূত্রে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় স্বলিখিত আত্ম-জীবনচরিতে লিখিয়াছেন :—"ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা রুদ্রের সময় হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পুত্র রাম রাম চক্রবর্ত্তী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত

ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশাস্ত্রে যে যে স্থানে ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও রাম রাম চক্রবর্ত্তী নামের উল্লেখ আছে, তাঁহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।" অতএব দেখা যায় যে, বহু পূর্ব্ব হইতে এই রায়বংশীয়গণ বহুপুরুষ ধরিয়া কৃষ্ণনগরের রাজসংসারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পদে, সম্ভ্রমে ও কুলমর্য্যাদাতে ইঁহারা বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমন কি ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করেন; সে জন্য ইঁহারা মতকর্ত্তার বংশ বলিয়া বারেন্দ্র দলের মধ্যে সম্মানিত। কুল-মর্য্যদা-সম্পন্ন দেওয়ানগণ স্বীয় স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবার জন্য সময়ে সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দ্বারা নাটোরের রাজাকে অনুরোধ করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে, বরেন্দ্রভূমি হইতে কুলীনদিগকে আনাইয়া নদীয়ার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। অনুমান করি এইরূপে লাহিড়ী, খাঁ, সান্ন্যাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণনগরের সন্নিধানে আসিয়া বাস করিয়াছেন।

লাহিড়ী বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কে সর্ব্ব প্রথমে দেওয়ানবংশে বিবাহ করিয়া নদীয়া জেলাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি তাহা এই, পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ দেওয়ানদিগের সহিত নাটিয়ারিতে বাস করিতেন। সেখান হইতে কৃষ্ণনগরে আসেন। রামতনু বাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী কৃষ্ণনগরে আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করেন। রামহরির দুই পুত্র রামকিঙ্কর ও রামগোবিন্দ। রামকিঙ্কর বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমত্তা গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে রাজসরকারে মুন্সীর কাজ প্রাপ্ত হন। রামকিঙ্কর অপুত্রক, তিনি ক্ষেমঙ্কর নামে একজনকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের পঞ্চ পুত্র। কিঙ্কর উপার্জ্জক ও অপুত্রক, গোবিন্দ বহু কুটুম্বভারে পীড়িত; এরূপ স্থলে হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারে সচারাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। কিঙ্কর ও গোবিন্দকে পৃথক হইতে হইল। কিঙ্কর নিজ সহোদরের প্রকৃতি জানিতেন। তিনি অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তি একদিকে ও শালগ্রাম শিলা এবং দেবসেবার্থ রক্ষিত সামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তি অপরদিকে রাখিয়া গোবিন্দকে যথা ইচ্ছা মনোনীত করিতে বলিলেন। গোবিন্দ শালগ্রামশিলা লইয়া পৃথক হইলেন; এবং ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ যে ধার্ম্মিকতাতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনপূজিত ছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রণীত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তন্মধ্যে রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুন্সী প্রধান।
তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান ॥

কবিবর গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহাকে গুণবান আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ তিনি সে সময়ে ধার্ম্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোবিন্দের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়ের নাম কাশীকান্ত। কাশীকান্ত কিছুকাল দিনাজপুরের রাজার অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি অতি রাশভারি লোক ছিলেন। পরিবার পরিজন তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকিত। পরিবারস্থ বালকগণ তাঁহার ভয়ে অসৎপথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না। রামতনু লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশবচন্দ্র লাহিড়ী বালককালে পাঠে অনাবিষ্ট ছিলেন, সেজন্য পিতামহ কাশীকান্ত লাহিড়ী একদিন তাঁহাকে পদাঘাত করেন। কেশবচন্দ্র লাহিড়ী উত্তরকালে সর্ব্বদা বলিতেন যে, সেই পদাঘাতে তাঁহার চেতনা করিয়া দিয়াছিল ; তিনি তৎপরে পাঠে নিবিষ্ট হন। কাশীকান্তের দুই সংসার ও দুই পুত্র। প্রথম পুত্র ঠাকুরদাস লাহিড়ী কিছুকাল রাজা গিরিশচন্দ্রের অধীনে তাঁহার কার্য্যকারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; এই সময়ে তিনি লাহিড়ী দেওয়ান নামে পরিচিত হন। তখন তিনি অধিকাংশ সময় কলিকাতাতে বাস করিয়া নদীয়ারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণর জেনেরালের লেভীতে যাওয়া প্রভৃতি সমুদয় রাজকার্য্য সমাধা করিতেন।

কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ অতি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শেষ দশায় ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। যে পর্য্যন্ত দেহে বল ছিল স্বপাকে আহার করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রাতে উঠিয়া যে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিতেন তাহাকে একটি সিকি দান করিতেন। সূর্য্যোদয়ের অগ্রে স্নানাদি সমাপন করিয়া জপ পূজা প্রভৃতিতে বহু সময় যাপন করিতেন। তৎপরে অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম ও অতিথি সৎকারাদিতে অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অবশেষে প্রায় অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে আহার করিতেন। শেষ দশায় একমাত্র বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী পিতার সেবা শুশ্রূষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়তা করিতেন।

রামকৃষ্ণের আট পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র কৃতী হইয়া বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হন। ইনি পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আলিপুরে কেরাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে যশোহরের জজের হেডক্লার্ক বা সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হন। ইঁহাকে ধার্ম্মিক হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ধর্ম্ম পথে থাকিয়া যা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহা বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবায় ও ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামতনু বাবুর মুখে শুনিয়াছি তাঁহার জ্যেষ্ঠের পিতৃমাতৃ-ভক্তি অপরিসীম ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে পিতার পত্র আসিলে, তিনি তাহা অগ্রে ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতেন, তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিতেন। কেবল তাহা নহে, কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী পরিবারে একথা প্রচলিত আছে যে, তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়িতে গিয়া স্বীয়

জননীকে দেবপূজার কাষ্ঠাসনে বসাইয়া তাম্রকুণ্ডে তাঁহার পদদ্বয় স্থাপন-পূর্ব্বক পুষ্প চন্দনদ্বারা পূজা করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা মাতা নাকি দেবার্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত তাম্রকুণ্ডে পা রাখিতে চাহিতেন না। পুত্র বলপূর্ব্বক পদদ্বয় তাহাতে সন্নিবেশিত করিলে, তিনি ভয়ে কাঁপিতেন, এবং বলিতেন—"কেশব! কেশব! কর কি, আমার যে গা কাঁপছে।" কেশব বলিতেন—"রাখ রাখ, তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা।" এমন পিতার পুত্র ও এমন জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠ যিনি তাঁহাতে আমরা যে প্রকার সাধুভক্তি দেখিয়াছিলাম তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।

রামতনু বাবু রামকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র ও সপ্তম সন্তান। তাঁহার অগ্রে কেশবচন্দ্র ভিন্ন আর তিন সহোদর ও দুই সহোদরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সকলেই অল্প বয়সে গত হইয়া কেবল কেশবচন্দ্র ও ভবসুন্দরী থাকেন। রামতনু বাবুর পরে আর তিন সহোদর জন্মেন। তাঁহাদের নাম রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ ও কালীচরণ। রাধাবিলাস কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে স্বীয় জ্যেষ্ঠের সাহায্য করিতে যান। সেখানে ম্যালেরিয়া জ্বরে দুই ভ্রাতার মৃত্যু হয়। কালীচরণ বাবু কলিকাতা মেডিকেল কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া চিকিৎসক হইয়া বাহির হন; এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে ডাক্তারি করিতেন। তাঁহার বাল্যকালের বিষয়ে দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় স্বলিখিত আত্ম জীবন-চরিতে এই প্রকার বর্ণনা করিযাছেন,—"কালীচরণও আমাকে যার পর নাই ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল আনিয়া দিতেন; এবং বাটীতে অবস্থানকালে আমার পাঠের বিষয়ে বহু আনুকূল্য করিতেন। * * * * কালীচরণ বড় খোস-পোষাকী ছিলেন। তিনি মেডিকেল কালেজে যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি উড়ানী ও বিনামা ক্রয় করিতেন। যখন বাটী আসিতেন তখন ইহার কোন দ্রব্য আমাকে জেদ করিয়া দিতেন; আর কহিতেন "ছোড়্ দাদা, এ সকল দ্রব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায় তেমন আমার অঙ্গে দেখায় না।"

বাল্যে কালীচরণ বাবুর যে সহৃদয়তা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিরজীবন তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। উত্তরকালে তিনি যখন কৃষ্ণনগরের সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসকরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মধুর ব্যবহার সুমিষ্ট ভাষা ও দীনে দয়া দেখিয়া সকলেরই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার মুখ দেখিলেই রোগীর অর্দ্ধেক রোগ পলাইয়া যাইত! তিনি দীন দরিদ্রদিগকে বিনা ভিজিটে দেখিতেন; এবং অনেক সময়ে নিজ ঔষধালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধ যোগাইতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই,—একবার তাঁহার নিজ ঔষধালয়ে তাঁহার স্বাক্ষরিত একখানি ব্যবস্থা-পত্র আসিল। দেখা গেল ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া, সর্ব্বশেষে

লিখিয়াছেন, 'একগাড়ি খড়'; অর্থাৎ ঔষধের সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠাইতে হইবে। এই ব্যবস্থা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল। কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে কালীবাবু ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিলাম রোগীর ঘরের চালে খড় নাই; এই হিমের দিনে যদি সমস্ত রাত্রি হিম লাগে তবে আর আমার চিকিৎসা করিয়া ও ঔষধ দিয়া ফল কি? তাই ভাবিলাম ঔষধের সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠান যাক্।" যে সহৃদয়তাতে এতদূর করিতে পারে তাহাতে যে কালীবাবুকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহাকে দেখিলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রীত হইতেন। তিনি চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া কোনও গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র বালক-বালিকাদিগের মধ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইত। ইহারই উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী কাব্যে" বলিয়াছেন,—

"কোমল স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন;
ছেলেদের কালীবাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিশে যায় যেন নীরে ক্ষীর।"

রাধাবিলাস ও শ্রীপ্রসাদ রামতনু বাবুর ন্যায় মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। শ্রীপ্রসাদও বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে জ্ঞানালোক লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। দেশের বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় বাসভবনে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন;—"১২৪৩ কি ৪৪ বাঃ অব্দে কৃষ্ণনগর-নিবাসী দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন! * * * তিনি আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতেন এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ কলম দিতেন। এই সকল কারণে অনতিকাল মধ্যে তাঁহার বিদ্যালয়ে অনেক বালক পড়িতে লাগিল।"

শ্রীপ্রসাদ যৌবনের প্রারম্ভে যে পরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, উত্তরকালেও তাহা প্রচুর পরিমাণে তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পারসী ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং সেজন্য কৃষ্ণনগরের জজের সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ শুনিয়াছি যে, কার্য্যদক্ষতার গুণে পরিশেষে ডিপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হন, কিন্তু সে পদ ভোগ করিতে পারেন নাই; তৎপূর্ব্বেই ভবধাম পরিত্যাগ করেন। যখন তিনি সেরেস্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাঁহার

বেতন ৮০ টাকা মাত্র ছিল। তিনি মনে করিলে অবৈধ উপায়ে প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু যে ধর্ম্মভীরুতা এই লাহিড়ীবংশের একটা প্রধান লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা তাঁহাতেও প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সে সকল পথে কখনও পদার্পণ করেন নাই। প্রত্যুত এই ৮০ টাকা বেতন হইতে যথাসাধ্য গরীবদুঃখীর সাহায্য করিতেন। পূজার সময়ে এদেশের লোক কয়েকদিনের জন্য জগতের দুঃখ শোক ভুলিয়া, নববস্ত্র পরিধান করিয়া, উৎসবানন্দে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, গরীবের-গরীব যে তাহারও প্রাণে এই সময়ে নববস্ত্র পরিবার সাধ হয়। শ্রীপ্রসাদের কোমল ও পরদুঃখকাতর হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে গরীবদের সে সাধ পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। তিনি পূজার সময়ে গরীব দুঃখীদের মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, সময়ে অসময়ে দীন জনের দুঃখ দেখিলেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত হইত। তিনি গোপনে অনেক দান করিতেন। আমি বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি একজন বিপন্ন আত্মীয়ের সাহায্যার্থ নিজ বেতনের অর্দ্ধেক দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন "কাহাকেও বলিও না।" ইহা কৃষ্ণনগরের লাহিড়ী বংশেরই অনুরূপ কার্য্য।

এতক্ষণ গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র কাশীকান্ত লাহিড়ীর শাখাস্থ ব্যক্তিগণের গুণাবলীরই কথা বলিতেছি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর চারিটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলাতে গিয়া বাস করেন। তাঁহার শাখা এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে। তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। চতুর্থ পুত্র কালীকান্ত অপুত্রক গত হন। তৃতীয় গৌরীকান্ত ও পঞ্চম শম্ভুকান্ত, ইঁহাদের শাখাদ্বয় কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত দৌলিয়া ও বাগানবাড়ী নামক স্থানদ্বয়ে অবস্থিত হইয়াছেন। কাশীকান্তের শাখা কৃষ্ণনগর কদমতলাতে বাস করেন। এই জন্য তাঁহারা কদমতলার লাহিড়ী-পরিবার নামে অভিহিত; এবং অপরেরা দৌলিয়া ও বাগানের লাহিড়ী-পরিবার নামে আখ্যাত। গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ীর গুণাবলীর নিদর্শন অপর শাখাদ্বয়েও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এক জনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাতে লাহিড়ী বংশের ধর্ম-প্রবণতা আর এক আকারে ফুটিয়াছিল। ইঁহার নাম দ্বারকানাথ লাহিড়ী। ইঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

অনুমান ১৮২৭ কি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। ইনি বাগানের শম্ভুকান্ত লাহিড়ীর পৌত্র ও নীলমণি লাহিড়ীর পুত্র। শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয়া জননীর সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বোধ হয় শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সামান্যরূপ বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ কোন

ঘটনা ঘটে, যাহাতে ইঁহার জননী দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হন। জননীর দুঃখ দেখিয়া সেই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতুলালয় হইতে বহির্গত হন যে, নিজে উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়া মাতার দুঃখ দূর করিতে না পারিলে আর আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাইবেন না; বা কাহাকেও নিজের সংবাদ দিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কয়েক আনা পয়সা মাত্র পথের সম্বল লইয়া পদব্রজে দুই তিন মাস হাঁটিয়া আগরাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন শান্তিপুর-নিবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দেন; এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বারকানাথ ইংরাজী বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৌপ্য ও স্বর্ণপদক পারিতোষিক পাইলেন; এবং কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আগরাতে একটি উচ্চ বেতনের কর্ম্ম পাইলেন। প্রথম বেতন পাইয়াই জননীকে পত্র লিখিলেন; এবং তাঁহার খরচের জন্য পাথেয় পাঠাইলেন। ভগ্নহৃদয়া মাতা বহুকাল পরে নিরুদ্দেশ সন্তানের পত্র ও তাঁহার প্রেরিত অর্থ পাইয়া কতই ক্রন্দন করিলেন। ক্রমে জননী আগরাতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দ্বারকানাথ মাতৃসেবা ও গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিল। দ্বারকানাথ যখন বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন; এবং ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে একজন উপাধিহীন কর্ম্মচারীর সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মিল; এবং তিনি প্রকাশ্য-ভাবে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবীর প্রতিকূলতাবশতঃ তাঁহার জীবন ঘোর নির্য্যাতনময় হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সেই নির্য্যাতনের ও স্বীয় পিতার অপরাজিত ধৈর্য্যের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"জননীর বিশ্বাস ছিল বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পোড়াইয়া দিলে, উপাসনা কালে ব্যাঘাত জন্মাইলে, মত বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা; এবং এই ভ্রমবশতঃ যতদূর সম্ভব পুত্রের ধর্ম্মসাধনার বাধা জন্মাইতে অবহেলা করিতেন না। কত যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছেন তাহা কি বলিব! কতবার বাইবেল লুকাইয়া রাখিতেন। আর প্রায় এমন দিন যাইত না, যাহাতে মাতার দুর্ব্যবহারে ও কঠোর পীড়নে সন্তান কষ্ট না পাইতেন। মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন ক্রমাগত বলিতেন—"এমন ছেলে বিধর্ম্মী এ কি প্রাণে সয়?" বহুকালব্যাপী এই ঘোর নির্য্যাতনেও সে প্রকৃতি কখনও চঞ্চল হয় নাই; ধর্ম্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই; এবং একদিনের জন্যও কেহ কখনও মাতার প্রতি তাঁহাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সেই সদানন্দ শান্তমূর্ত্তি সব প্রতিকূল অবস্থায় সমান ধীর থাকিত। ভিতরের

উৎপীড়ন অম্লানভাবে অটল ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়াছেন। এমন গভীর মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল! উপার্জ্জনের সমুদয় টাকাই মাতার হস্তে দিতেন। মাতা হাতে তুলে যা দিতেন তাতে কখনও দ্বিরুক্তি ছিল না। খৃষ্টের ত্যাগস্বীকার, স্বর্গীয় অতুলন ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা, তিনি জীবনের প্রতি কার্য্যে, তাঁহার প্রভুর আদর্শ যেন প্রতিফলিত করার জন্যই তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন! এমন খ্রীষ্টগত জীবন জগতে দুর্লভ! রবিবারগুলি তাঁহার জীবনের যেন আরও পরীক্ষা ও কষ্টের দিন ছিল। রবিবার যে খ্রীষ্টশিষ্যের কি সাধনার দিন তাহা তাঁহার জীবনে সুস্পষ্ট দেখেছি। বিশেষ আহারাদি সে দিন হইত না; কেবল নির্জ্জনে বসে শাস্ত্র পাঠে ও প্রার্থনাদিতে সময় যাপিত হইত। আর মাতাও সে দিন যেন অধিক বিষাদে, মনঃক্ষোভে, তিরস্কার পীড়নে, সন্তানের সংশোধন করিবেন ভেবে সকল প্রকার কষ্ট দিতেন; নানা প্রকারে সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। কিন্তু তিনি সকলই অবিচলিতভাবে বহন করে ক্লেশজনিত বিষাদের মৃদু হাসিতে কেবল বলিতেন —'মা আমার শাস্ত্রে কি আছে জানিলে তুমি কখনও এমন করিতে না।' * * * পুত্রের প্রতি এই কঠোর ব্যবহার যে দেখিত সেই অবাক্ হইত। সকলেই বলাবলি করিত—"এত ধৈর্য্য কোথায় পাইল, যাতে নিয়ত মার এত অন্যায় এমন করে সয়ে থাকে।"

যে পরিবারে এরূপ পিতার স্মৃতি থাকে সে পরিবার ধন্য! যে বংশের লোকে মাতার পদদ্বয় তাম্রকুণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিতে পারে, সে বংশের পক্ষে এই মাতৃভক্তি আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই চরিত্রের গুণেই, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়, সিপাহীগণ যখন আগরানগর আক্রমণ করে, এবং প্রত্যেক ইংরাজ ও প্রত্যেক দেশীয় খ্রীষ্টানকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তৎপ্রদেশীয় হিন্দুগণই তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। এই চরিত্র দেখিয়াই সুরাপান-নিবারণী সভার সুপরিচিত বক্তা রেভারেণ্ড ইভান্স (Rev. Evans)—যিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস কাল দ্বারকানাথের সহিত আগরার কেল্লাতে বন্দী ছিলেন—বলিয়াছিলেন,— 'Meek as a lamb, humble as a baby, true as steel'—অর্থাৎ তিনি নিরীহতাতে মেষশাবক, বিনয়ে শিশু ও সত্যনিষ্ঠাতে ইস্পাত স্বরূপ ছিলেন। এই চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়াই ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন—"বয়সে সে আমার কনিষ্ঠ ভাই ছিল, কিন্তু চরিত্রগুণে আমার পিতৃস্থানীয়!"

দুঃখের বিষয় দ্বারকানাথের জীবন অকালেই বিলীন হইয়াছিল। ১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে এই লাহিড়ী বংশীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই সহৃদয়, সদাশয়, ধর্ম্ম-পরায়ণ, পরোপকারী ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। এরূপ কুলে

এরূপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় চরিত্রগুণে সর্ব্বজন পূজিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সাধুতা গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ী হইতে নামিয়া আসিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম্ম-পরায়ণ রামকৃষ্ণে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এই বংশের ব্যক্তিগণকে বিভূষিত করিয়াছিল। এখনও এই লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণনগরে মান সম্ভ্রমে অগ্রগণ্য হইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে দেশের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যিনি যেখানে গিয়াছেন, প্রায় সকলেই সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা এবং পরোপকারাদি গুণে প্রতিবেশিবর্গের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশা ও কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাসে বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র পিতৃনিবাসে জন্মিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ কালীচরণ কৃষ্ণনগরের বাটিতে ভূমিষ্ঠ হন, তদ্ব্যতীত আর সকলেই বারুইহুদাতে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা রামকৃষ্ণ বারুইহুদা গ্রামবাসী, রাজবাটীর দেওয়ান, রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জগদ্ধাত্রী যে রায়বংশের কন্যা তাঁহারা কৃষ্ণনগরে দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সচীদাস চক্রবর্ত্তীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি খাঁ, ভাদুড়ি, সান্ন্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেয় প্রভৃতি ছয় ঘর প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটীর দেওয়ানের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা যদি ধর্ম্মভীরু লোক না হইতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের ন্যায় রাজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজেরাই কার্য্যতঃ রাজ্যসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহারা তাহা না করিয়া বরং আপনাদিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখনও রাজবাটির অনেক বিষয় ইঁহাদের নামে বেনামী

রহিয়াছে। সে সকল বিষয় ইঁহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন। প্রভুদিগকে মারিয়া আত্ম-পোষণ করা দূরে থাকুক, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্মজীবন-চরিতে দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের বিলক্ষণ সাংসারিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছে। এই বংশের পূর্ব্বকথা যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, বংশ পরম্পরা ক্রমে ইঁহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় খাতপূর্ত্তাদি খনন, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ দরিদ্রে দান প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মেই নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক একজন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের গুণাবলীর কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। তন্মধ্যে একজনের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। তাহা শুনিলে অনেকে উপন্যাসের বর্ণনা বলিয়া অনুভব করিবেন; কিন্তু তাহা সত্য ঘটনা। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় মহাশয়ের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এই সকল গুণ এত অধিক ছিল যে, তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি আমরা কখনও দেখি নাই। তিনি এমন মিষ্টভাষী ছিলেন যে, কখনও কাহাকেও তুই বলেন নাই; এমন দানশীল ছিলেন যে সাধ্যাতীত না হইলে কখনও কোনও যাচককে নিরাশ করেন নাই; অর্থ-স্ত্রী অভিলাষ বোধ হয় তাঁহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই; শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান এই দুর্লভ গুণ কেবল তাঁহাতেই দেখিয়াছি। যে সকল হিংসক তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও কখন একটি কষ্টদায়ক বাক্য বলেন নাই; এবং তাঁহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশে কখনও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের দুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের পীড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন; মৃত্যুকালে তাঁহাদের গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন, এবং পরিশেষে তাঁহাদের শ্রাদ্ধের কালে সহায় হইয়াছেন।"

"তাঁহার উদার স্বভাবের দুইটি দৃষ্টান্ত আমার সন্তানদের জন্য লিখিতেছি। তিনি প্রতিবেশী কায়স্থ জাতীয় অতি দুর্দশাপন্ন একটি যুবাকে আমাদের রাজবাটীর কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিয়ৎকাল পরে সে রাজার প্রিয় খানসামা হইয়া যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে। একদা আমাদের কয়েক বিঘা ভূমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে আমার অগ্রজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক তাহার সমুচিত দণ্ডবিধানে উদ্যত হন। খানসামা জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে ক্লেশ দিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিছুদিন পরেই ঐ কৃতঘ্ন যুবক কোনও সুযোগ পাইয়া আমাদের আরও কয়েক বিঘা ভূমি অধিকার করিবার জন্য মিথ্যা মোকদ্দমা উত্থাপন করে। ইতিমধ্যে তাহার বাটীতে হঠাৎ ডাকাইতি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজনকে

চৌকিদার ডাকাইতের দলে দেখিয়াছে এবং জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এই ডাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কর্ত্তারা অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজবাটীতে আশ্রয় লইলেন। গ্রামস্থ লোক তাহার এই অন্যায়াচরণে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া দারোগার নিকট কহিলেন যে, তাঁহারা ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং দারোগা এ ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের পেষকার কর্ত্তাদিগকে কহিয়া পাঠাইলেন যে, "যৎকিঞ্চিৎ উদ্যোগ ও ব্যয় করিলেই উহারা ছয়মাসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইতে পারে।" তাহারা সমুচিত দণ্ড পায় ইহা সকলেরই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কহিলেন,— আমরা বিপদমুক্ত হওয়াতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, এ নির্বোধদিগকে বিপদগ্রস্ত করিলে আর কি ফল লাভ হইবে?" এতাদৃশ ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই।

"এক শীতকালের রাত্রিতে তিনি রাজার নিকট হইতে বাসস্থানে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিচারক এক জন তদীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রা যাইতেছে। প্রতি রাত্রিতেই তিনি আসিলে তাঁহার জলপানের আয়োজন করিয়া দিত এবং তাঁহার আহার সমাপনান্তে নিদ্রা যাইত। জ্যেষ্ঠতাত ভাবিলেন, যখন এ ব্যক্তি আমার আসিবার পূর্ব্বেই আমার শয্যায় নিদ্রিত হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোনও অসুখ জন্মিয়াছে। কিঞ্চিৎকাল এরূপ চিন্তা করিয়া দুইখানি কুশাসনের উপরে শয়ন করিলেন। গাত্রে যে বস্ত্র ছিল তাহাই তাঁহার শীত নিবারণের উপায় মাত্র হইল। নূতন সংবাদে রাজার বড় আহ্লাদ হইত বলিয়া, এক জন প্রভাতকালে এ বিষয়ে তাঁহার গোচর করিল। রাজা এই আশ্চর্য্যের দর্শনোৎসুক হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠতাতের উপস্থিত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তখনও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। রাজার আগমনে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হওয়াতে জাগরিত হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা ঈষৎ হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমার [illegible] পরিচারক সুখে শয়ন করিয়াছিল, আর তুমি এই কুশাসনে শুইয়া কষ্ট পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি?" তিনি উত্তর করিলেন "আমার কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যদি অসুখ হইয়া থাকে তবে উহার কষ্ট হইত।" তাঁহার এই সহৃদয় ব্যবহারে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলকে কহিলেন যে, "যদি সংসারে কেহ ধার্ম্মিক থাকেন তবে তিনি এই ব্যক্তি।"

"তাঁহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। তাঁহার সাত আটটি পুত্র অকালে কালকবলিত হয়, তথাপি তাঁহার বদনে ক্ষণকালের নিমিত্ত কেহ কখনও শোকচিহ্ন দেখেন নাই। প্রত্যেক পুত্র বিয়োগ সময় তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন এবং তাহার পর অধৈর্য্য পরিবারগণের শোকশান্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। যাঁহার কোমল হৃদয় চিরশত্রুর দুঃখে কাতর হইত, তাঁহার চিত্তকে

যে জীবনাধিক পুত্র শোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"

কি অপূর্ব্ব সাধুতা! এ বিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুন্নত হয়। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, দেওয়ান কর্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, যাঁহার আত্মজীবন-চরিত হইতে এই সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতের অনেক গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। আত্মীয়-স্বজনের পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এ সকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এই সকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়।

জগদ্ধাত্রী দেবী এইরূপ বংশে জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন। এরূপ গৃহে জন্মিলে ও বাড়িলে মানুষ যাহা হয় তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে অধিক কথা জানিতে পারি নাই। যাহা কিছু জানিয়াছি তাহাতে তিনি যে মনস্বিতা ও সাধুতা বিষয়ে একজন অগ্রগণ্যা স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগদ্ধাত্রী পিতার একমাত্র কন্যা, তিন ভ্রাতার অগ্রজা ও রূপলাবণ্যে এবং বিবিধ সদ্‌গুণে গৃহের শ্রী-স্বরূপা ছিলেন। শৈশবে রাজা শিবচন্দ্র তাঁহাকে কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। তাঁহাকে তাসের পোষাক পরাইয়া, নিজ হস্তীর উপরে হাওদাতে তুলিয়া, সঙ্গে লইয়া নগরভ্রমণ করিতেন। এই কন্যা পিতৃগৃহে কিরূপ আদরে ছিলেন সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। ধন সম্পদে, মান সম্ভ্রমে, তাঁহার পিতার সমকক্ষ লোক তখন কৃষ্ণনগরে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি মনে করিলে সুখে স্বচ্ছন্দে চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করিতে পারিতেন। সে সময়ে কুলীন জামাতৃগণ অনেক সময়ে শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। তদনুসারে রামকৃষ্ণও পরম সমাদরে চিরজীবন শ্বশুরালয়েই বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, জগদ্ধাত্রী তাহা পছন্দ করিতেন না। তিনি স্বীয় পতির আত্ম-সম্মানকে এত মূল্যবান জ্ঞান করিলেন যে, কিয়ৎকাল পরেই সন্তুষ্টচিত্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কদমতলাতে পতিগৃহে নিতান্ত সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তিনি গুরুজনের আদেশের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া ঘর নিকাইতেন, জল তুলিতেন, ধান ভানিতেন, সমুদয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং তদুপরি এতগুলি পুত্র কন্যার পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অথচ একটি দিনের জন্য কেহ তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিত না। তিনি ধনীর কন্যা হইয়া কিরূপ দারিদ্র্যে বাস করিতেছেন তাহা দেখিয়া কেহ তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে সে দয়া তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ধান

ভাসিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার পিতৃগৃহের একজন প্রাচীন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থাতে দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"আমি এই খানে বড় সুখে আছি। তুমি মাকে বলিও আমার কোনও দুঃখ নাই। আমি কাজ করিতে বড় ভালবাসি।" তিনি রূপে গুণে লোকের চিত্তকে এমনি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি চলিয়া যাইতেন লোকে পশ্চাৎ হইতে বলিত—"যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

এই লাহিড়ী ও রায়পরিবারদিগের একটি বিশেষ সদ্গুণ এখানেই উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবন্ধন অতীব স্পৃহণীয়। জগদ্ধাত্রী যখন সন্তুষ্টচিত্তে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতেন, নিজ দুঃখের কথা কাহাকেও শুনাইতেন না, তখন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতেন না। প্রায় প্রতিদিন নীলকুঠী হইতে ফিরিয়া গৃহে যাইবার সময় ভগিনীর গৃহে পদার্পণ করিতেন এবং গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইতেন। এইরূপ মাতামহকুলে রামতনু জন্মগ্রহণ করিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ সামান্য পৈত্রিক বিষয়ের আয়ের দ্বারা ও নিজে তৎকাল-প্রসিদ্ধ লালা বাবুদিগের ম্যানেজারি করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তদ্দ্বারা কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্রের দৌহিত্রদ্বয় হরিপ্রসন্ন রায় ও নন্দপ্রসন্ন রায়, সে সময়ে বড় লালা ও নূতন লালা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামকৃষ্ণ ইঁহাদের সামান্য বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজারি করিতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সদাশয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও সাধুচরিত্রের বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা কৃষ্ণনগরে প্রচলিত আছে। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় আত্মজীবনচরিতে এক স্থানে বলিয়াছেন;—"এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও দোষ কখনও কেহ দেখেন নাই বা শুনেন নাই; পরন্তু সকলেই তাঁহাদের গুণের কথা কীর্ত্তন করিতেন।"

রামকৃষ্ণ নিজে যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ প্রভুও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লালা বাবুদের ম্যানেজারির বেতন স্বল্পই ছিল। ধর্ম্মভীরু রামকৃষ্ণ উপরি আয়ের দিকে চাহিতেন না, সুতরাং কেশবচন্দ্র উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লেশেই তাঁহার সংসার চলিত।

রামকৃষ্ণ সন্তানদিগকে সর্ব্বদা কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন; প্রতিদিন সায়ংকালে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কিয়ৎকাল ধর্ম্মালোচনাতে যাপন করিতেন। সে সময়ে পাড়াতে দেবীপ্রসাদ চৌধুরী নামে একজন ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ইনি স্থানীয় আদালতে মহাফেজের কাজ করিতেন। দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান, স্বীয় ভবনে শাস্ত্রপাঠ, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দুগৃহস্থোচিত সমুদয় কার্য্যের জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে আসিতেন। তদ্ভিন্ন বিষয়-কর্ম্ম সূত্রেও বহুসংখ্যক লোক তাঁহার অনুগত ছিল। তাঁহার বাড়ী এখনও কৃষ্ণনগরে চৌধুরীবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ভবনে গিয়া বসিতেন। সেখানে নসীরাম দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিতেন। সেই সাধুসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের সায়ংকালটা সুখেই কাটিত। তিনি যাইবার সময় কেশবচন্দ্রকে, পরে রামতনুকে, সঙ্গে লইয়া যাইতেন। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একব্যক্তি ইংরাজী জানিতেন। শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া বৃদ্ধেরা ধর্ম্মালোচনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। নসীরাম দত্তের উল্লেখ করিয়া রামতনু বাবু তাঁহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"হায়। তাঁহাকে আর এ জীবনে দেখিব না।" এই নসীরাম দত্তের বিষয়েই কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখিয়াছেন;—"কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়াবাসী নসীরাম দত্তের পুত্র যে এক পূজার কোঠা প্রস্তুত করেন, তাহার অব্যবহিত সম্মুখের ভূমির অধিকারী তত্র একজন ছিলেন। সেই ভূমিখণ্ড না পাইলে তাঁহাদের পূজার কোঠা অকর্ম্মণ্য হয় বলিয়া ঐ পুত্র তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ঐ অন্যায় অধিকার রহিত করিবার জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচারক ইহার তদন্তের জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, অর্থী কহিলেন যে, "যদি প্রত্যর্থী আপনার সাক্ষাতে শুদ্ধ কহেন যে, এ ভূমি তাঁহার, তাহা হইলে আর আমি ঐ ভূমির দাবী রাখি না।" নসীরামের পুত্র পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে তাঁহাকে বাটীর মধ্যে রাখিয়াছিলেন। বিচারপতির আদেশে তাঁহাকে তদন্ত স্থানে আসিতে হইল। বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি অতি ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "উহাকে (পুত্রকে) আমি ঐ ভূমি অধিকার করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি লক্ষ্মীছাড়া আমার কথা শুনে নাই, ঐ ভূমিতে আমার কোন সত্ব নাই।"

রামকৃষ্ণ নিজে যেমন সাধু ছিলেন, তেমনি সাধু সদাশয় ব্যক্তিদের সঙ্গেই মিশিতেন। জনকজননীর দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ বৃথা যায় নাই। তাঁহাদের সন্তানগণ বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কেশবচন্দ্র লাহিড়ী শৈশব হইতে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে একবার তিনি গুরুজনের আদেশে গোয়াড়ি হইতে নিজস্কন্ধে এক মণ চাউলের বস্তা বহিয়া দিয়াছিলেন। আর একবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে কেশবচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, পিতামহী ঠাকুরাণীর গৃহে উঠিবার পৈঠাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন কাহাকেও কিছু বলিলেন না; পরে পিতামহী শয়ন করিলে, পাড়ার দুই একটি অনুগত সমবয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া, রাতারাতি ইষ্টক প্রভৃতি সংগ্রহ পূর্ব্বক, পৈঠাটি মেরামত করিয়া ফেলিলেন। প্রাতে পিতামহী

ঠাকুরাণী দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়া কহিলেন—"এ কেশবের কাজ আর কারু নয়।" কেশবকে তিনি এমনি চিনিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র লাহিড়ীর জীবনের ঘটনা সকল সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ীর মহাশয়ের যে প্রকার ভক্তি দেখিতাম তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠের চরিত্র তাঁহার চরিত্র গঠন বিষয়ে বিশেষরূপে কাজ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সাধুতার পরোক্ষ প্রমাণ কিছু কিছু আছে। তিনি যখন কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আলিপুরে জজ আদালতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঐ কর্ম্ম ব্যতীত তিনি অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় লোকের মোকদ্দমাদির সহায়তা করিয়া এক প্রকার মোক্তারের কাজ করিতেন; তাহাতেও কিছু কিছু উপরি আয় হইত। সে সময়ে আদালতের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করিত, তাহারা উৎকোচ, মিথ্যাসাক্ষ্য, প্রবঞ্চনাদির দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই ধনী হইয়া উঠিত। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অতিরিক্ত আয় এত অল্পই ছিল যে, তিনি নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ ও কৃষ্ণনগরের বাটীর সাহায্য করিয়া কলিকাতায় ভ্রাতাদিগের শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহাকে পরের অনুগ্রহাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল।

এইরূপ পিতা, মাতা ও এরূপ জ্যেষ্ঠের ক্রোড়ে শিশু রামতনু জন্মগ্রহণ করিলেন। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে ছয়টি সন্তানের পর, বিশেষতঃ কয়েকটি গত হওয়ার পর, পুত্র সন্তান জন্মিলে সেটি কিরূপ আদরের সামগ্রী হয়, সকলে তাহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তাহাতে আবার মাতামহ রাধাকান্ত রায় মহাশয় রাজবাটীর দেওয়ান ও গ্রামের মধ্যে গণ্যমান্য লোক ছিলেন। সুতরাং ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যে, শিশু রামতনু ভূমিষ্ঠ হইলে স্বল্পকালের মধ্যেই বারুইহুদা ও কৃষ্ণনগরের লোক জানিতে পারিল দেওয়ানজীর দৌহিত্র জন্মিয়াছে। সূতিকাগৃহের দ্বারে সমাগত পল্লী-বাসিনীগণের মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনিতে ক্ষুদ্র গ্রামখানি কাঁপিয়া উঠিল। পুরস্কারের প্রত্যাশায় দলে দলে বাদকগণ আসিয়া নিরন্তর বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল; বারুইহুদার বাটী হইতে সুসংবাদ লইয়া কৃষ্ণনগরের বাটীতে লোক ছুটিল; পথে, ঘাটে, সরোবরে স্নানের কালে, গৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন— "লাহিড়ীদের ছেলে হয়েছে; আহা বেঁচে থাকলে হয়!"

এবম্প্রকার অভ্যর্থনার মধ্যে রামতনু সূর্য্যের আলোক দেখিলেন। তৎপরে প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যে সকল কৃত্য ও কুলাচার হইয়া থাকে সকলি হইল। অর্থাৎ অষ্টাহে আটকৌড়া, সূতিকা-নিষ্ক্রমণ সময়ে ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য যথাবিহিত প্রণালীতে নিষ্পাদিত হইল।

অতঃপর শিশু রামতনু সূতিকা কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া সকলের চক্ষের অগোচরে, জননীর স্নেহময় বক্ষে, শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন

বাড়িতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র নবজাত সহোদরের রূপগুণের বর্ণনা করিয়া জননীকে কতই উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ করান হইল। সে সময়ে পাঠশালাতে শিশুগণের পাঠারম্ভ হইত। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একটি পাঠশালা ছিল। সম্ভবতঃ সেইখানেই শিশু রামতনুর পাঠারম্ভ হয়। সে সময়কার পাঠশালের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তাঁহারা আসিয়া কোনও ভদ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দার পড়োয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিত। বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এইজন্য বলিতেছি, তৎকালে পাঠ্যগ্রন্থ পড়িবার রীতি ছিল না। কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিত, এবং যাঁহারা সন্তানদিগকে রাজকার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে পারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী সরকারে কর্ম্ম করিতে বা বিষয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে থাকিত।

পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল যে, বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত; সর্ব্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত। সে সময়ে শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এই টুকু স্মরণ আছে যে, পাঠশালে শিক্ষিত বালকগণ মানসাঙ্ক বিষয়ে আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখাইত; মুখে মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক কষিয়া দিতে পারিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড় হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিত। এক্ষণে যেমন ভৃত্যের দশ দিনের বেতন দিতে হইলেও ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কাগজ ও পেন্সিল চাই, ত্রৈরাশিকের অঙ্কপাত করিয়া কাগজ ভরিয়া ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না।

গুরুমহাশয়গণ বর্ত্তমান স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোনও কমিটী বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন বালককে বা বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে মাসে সামান্য ১০।১২ টাকা আয় হইত। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব, পার্ব্বণ, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপরি কিছু কিছু জুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে ছেলে লুকাইয়া গুরুমহাশয়কে যত দিতে পারিত, সে তত তাঁহার প্রিয় হইত। সে অনুপস্থিত থাকিলে বা পাঠে অমনযোগী হইলেও সমুচিত সাজা পাইত না। যে সকল বালক কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। উঠিতে বসিতে, নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত। হাত ছড়ি, নাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল। পাঠশালে আসিতে বিলম্ব হইলে হাত ছড়ি খাইতে হইত; অর্থাৎ আসনে বসিবার পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাতা পাতিয়া দাঁড়াইতে হইত, অমনি সপাসপ, পাঁচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল হাত ছড়ি। নাড়ুগোপাল আর এক প্রকার। অপরাধী বালককে গোপালের ন্যায়, অর্থাৎ চতুষ্পাশালী শিশুর ন্যায় দুই পদ ও এক হস্তের উপরে রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোন ভারি দ্রব্য চাপাইয়া দেওয়া হইত; হাত ভারিয়া গেলে, বা কোনও প্রকারে ভারি দ্রব্যটি স্বস্থানভ্রষ্ট হইলে তাহার পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক গুরুতর বেত্র প্রহার করা হইত। ত্রিভঙ্গ আর এক প্রকার। শ্যামের বঙ্কিম মূর্ত্তির ন্যায় বালককে এক পায়ে দণ্ডায়মান করিয়া হস্তে একটি গুরু দ্রব্য দেওয়া হইত; একটু হেলিলে বা বারেক মাত্র পা খানি মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত। কোন কোনও গুরু ইহার অপেক্ষাও গুরুতর শাস্তি দিতেন; তাহাকে চ্যাংদোলা বলিত। কোনও বালক প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে পালাইলে বা পাঠশালে না আসিলে এই চ্যাংদোলা সাজা পাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্য চারি পাঁচ জন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ও বলবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহারা তাহাকে ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, বা বৃক্ষশাখায় যেখানে পাইত সেখান হইতে বন্দী করিয়া আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দিত না, হাতে পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিত। তাহার নাম চ্যাংদোলা। এই চ্যাংদোলা অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে সেই অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন। এই প্রহার এক এক সময়ে এত গুরুতর হইত যে, হতভাগ্য বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় মলমূত্রে ক্লিন্ন হইয়া যাইত।

১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক, মিষ্টার উইলিয়াম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা সকলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রায় চতুর্দ্দশ প্রকার সাজা দিবার প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বালক মাটিতে বসিয়া নিজের এক খানা পা নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকিবে; বা নিজের

উরুর তল দিয়া নিজের হাত চালাইয়া নিজের কান ধরিয়া থাকিবে; বা তাহার হাত পা বাঁধিয়া পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া জলবিছুটী দেওয়া হইবে, সে চুলকাইতে পারিবে না; বা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে বালককে পূরিয়া মাটিতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যকালেও যে এই সকল সাজার প্রকার ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, শাস্তির ভয়ে বালকেরা অনেক সময়ে পাঠশালা হইতে পলাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিত। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ইহার কয়েক বৎসরের পরের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন:— "আমার সমবয়স্ক স্বসম্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরের চৌধুরীদিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতো ভ্রাতা ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমার বাটীতে আসিতেন, কিন্তু গুরু মহাশয়ের চরেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটিতে রক্ষা পাইবার অনুপায় দেখিয়া একদা এক বারওয়ারি ঘরের মাচার উপরে অনাহারে এক দিবা ও এক রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে যাপন করেন। ঐ গুরুমহাশয় চৌধুরীবাটীর এক বালকের গুহ্যদেশ এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে, তাহার চিহ্ন যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।"

লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার দৈনিক লিপিতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, তিনিও এক এক সময়ে প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে পলাইতেন; সেজন্য তাঁহার পিতা গভীর মনোবেদনা পাইতেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে একটি বালক ছিল, সে অল্প বয়সেই চুরি বিদ্যাতে পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বালকটি তাহাকে চুরি করিবার জন্য সর্ব্বদা প্ররোচনা করিত। লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে, তাহার প্ররোচনাতে তিনি চুরি করিতে শিখিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসেন ও অনেক তিরস্কার করেন। লাহিড়ী মহাশয় এই ঘটনার অন্ততঃ ষাটি বৎসর পরে তাঁহার দৈনিক লিপিতে লিখিয়াছেন—"হায়! আমি তখন আমার জ্যেষ্ঠের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে সাহসী হই নাই, কেবল কাঁদিয়াছিলাম।" যিনি ষাটি বৎসর পরে স্বকৃত একটি বাল্যসুলভ পাপ স্মরণ করিয়া হায় হায় করিতে পারেন, তিনি যে কি ধাতুতে গঠিত ছিলেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

বালক রামতনুর ঘোড়া চড়িবার বাতিকটা অতিশয় প্রবল ছিল। এরূপ অনুমান করা যায়, তখন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও জনপদ সকল হইতে কখন কখনও লোকে বেতো ঘোড়া চড়িয়া কৃষ্ণনগরে মামলা মোকদ্দমা বা বিষয়কর্ম্ম করিতে আসিত। তদ্ভিন্ন কলিকাতার অনুকরণে নূতন ধরনের কতকগুলি

ভাড়াটিয়া গাড়ি চলাও আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সকল শকটের ঘোড়া যথেচ্ছভাবে রাজপথের পার্শ্বে, বা মাঠে চড়িয়া বেড়াইত। বালক রামতনু সমবয়স্ক বন্ধুদলে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ সকল ঘোড়া ধরিয়া চড়িতেন। যাহাদের ঘোড়া তাহারা জানিতে পারিলে তাড়া করিত, তখন বালকদল চক্ষের নিমিষে খানাখন্দ পার হইয়া পলায়ন করিত। এই ঘোড়া চড়িবার সখটা এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটি অধিক বয়স্ক বালক ঘোড়া কিনিবার জন্য এক জনের অনেকগুলি টাকা চুরি করিয়াছিল। তিনি তখন তাহার উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন।

বালক রামতনু যে কেবল ঘোড়া চড়িয়া সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন তাহা নহে। তখন কৃষ্ণনগরের চতুর্দ্দিকে বালকদলের বিহারোপযোগী অনেক উদ্যান ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছিল। রাজপরিবার ও তৎসংসৃষ্ট পরিবারগণ এই সকল উদ্যানের সত্বাধিকারী ছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রীবন সর্ব্বোপরি উল্লেখ-যোগ্য। এই উদ্যানটি কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে অঞ্জনা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই উদ্যান স্থাপন করিয়া এখানে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। তদবধি ইহা কৃষ্ণনগরের একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল। দুঃখের বিষয় শ্রীবনের সে পুর্ব্ব শ্রী আর নাই। যে সুরম্য প্রাসাদ ইহার প্রধান সৌন্দর্য্য ছিল তাহার ভগ্নাবশেষও এখন নাই। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকার উক্ত স্থানের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"এই স্থান অতি রমণীয়। অঞ্জনা যদিও এখন স্থির-সলিলা হইয়া গতিবিহীনা হইয়াছে, তথাপি তদীয় পূর্ব্বকালীন মনোহারিণী শোভা এককালে তিরোহিত হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ইহার উভয় কূলে গ্রাম্য বৃক্ষ-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এরূপ অপরূপ শোভা হইয়া রহিয়াছে, যেন কোন প্রকৃতি-প্রিয় মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, নিবিড় কানন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, অথবা রজনীকালে, এই নদীতে নৌকারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন সঞ্চারণ করিবামাত্র অসুস্থ হৃদয়ে সুস্থতা লাভ হয়। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে আমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুসূদন এই নদীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে কহিয়াছিলেন,—"হে অঞ্জনে! তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তোমাকে কখনই ভুলিব না এবং তোমার বর্ণনা করিতেও ক্রটি করিব না।" এই রাজার (ঈশ্বরচন্দ্রের) পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষেরা এই নদীতটস্থ প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে যে কানন আছে, তাহাতে বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার নাম মধুপোল এবং ঐ কাননের পূর্ব্বাংশে যে উপবন আছে তাহার নাম আনন্দ-কানন রাখেন। মধুপোল অশোক, চম্পক, বক, কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচুকুন্দ, কিংশুক, শাল্মলী ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ-শ্রেণীতে

শোভিত ছিল ; এক্ষণে কেবল কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষমাত্র আছে। তথাপি বসন্তকালে এই তরুরাজি বিকশিত রক্তবর্ণ কুসুমাবলিতে অলঙ্কৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল একদা আমাদের সুবিখ্যাত কবি মদনমোহন কাব্য-রত্নাকর এই শোভা সন্দর্শনে লিখিয়াছিলেন—"জগদীশ্বর সর্ব্বভূতকে অদ্ভুত প্রদর্শনার্থ যেন রাশীভূত সিন্দুর রক্ষা করিয়াছেন।"

এই কবিজনের মনোহরণকারী সুরম্য কানন যে বালক রামতনু ও তাঁহার বয়স্যগণকে বার বার আকৃষ্ট করিত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা সকলেই এক কালে বালক ছিলাম ; অনেকেই পল্লীগ্রামে প্রকৃতির নিশুব্ধ রমণীয়তার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি ; সুতরাং বালক কালের সে সুখের কথা সকলেই স্মরণ করিতে পারি। গ্রামের পার্শ্বে যে কিছু রমণীয় দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, যে কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছিল, যে কিছু সম্ভোগ্য পদার্থ ছিল, আমরা কিছুই দেখিতে বা সম্ভোগ করিতে ছাড়ি নাই। বালক রামতনু ও তাঁহার বয়স্যগণও ছাড়েন নাই। সে সকল সম্ভোগের বস্তু এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু হায় সে সম্ভোগের শক্তি হারাইয়াছি। জীবনের ক্ষুদ্র সুখে সে অভিনিবেশ চলিয়া গিয়াছে! বোধ হয় হৃদয়ের প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা হারাইয়াছি বলিয়াই তাহা চলিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বরের এই সৌন্দর্য্যময় জগতে সুখের আয়োজন যথেষ্ট আছে ; কিন্তু সে সুখ বোধ হয় কেবল পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তির জন্যই আছে, অপরের জন্য নহে। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকার তাঁহারই স্বপ্রণীত আত্ম-জীবনচরিতে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন ;—"বোধ হয় যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখই তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যে সকল সুখ ভোগ করিয়াছি, সে সব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র যেন পলাইয়া যায়। ধরিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও আর ধরা যায় না। সেই শ্রীবন, সেই লালবাগ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু তৎসমুদয় ত আর আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহা হয় না। স্পৃহা দূরে থাকুক তাহার নামও উল্লেখ করা যায় না।"

যাহা হউক বিবিধ প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নির্ম্মল বাল্য সুখে রামতনুর বাল্যকাল গত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত বালুকা-রাশির দ্বারা নির্ম্মিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প কাল হইল মানবের আবাস ভূমিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণের জন্য আগমন করেন, তখন তাম্রলিপ্তক বা তমলুক নগরকে সমুদ্রতটে দেখিয়াছিলেন। এই নগর উৎকলের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ও বৌদ্ধগণের একটি প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখানে সহস্রাধিক বৌদ্ধ যতিকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তমলুক এখন সমুদ্র-তীর হইতে কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে! গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত বালুকারাশি দ্বারা গঙ্গার মুখভাগ ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া বঙ্গদেশের পরিসর কতই বর্দ্ধিত হইতেছে! সাগরগামিনী নদী

সকলের তরঙ্গানীত বালুকারাশির ও সাগরতরঙ্গানীত বালুকারাশির ঘাত প্রতিঘাতে বালুশৈল সকল উত্থিত হইয়া নদী সকলের মুখে কি পরিবর্ত্তনই ঘট.ইতেছে। অনুমান করি, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ এই প্রকার সাগর-গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া মানবের বাসোপযোগী হইয়া থাকিবে। সে অধিক দিনের কথা নহে। ইতিহাসের গণনায় বহু পূর্ব্বে হইলেও মানব-সমাজের যুগ গণনাতে বহু দূর নহে। সুতরাং বঙ্গভূমির দক্ষিণ বিভাগের ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি এখনও নবীন রহিয়াছে। এই জন্য এই ভূমি-ভাগ শ্যামল উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ, ফল-শস্য-ভূষিত ও নয়ন মনের প্রীতিকর। এই কারণে বিদেশীয় পর্য্যটকগণ বঙ্গভূমিকে ভারতের উদ্যান-ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই উদ্যান-ভূমির মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ নবদ্বীপ বিভাগ বিচিত্র রমণীয়তাতে পূর্ণ ছিল। এইরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে বালককাল অতীত হইলে তাহা যে সুখেই অতীত হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বালক রামতনু পূর্ণমাত্রায় সে সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বালক রামতনু এইরূপে বয়স্যদিগের সহিত আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় পিতা মাতা তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সে সময়ে দেশের, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর সমাজের, নীতি-সম্বন্ধীয় জল-বায়ু দূষিত ছিল। সাধু রামকৃষ্ণের ন্যায় নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীয় গৃহে ও পরিবারে যে সকল সদ্‌গুণ দেখিতে চাহিতেন দেশীয় সমাজে সে সকল সদ্‌গুণের বড়ই অভাব হইয়াছিল। বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি সম্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে, হিন্দু রাজত্বের অভ্যুদয়ে ও প্রভাব কালে প্রাচীন গ্রীকপর্য্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু জাতিকে, সাহসী, সত্য-নিষ্ঠ, সরল-প্রকৃতি, আতিথেয়, স্বদার-নিরত দেখিয়া গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাঁহাদের রাজ-সভার দূষিত সংস্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্ব্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে থাকে। মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা। যদিও বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, এবং কৌলীন্য প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনীদিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং সেটা যেন এক-প্রকার সম্ভ্রমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংস্রবে হিন্দুধনীদিগের মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা। ইহা যেন

প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকার্য্য হইত সেই যেন বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইত। এইটি মুসলমান অধিকারের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কারণে দেখিতে পাই মুসলমান অধিকার কালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি, এই অধিকার কালে যে সকল তন্ত্র শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতেও ইন্দ্রিয়াসক্তি ধর্ম্মের নাম ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে। এই কালমধ্যে অভ্যুদিত অধিকাংশ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়াসক্তির পূতিগন্ধে আপ্লুত।

মুসলমান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামোদপ্রিয়তা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা। দেশীয় ধনীগণ তোষামোদ, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার প্রত্যাশায় অপর সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। এইরূপে পরাধীনতাবশতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, লোকে মিথ্যা কহিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা পাইত না। তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরাজদিগের রাজত্ব আদালতের প্রণালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইলে তাহাও অন্তর্হিত হইল। লোকে দেখিল সত্য নির্দ্ধারণ ইংরাজের আইন বা আদালতের লক্ষ্য নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্য। সুতরাং লোকে জানিল যে, যে যত মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহারই জয়াশা তত অধিক এইরূপে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইল। লোকে জাল জুয়াচুরি দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি দ্বারা ধনলাভ করিয়া সমাজ মধ্যে গৌরব লাভ করিতে লাগিল। দেশের একপ দুর্দ্দশা না ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালিজাতির প্রতি যেরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন না। দেশের সাধারণ নীতির এই দুর্গতি হওয়াতে সর্ব্বত্রই লোকের প্রতিদিনের আলাপ আচরণ তদনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগরও সেই দূষিত বায়ুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন এবং রাজা গিরীশচন্দ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় গিরীশচন্দ্রের অধিকার কালেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম কেন্দ্রীভূত রাজ-পরিবার ও তাঁহাদের স্বসম্পর্কীয়, সংসৃষ্ট ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ, ইঁহাদের সংখ্যাই বোধ হয় অধিক ছিল। দ্বিতীয় স্বাধীনবৃত্তি-সম্পন্ন পরিবারবর্গ,— ইঁহাদের অনেকে পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে নানাস্থানে

বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন; অপরাংশ বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশেরই অন্যান্য জেলাতে বাস করিতেছিলেন। তৃতীয় ইংরাজদিগের নব-প্রতিষ্ঠিত কাছারীর উকিল, মোক্তার আমলা প্রভৃতি; ইঁহাদের অধিকাংশ খড়িয়া তীরবর্ত্তী গোয়াড়ী নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন।

রাজা গিরীশচন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কথা অগ্রেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অতি অসার, অল্পবুদ্ধি ও নীচ-প্রকৃতি লোকের বশ্যতাপন্ন ছিলেন। তাঁহার সময়ে স্বার্থপর ও হীন-চরিত্র লোক সকল রাজবাটীকে ঘিরিয়াছিল। সুতরাং রাজবাটীর দৃষ্টান্ত ও হাওয়া কিরূপ ছিল সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই সময়ে রাজবাটীর সহিত লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ সংশ্রব হয়। সাধু রামকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঠাকুর দাস লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন গিরীশ-চন্দ্রের কার্য্যকারক ছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি।

রাজবাটিতে সচরাচর কিরূপ পাপ প্রশ্রয় পাইত তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পরবর্ত্তী রাজা শ্রীশচন্দ্রের সময় হইতে দিতেছি। শ্রীশচন্দ্রের বিবিধ সদ্গুণ সত্বেও তিনি ঐ সকল পাপে লিপ্ত ছিলেন, কারণ সে সকল পাপ তখন পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বলিখিত জীবনচরিতে উহার কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে দুইটি বিবরণ দিতেছি।

একটি বিবরণ এই, শ্রীশচন্দ্র অতিশয় গীতবাদ্যের অনুরাগী ছিলেন; সর্ব্বদা সুগায়ক সুগায়িকাদিগকে আনাইয়া গীতবাদ্য শুনিতেন। একবার এইরূপ এক গায়কদলে একটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে রাজা এক প্রকার কিনিয়া লইলেন। সেই বালিকা রাজবাড়ীতে নিয়মিত দাসীদলের মধ্যে পরিগণিতা হইয়া রহিল। রাজার অবসর হইলেই তাহাকে আনিয়া গান শুনিতেন। ক্রমে তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইল। তখন দেওয়ান রাজাকে বলিলেন—"এ বালিকা এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে চলিল, আর ইহাকে সভামধ্যে আনা কর্ত্তব্য নয়।" রাজা তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তৎপরে তাহাকে যখন তখন সুরাপান করাইয়া বন্ধুগণ-সহ তাহার সহিত হাস্য পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। আর একটি বিবরণ এই:—"এক রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠা-তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে। তখন সুরাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল ছিল; সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। ঐ সুন্দরী যখন পেশোয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণা হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ

যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা ঐ সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাঁহার পদ শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন।"

যে সমাজে সমাজপতি রাজা বন্ধুগণ-সহ একটা দাসী শ্রেণীস্থ বালিকাকে সুরাপান করাইয়া তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করতে লজ্জা বোধ করেন না, যে সমাজে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভবনে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ আমোদ চলিতে পারে, সে সমাজের নীতির অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

ইহা পরবর্ত্তী ঘটনা হইলেও গিরীশচন্দ্রের সময়ে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা ছিল না, তাহা বলিতে পারা যায়। রাজসংসারের সম্পর্কীয় ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের নীতি এই প্রকার হাওয়াতেই বর্দ্ধিত হইত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অনেকে বিদেশে বাস করিতেন সুতরাং কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার সহিত তাঁহাদের যোগ ছিল না, এজন্য তাঁহাদের বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করা গেল। যে সকল বিদেশীয় আমলা প্রভৃতি কর্ম্মসূত্রে গোয়াড়ীতে বাস করিতেন, তাঁহাদের অবস্থা কি ছিল দর্শন করুন। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় বলিতেছেন:—"গোয়াড়ীতে কয়েক ঘর গোপ মালোগাড়ার ও অন্যান্য নীচজাতির বসতি ছিল। পরে যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয় সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবেরা গোয়াড়ীর পশ্চিম দিকে ও তাঁহাদের আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা ইহার পূর্ব্বদিকে আপন আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল! যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয়ে লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।"

এ সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু লজ্জা বোধ করিয়া প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হইবে দেওয়ানজী তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের যে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তদনুরূপ

অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিদ্যমান ছিল। সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—"ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন," এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই? দেশের সর্ব্বত্রই এই সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অন্যান্য প্রদেশের ত কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভদ্রসন্তানেরা প্রকাশ্যভাবে দূষিত-চরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। এখনও কি করিতেছেন? এখনও প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে কলিকাতা সহরের ভদ্র পরিবারের যুবকগণ ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের অপরাপর বহু ভদ্রলোক গিয়া অর্থ প্রদান করিয়া উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। অপরাপর প্রদেশে এখনও যে অবস্থা রহিয়াছে তাহা অতীব লজ্জাজনক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবে কুলটাগণ প্রকাশ্যভাবে ভদ্রবংশীয় পুরুষগণের মধ্যে যাতায়াত করিতে সংকুচিত হয় না; পাঞ্জাবে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সঙ্গে বাস করে, তাহারা ইহাদের উপার্জ্জনের দ্বারা পালিত হয়; ইহাদের গর্হিত কাজটাও একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে! বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে অনেক দেবমন্দিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, নামে তাহাদের দেবতাদিগের সহিত বিবাহ হয়, কিন্তু ফলে তাহারা বিগর্হিত উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করে। ইহাদের সামাজিক অবস্থা প্রকাশ্য গণিকাদিগের অবস্থা অপেক্ষা একটু উন্নত। ইহারা অসংকোচে ভদ্রপরিবারের মধ্যে যাতায়াত করে; যাত্রা মহোৎসবাদিতে নৃত্যগীত করে; এবং অনেক স্থলে ভদ্রকুলকামিনীগণের অপেক্ষা অধিক সমাদর পায়। সুতরাং সে সময়কার কৃষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে শোক করিয়া আর কি করিব।

এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, তখন এ সম্বন্ধে দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা। তখন অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত। তরলমতি বালকেরাও এমন সকল বিষয় জানিত যাহা তাহাদিগের জানা উচিত নয়। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয়ের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ হইতে না হইতে পিতা রামকৃষ্ণ ও মাতা জগদ্ধাত্রী যে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের বালকদিগের সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধু রামকৃষ্ণ সন্তানদিগকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। কিন্তু নিজের বিষয় কর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখাও সম্ভব ছিল না। এরূপ অনুমান হয় যে, পিতা মাতা দেখিতেন যে তাঁহাদের সহস্র সতর্কতা সত্বেও সন্তান পল্লীর বালকদলে মিশিত এবং এবং এমন অনেক বিষয় শিক্ষা

করিত, যাহা তাহার জানা উচিত নয়। তখন তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্র তখন আলিপুরে কাজ করিতেন ও কালীঘাটের সন্নিহিত চেতলা নামক স্থানে বাসা করিয়া থাকিতেন। পিতা মাতার উদ্বেগ দেখিয়াই কেশবচন্দ্র বালককে কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ১৮২৬ সালে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে কলিকাতাতে আনিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লাহিড় মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারম্ভ
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী কালী-ঘাটের সন্নিকটস্থ চেতলা নামক স্থানে নিজ জ্যেষ্ঠের বাসাতে আসিলেন। জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র ভ্রাতার শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করেন, এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। তখন চেতলার সন্নিকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না। কেশবচন্দ্র ভ্রাতাকে উত্তমরূপ ইংরাজী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতাতে রাখা চাই, কিন্তু এই সুকুমার বয়সে সহোদরকে কোথায় রাখেন, কে বা তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, কিসেই বা তাহার থাকিবার ও শিক্ষার ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হয়, এই সকল ভাবিয়া দারুণ দুশ্চিন্তায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সময়ে তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন, যাহার ইষ্টফল লাহিড়ী মহাশয়ের পরজীবনে দেখা গিয়াছিল। এরূপ অনুমান করা যায় কলিকাতাতে আসিবার পূর্ব্বেই তৎকাল প্রচলিত রীতি অনুসারে রামতনু কিছুদিন পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বল্পরূপ ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়া আসিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধ্যাতে শিক্ষকের ভার গ্রহণ করিয়া কনিষ্ঠের এই দুই বিষয়ের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজে পারসী ও আরবীতে পারদর্শী ছিলেন; সুতরাং সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ খাতা বাঁধিয়া দিয়া ভ্রাতাকে মনযোগ সহকারে ইংরাজী লিখাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে কেহ লাহিড়ী মহাশয়ের হাতের ইংরাজী লেখার প্রশংসা করিলে তিনি বলিতেন "দাদা এই লেখার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।"

এইরূপে কেশবচন্দ্রের অবিশ্রান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে নবাগত সহোদরের শিক্ষা এক প্রকার চলিল। কিন্তু তাহা কেশবের মনঃপূত হইত না। কারণ দিবসের অধিকাংশ ভাগ তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে থাকিতে হইত, তখন বালক রামতনু বাসায় ভৃত্য বা দাসীর হস্তেই থাকিতেন। চেতলার দাস দাসীগণকে এখনও যেরূপ বিকৃত দেখা যায়, তখন তাহারা যে কিরূপ ছিল তাহা বলিতে পারি না। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি তীর্থস্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা অতি জঘন্য। বহুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিশীল নরনারী এই সকল স্থানে সর্ব্বদাই আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া বা পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিবার মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য লোক এই সকল তীর্থস্থানের চারিদিকে বাস করে। দুশ্চরিত্রা নারীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। যাত্রীদিগকে বাসা লইতে হইলে অনেক সময়ে এই সকল নারীদের ভবনেই বাসা লইতে হয়। তাহারা দিনে যাত্রীদিগকে বাসা দিয়াও রাত্রে বারাঙ্গনাবৃত্তি করিয়া দুই প্রকারে উপার্জ্জন করিতে থাকে। যখন রূপ ও যৌবন গত হয় তখন ইহাদের অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। চেতলা তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও চেতলা বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলণ্ডে যে সকল চাউলের রপ্তানী হইত চেতলা সে সকল চাউলের সর্ব্বপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতী আসিয়া কালীঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী টালির নালা নামক খালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝী প্রভৃতিতে চেতলা পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ প্রবাসবাসী বণিকদলের আবাসস্থানে কিরূপ লোকের সমাগম হয় সকলেই তাহা অবগত আছেন। সকলেই অনুমান করিতে পারেন কিরূপ সামাজিক জলবায়ুর মধ্যে ও কিরূপ সংসর্গে বালক রামতনু চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ স্থলে ও এরূপ সংসর্গে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই।

কেশবচন্দ্র এরূপ স্থানে ও এরূপ সংসর্গে ভ্রাতাকে রাখিয়া সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। কিরূপে তাহাকে সরাইতে পারেন সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেন। অবশেষে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন কালীশঙ্কর মৈত্র নামক নদীয়া জেলা নিবাসী একজন ভদ্রলোক কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামে কালীশঙ্করের একজন আত্মীয় ব্যক্তি মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত কোনও বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিতেন এবং হেয়ারের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল

তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনারি কেরী সাহেবের শিক্ষকরূপে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংস্কর্ত্তা ও প্রকাশকরূপে বঙ্গসমাজে পরিচিত হন। পরে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইলে, তাহার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ইঁহারই নিকটে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট পাঠনার রীতির অনেক আখ্যায়িকা সংস্কৃত কালেজে প্রচলিত আছে। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০।৬৫ বৎসরেরও অধিক হইবে এবং যখন কালেজে আসা যাওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন বোধ হইত, তখনও কালিদাসের 'শকুন্তলা' বা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' পড়াইবার সময়ে তিনি এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, পড়াইতে পড়াইতে ভাবাবেশে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতেন ও বর্ণিত বিষয়ের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অপর শিক্ষকদিগের মধ্যে কেবল D. L. Richardson-এর বিষয়েও এইরূপ শুনিয়াছি, তিনিও সেক্সপীয়র পড়াইবার সময়ে আত্মহারা হইতেন।

যাহা হউক এই সময়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কলিকাতা সহরের একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার হেয়ারের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেশবচন্দ্র, কালীশঙ্কর মৈত্রকে কর্ম্মলাভ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু তাহার প্রতিদান স্বরূপ এই কথা থাকিল যে, কালীশঙ্কর গৌরমোহনকে ধরিয়া রামতনুকে হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। গৌরমোহন এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন কৌলিন্য ও বংশমর্য্যাদার প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন যে, তিনি কুলীনের সন্তান বলিয়া বিদ্যালঙ্কার আনন্দের সহিত তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন।

একদিন গৌরমোহন, বালক রামতনুকে চেতলা হইতে আনাইয়া, সঙ্গে করিয়া গ্রে সাহেবের গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। হেয়ারের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উমেদার ও স্কুলের বালকের অপ্রতুল হইত না। বালকগণ আসিলে হেয়ার তাহাদিগকে শুধু মুখে যাইতে দিতেন না; পরিতোষপূর্ব্বক মিঠাই খাওয়াইয়া ছাড়িতেন। তাঁহার ভবনের সন্নিকটে এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল; তাহার সহিত হেয়ারের ঐ প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। বিদ্যালঙ্কার, বালক রামতনুকে সেই মিঠাইওয়ালার দোকানে বসাইয়া রাখিয়া হেয়ারের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে ভর্ত্তি করিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। হেয়ার এরূপ অনুরোধ উপরোধে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে, হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই

দলে দলে বালক—"me poor boy, have pity on me, me take in your school" বলিয়া তাঁহার পাল্কীর দুই ধারে ছুটিত। তদ্ভিন্ন পথে ঘাটে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অনুরোধ উপরোধ করিতেন। যে সময়ে বিদ্যালঙ্কার বালক রামতনুকে লইয়া উপস্থিত হন, সে সময়ে হেয়ার ফ্রী বালক লওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন; যে কয়টি ফ্রী রাখিয়াছিলেন সে সমুদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিদ্যালঙ্কারের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"খালি নাই, এখন লইতে পারিব না।"

বিদ্যালঙ্কার হেয়ারের নারীসুলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। তিনি নিরাশ না হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়া দিলেন—"হেয়ারের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে।" বালক রামতনু তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি হাতিবাগানে বিদ্যালঙ্কারের বাসা হইতে সকাল সকাল আহার করিয়া, কোনও দিন বা অনাহারে, হেয়ারের বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই গ্রে সাহেবের ভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতেন; এবং তাঁহার পাল্কীর সহিত ছুটিতে আরম্ভ করিতেন। হেয়ারের পাল্কী নানা স্থানে যাইত এবং এক এক স্থানে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিত। রামতনু সর্ব্বত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা করিতেন। একদিন অপরাহ্নে হেয়ার স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়া পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন বালকটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। অনুমানে বুঝিলেন সে দিন তাহার আহার হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আহার করিবে? বালক রামতনু আহারের কথা শুনিয়াই ভয় পাইলেন; বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী লোকের ভবনে আহার করিলে পাছে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—"না, আমার ক্ষুধা পায় নাই।" হেয়ার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমাকে সত্য বল, আমার বাটীতে তোমাকে খাইতে হইবে না, ঐ মিঠাইওয়ালা তোমাকে খাইতে দিবে। সত্য করিয়া বল আজ আহার করিয়াছ কি না?" বালক রামতনু কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"আজ আমার খাওয়া হয় নাই।" তখন মহামতি হেয়ার তাঁহার মিঠাইওয়ালাকে পেট ভরিয়া মিঠাই খাইতে দিতে বলিলেন। এই প্রকারে দিবাশেষে অনেক দিন হেয়ারের মিঠাইওয়ালার নিকট তাঁহার দিনের আহার মিলিত।

এইরূপে প্রায় দুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষে হেয়ার বুঝিলেন এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহার অতিশয় আগ্রহ। তখন তাঁহাকে ফ্রী বালকের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই অবস্থায় এক নূতন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। স্কুলের বালকদিগের পরিচ্ছন্নতার দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসিত তাহা দেখিয়া তিনি ক্লেশ পাইতেন। কোন কোনও দিন স্কুল বসিবার বা ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি গামছা হস্তে

স্কুলের দ্বারে দাঁড়াইতেন এবং প্রবেশ বা নির্গমনের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন বালকদিগকে ধরিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক মায়ের মত উত্তমরূপে গা মুছিয়া দিতেন। বালকদিগকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি ফ্রী বালকদিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করিবার সময় তাহাদের অভিভাবকদিগকে একখানা একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে যে, কোন বালক যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসে তাহা হইলে অভিভাবককে জরিমানা দিতে হইবে।

লাহিড়ী মহাশয়কে ভর্ত্তি করিবার সময়ে সেই প্রশ্ন উঠিল। হেয়ার বলিলেন,—তাঁহার জ্যেষ্ঠকে উক্ত প্রকার একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি যখন কলিকাতায় থাকি না, তখন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইতেছে তাহা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে; এইরূপ স্থলে আমি কিরূপে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করি। তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে বিদ্যালঙ্কার অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে রাজী করিলেন। রামতনু স্কুল সোসাইটির স্থাপিত স্কুলে ফ্রীবালকরূপে ভর্ত্তি হইলেন। ঐ স্কুল পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও তৎপরে হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে মহাত্মা হেয়ারের জীবনচরিত কিছু বলা আবশ্যক।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০০ সালে ঘড়িওয়ালার কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন। এখানে বাসকালে কর্ম্মসূত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়। হেয়ার নিজে উচ্চদরের শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে এদেশের লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। তদনুসারে তাঁহার দোকানে কেহ ঘড়ি কিনিতে বা মেরামত করিতে গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। ১৮১৪ সালে রামমোহন রায় যখন কলিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্পকালের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সভা ভঙ্গের পর দুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, এদেশীয় বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হইবে। আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট (Sir Hyde East) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে। মহাবিদ্যালয় বা বর্ত্তমান হিন্দুস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, হেয়ার তাহার কমিটীর একজন সভ্য

নিযুক্ত হইলেন। তিনি ডাক্তার এইচ. এইচ. উইলসনের (Dr. H. H. Wilson) পরামর্শের অধীন থাকিয়া অবিশ্রান্ত মনোযোগের সহিত স্কুলটির উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি দিবসে হিন্দুকালেজ খোলা হয়। সেই বৎসরেই হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে স্কুলবুক সোসাইটী নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। ঐ সভার সভ্যগণ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সভার স্থাপন বঙ্গদেশের নবযুগের একটি প্রধান ঘটনা। কারণ এই সভার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এদেশে শিক্ষার এক নূতন দ্বার ও নূতন রীতি উন্মুক্ত করিয়াছিল। রামমোহন রায় তাঁহার বন্ধু হেয়ারের সহায় হইয়া নূতন ধরনের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও জ্যাগ্রাফি নাম দিয়া একখানি ভূগোলবিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জ্যাগ্রাফির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে এই সভার সাহায্যে নানাপ্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিতে লাগিলেন।

১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটি নামে আর একটি সভা স্থাপিত হইল। হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব তাহার সম্পাদকের পদগ্রহণ করিলেন। কলিকাতার স্থানে স্থানে নূতন প্রণালীতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য ছিল। হেয়ার উহার প্রাণ ও প্রধান কার্য্য-নির্ব্বাহক ছিলেন। তিনি ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি সেজন্য তাঁহার ঘড়ির ব্যবসায় রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার বন্ধু গ্রেকে ঘড়ির কারবার বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে সহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় পূর্ব্বক তদুৎপন্ন আয় দ্বারা নিজের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং অনন্যকর্ম্মা হইয়া এদেশের বালকদিগকে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আড়পুলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পাল্কীতে আরোহণ পূর্ব্বক, তিনি স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্ত্তমান হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইতেন। প্রথমে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন; তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, তাহাদের ভবনে গিয়া তাহাদিগের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন; অবশেষে হিন্দুকালেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন; সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে সমস্ত দিন সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; সায়ংকালে বাস ভবনে

ফিরিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, অনেক বালকের আত্মীয় স্বজন নিজ নিজ ভবনে হেয়ারের মুখ এতবার দেখিতেন যে, অনেকে তাঁহাকে আপনার লোক মনে করিতেন। স্কুলের বালকদিগের প্রতি হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাঁহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিম্নশ্রেণীর শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে ঐ বল উর্দ্ধে ধরিয়া উদ্বাহু হইয়া শিশুদলের মধ্যে দাঁড়াইতেন, তাহারা চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত; কেহ কোমর জড়াইত; কেহ গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা স্কন্ধে ঝুলিত; তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বালকগুলির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রামতনুকে তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন এবং চিরদিন তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতেন।

লাহিড়ী মহাশয় যে দিন হেয়ারের স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেই দিন আর একজন উত্তরকাল-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি রাজা দিগম্বর মিত্র। তাঁহার তৎকালের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য, ইনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়কে ভর্ত্তি করিবার সময় হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বয়স কত?"

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—"১৩ বৎসর।"

হেয়ার বলিলেন—"না, তোমার বয়স ১২-র অধিক নয়।"

লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিলেন—"১৩ বৎসর।"

তথাপি হেয়ার বলিলেন, "না—১২ বৎসর"—এবং তাহাই লিখিয়া লইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। আমাদের বোধ হয় হেয়ার জানিতেন যে, এ দেশে লোকে বালক ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে ১৩ বৎসর বলে, কিন্তু ইংরাজী হিসাবে তাহা ১২ বৎসর, সেই জন্যই এই প্রকার করিয়া থাকিবেন।

সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষকের অল্পতাবশতঃ প্রথম শ্রেণীর বালকগণ অনেক সময়ে নিম্নতন শ্রেণী সকলে মনিটারের কাজ করিত। লাহিড়ী মহাশয় যখন সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রথম শ্রেণীর যাদব ও আদিত্য নামে দুইটি বালক মনিটারের কাজ করিত। এই দুইটি মনিটারের বিষয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শেষে এইমাত্র মনে ছিল যে, যাদব বালকদিগকে অতিশয় প্রহার করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের নিকট হইতে মিঠাই খাইবার পয়সা লইত। আদিত্য জাতিতে রজক ছিল

সে নাকি পরে একটা স্কুল করিবার ছল করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৭০০্ সাত শত টাকা ঠকাইয়া লইয়াছিল।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ত এক প্রকার হইল; কিন্তু কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠ করেন, সেই এক মহাচিন্তা। প্রথমে কেশবচন্দ্রের অনুরোধে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁহাকে আপন বাসায় রাখিতে সম্মত হইলেন। রামতনু সেখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিলেন। সে কালে কর্ম্মস্থানে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার রীতি ছিল না। কলিকাতাতে যাঁহারা বিষয় কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আত্মীয়ের আশ্রয়ে, না হয় দুই দশজনে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। গ্রামের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপার্জ্জনশীল হইলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে অনেকে একে একে আসিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাতে আশ্রয় লইতেন। কেহ বা কর্ম্মের আশায় নিষ্কর্ম্মা বসিয়া খাইতেন; কেহ বা কাজ কর্ম্ম করিয়া সামান্য উপার্জ্জন করিতেন। এরূপ ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করা ভদ্র-গৃহস্থ মাত্রেরই একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অধিকাংশস্থলেই-পাকাদি কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র পাচক রাখা হইত না। এই অন্নাশ্রিত বা নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণই পালা করিয়া রন্ধনাদি করিতেন। তাহা লইয়া সময়ে সময়ে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একজনের কার্য্য অপরে করিতে চাহিত না। আপনাদের মধ্যে কোনও অল্পবয়স্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসার নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও তাড়নাদির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্ত্তী করিয়া তাহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ কাজ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। এই সকল-কলিকাতা-প্রবাসী নিষ্কর্ম্মা লোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ হইত তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে সময়ে উপার্জ্জক কলিকাতা প্রবাসীদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক দেখা যাইত যাঁহারা জীবনে অন্ততঃ একবার চরিত্র-স্খলন জনিত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। তখন সুরাপানটা প্রবল হয় নাই; কিন্তু কলিকাতা প্রবাসীদিগের অনেকে গাঁজা ও চরস প্রভৃতিতে পরিপক্ক হইতেন।

অল্পবয়স্ক বালকগণ স্থানাভাবে এইরূপ বাসাতে এইরূপ সঙ্গে আসিয়াই বাস করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অসঙ্কুচিত আলাপ ও ইয়ারকির মধ্যে বাস করিয়া তাহারা অকালপক্ক হইয়া উঠিত। তাহাদের বয়সে যাহা জানা উচিত নয়, তাহা জানিত ও তদনুরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাঁতে মিশি লাগাইয়া ও বাঁকা সিঁতে কাটিয়া সহরের বাবুদের অনুকরণের প্রয়াস পাইত; চরস গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত; এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত।

বালক রামতনু বিদ্যালঙ্কারের হাতিবাগানস্থ বাসাতে এইরূপ সংসর্গে বাস করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি বিদ্যালঙ্কারের নিজের স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না; সুতরাং তাঁহার বাসাটি আরও ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। বাসার লোকে বালক রামতনুকে সর্ব্বদা রাঁধাইত এবং অপরাপর প্রকারে খাটাইত, সেজন্য তাঁহার পাঠেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত।

ক্রমে এই কথা কেশবচন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কনিষ্ঠকে লইয়া শ্যামপুকুর নামক স্থানে স্বীয় পিতার মাতুল-পুত্র রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের ভবনে রাখিয়া দিলেন। খাঁ মহাশয় সে সময়ে নীলের দালালি করিতেন। এখানে আসিয়া রামতনু একটু স্নেহ ও যত্ন পাইতে লাগিলেন। খাঁ মহাশয় সপরিবারে সহরে বাস করিতেন। তাঁহার গৃহিণী বালক রামতনুকে ভালবাসিতেন। কেশবচন্দ্র কনিষ্ঠের দুগ্ধ ও টিফিনের ব্যয় দিতেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত আর সকলই তিনি ঐ গৃহে পাইতেন। কেবল তাহা নহে, শ্যামপুকুরে আসিয়া তাঁহার আর একটা লাভ হইল। তাঁহার সহপাঠী বালক দিগম্বর মিত্র তখন শ্যামপুকুরের নিকটস্থ শ্যামবাজারে নিজের মাতুলালয়ে বাস করিতেন। রামতনু দিগম্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার মাতুলালয়ে গেলে দিগম্বরের মাতার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। দিগম্বরের জননী তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন। পিতার গৃহে ভাল দ্রব্য কিছু হইলেই ডাকিয়া খাওয়াইতেন এবং সময়ে সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি বিদেশে তাঁহার মাসীর কাজ করিতেন। এই স্নেহ ভালবাসার কথা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে অনেকবার এই স্নেহের বিষয় উল্লেখ করিতেন।

তখন সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে এরূপ প্রণয় সর্ব্বদা জন্মিত। সহরস্থ সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের জননীরা অনেক সময়ে বাস্তবিক মাতৃষ্বসার কাজ করিতেন। অনেক সময়ে প্রবাসবাসী বালকগণকে অনেক বিপদ ও প্রলোভন হইতে বাঁচাইতেন। আমাদেরই বালককালে একরূপে কতবার সুরক্ষিত হইয়াছি। অনেক স্থলে প্রবাসবাসী বালকগণ সহাধ্যায়ীদিগের জননীদিগকে মা বা মাসী ও তাঁহাদের ভগিনীদিগকে দিদি বা বোন বলিয়া ডাকিত এবং যথার্থই সেই প্রকার ব্যবহার পাইত। যাহারা জননী ও ভগিনীগণের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে দূরে আসিয়া পুরুষদলের নীচ আমোদের মধ্যে পড়িয়া থাকিত, তাহাদের পক্ষে এই স্নেহ ও ভালবাসা যে কি মহা ইষ্টসাধন করিত তাহা এখন বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না। উত্তরকালে যাঁহারা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত স্নেহ পাইয়া মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্যবন্ধু গোপালচন্দ্র ঘোষের জননী রাইমণির কথা সকলেই অবগত

আছেন। রাইমণি প্রবাস-সমাগত ঈশ্বরচন্দ্রের মাসীর স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ ও যত্নের দ্বারা কিরূপে তাঁহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবনচরিত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াশীল সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

ঠিক কথা! বিদ্যাসাগর যে কলিকাতার ন্যায় প্রলোভনপূর্ণ স্থানে পদার্পণ করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা রাইমণির স্নেহের গুণে। রামতনু বাবুও যে সুকুমার বয়সে, পাপপ্রলোভনের মধ্যে বাঁচিয়াছিলেন, তাহাও যে অনেকটা রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের গৃহিণীর ও দিগম্বর মিত্রের মাতার স্নেহের গুণে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? মাতা ভগিনীর স্নেহ ছাড়িয়া যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই স্নেহ এক মহা রক্ষাকবচের ন্যায় হইয়াছিল।

হায়! বর্ত্তমানকালে সহাধ্যায়ীদিগের ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত সে সখ্যভাব আর দেখা যায় না। এক্ষণে এক একটি শ্রেণীতে ৬০।৭০-এরও অধিক বালক বসে, সুতরাং সম্বৎসরের মধ্যে বালকে বালকে আলাপ পরিচয় হওয়া কঠিন, সখ্যস্থাপন ত দূরের কথা। লোকে মনে করিয়া থাকে, লিখিয়া পড়িয়া কৃতী ও কার্য্যক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা, কিন্তু গুরু শিষ্যে ভক্তির সম্বন্ধ, বালকে বালকে সখ্যভাব যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ তাহা অনেকে জানে না, সেইজন্য বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় মানুষ প্রস্তুত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

অতঃপর কলিকাতার তদানীন্তন স্বাস্থ্যের অবস্থার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান গ্যাসালোকে আলোকিত, প্রশস্ত-রাজ-বর্ত্ম-মণ্ডিত, ড্রেণ-

সমন্বিত কলিকাতাতে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা সে সময়কার স্কুলের বালকগণের কঠোর তপস্যার ভাব কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। তখন কলিকাতায় আসিলে অধিকাংশ বালকই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার গুরুতর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইত। এই পীড়া সচরাচর অজীর্ণতাদোষ রূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিত; পরে জ্বর বিকার দিয়া উপসংহার করিত। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, ইহারই কয়েক বৎসর পরে বিদ্যাশিক্ষার্থ আসিয়া কিছুদিন রামতনু বাবুর বাসাতে ছিলেন। তিনি সে সময়কার কলিকাতার অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"তৎকালে মফঃস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে 'লোণা লাগা' কহিত। যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোণা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত, একারণ আমি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল; এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গয়ের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ সেবনে কোনও উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল।"

এখন মফঃস্বল হইতে পীড়িত হইয়া লোকে সুস্থ হইবার জন্য কলিকাতা নগরীতে আগমন করে; তখন কলিকাতাতে দুইমাস থাকিলেই লোকের শরীর ভগ্ন হইত এবং কলিকাতা হইতে বাহির হইলে তৎপর দিনই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইত! সে সময়ে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল তাহাতে এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র ছিল না। তখন জলের কল ছিল না, প্রত্যেক ভবনে এক একটি কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই চারিটি পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি, যখন কলিকাতার পত্তন হয় তখন বর্ত্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। সহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের ক্ষেতে পুষ্করিণী খনন করিয়া বাস্তুভিটা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়াছে। এই অনুমানের আর একটি প্রমাণ এই যে, পুষ্করিণী সকল সহরের পূর্ব্বাংশেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ সুতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রাম সকল নদীর পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল, সেখানে অধিক পুষ্করিণীর প্রয়োজন ছিল না।

এই পুষ্করিণীগুলি জ্বরের উৎস স্বরূপ ছিল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে কয়েকটি দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে দিতেন না; সেইগুলি লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্ব্বপ্রধান ছিল। উড়িয়া ভারিগণ ঐ জল বহন করিয়া গৃহে গৃহে যোগাইত। যখন জলের এই প্রকার দুরবস্থা তখন অপরদিকে সহরের বহিরাকৃতি অতি ভয়ঙ্কর ছিল। এখনকার ফুটপাতের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক একটি সুবিস্তীর্ণ নর্দ্দামা ছিল। কোন কোনও নর্দ্দামার পরিসর আট দশ হাতের অধিক ছিল। ঐ সকল নর্দ্দামা কর্দ্দম ও পঙ্কে এরূপ পূর্ণ থাকিত যে, একবার একটি ক্ষিপ্ত হস্তী ঐরূপ একটি নর্দ্দামাতে পড়িয়া প্রায় অর্দ্ধেক প্রোথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল। এই সকল নর্দ্দামা হইতে যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বর্দ্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই পথের পার্শ্বে এক একটি শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ দিন রাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে বস্ত্রদ্বারা আবৃত না করিয়া সেই সকল পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না। মাছি ও মশার উপদ্রবে দিন রাত্রির মধ্যে কখনই নিরুদ্বেগে বসিয়া কাজ করিতে পারা যাইত না। এই সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
দুই নিয়ে কল্‌কেতায় আছি।"

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদ্‌গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে, পূজা পার্ব্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্ত্তকী সহরে আসিত, তাহারা বাঈজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন

কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

● এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমব্রিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত: এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।

এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিত পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে, সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একটা একটা আড্ডা ছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে এক একজন এক একটি পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঁজাতে উন্নতিলাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত! এবিষয়ে সহরে অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক ভদ্রসন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া কাঠঠোকরার পদ পাইল। কয়েকদিন পরে তাহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অমনি সে "কড়ড্‌ঠক্" করিয়া তাঁহার হস্তে ঠুকরাইয়া দিল!

কবি, পাঁচালি ও বুলবুলির লড়াই-এর একটু বর্ণনা আবশ্যক। কবির গান সচরাচর দুইদলে হইত। কোনও একটা পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দুই দল দুই পক্ষ লইত। মনে করুন একদল হইল যেন কৃষ্ণ-পক্ষ আর এক দল হইল যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ

করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সহরে হরু ঠাকুর ও তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও সহরে অনেক বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিল। ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রুতকবি থাকিত; তাহাদিগকে সরকার বা বাঁধনদার বলিত। বাঁধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি তখনি গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন কোনও কবির দলে বাঁধনদারের কাজ করিয়াছিলেন। দ্রুতকবিত্বের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সে সময়ে আণ্টুনী ফিরিঙ্গী নামে একজন কবিওয়ালা ছিল। আণ্টুনী ফরাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান। বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়ালা হইয়া উঠে। আণ্টুনী নিজে একজন দ্রুতকবি ছিল। আণ্টুনী একবার গান বাধিল,

"ও মা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি জেনে আমি ফিরিঙ্গী।"

তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল ;—

"যিশুখ্রীষ্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে,
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক তরাতে।" ইত্যাদি।

এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সর্বদাই হইত। হাপ আকড়াইগুলি অধিকাংশ স্থলে সখের দল ছিল। তাহাতে ভদ্র পরিবারের যুবকদল দলবদ্ধ হইয়া নানা বাদ্যযন্ত্রসহ গান করিত।

পাঁচালির ব্যাপার অন্য প্রকার। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ে তাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল-গায়ক স্বরূপ হইয়া সুর ও তান সহকারে, পদ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণনা করিত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবসূচক এক একটি গান করিত। ইহাও লোকে অতিশয় পছন্দ করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন পাঁচালিওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচালি গায়কদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নামই প্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলাস্থ বাদমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি প্রথমে কোনও কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগ পূর্বক পাঁচালি গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পাঁচালি এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি

থাকিত যে, এখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয় কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। কিন্তু তখন লোকে পাঁচালি গান শুনিবার জন্য পাগল হইত।

বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ি ওড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া বহু সংখ্যক বুলবুলি পক্ষী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। চাঁদিয়াল, মানুষঘুড়ি প্রভৃতি ঘুড়ির প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ির খেলা দেখিতেন।

সহরের লোকের ধর্ম্মভাবের অবস্থা তখন কি প্রকার ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে উদ্ধৃত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' উক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ ছিল। লোকে মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিত না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁদের যশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া, পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া, সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন।

বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের স্ব দিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতি দিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ।"

একদিকে যখন সহরের এই প্রকার অবস্থা তখন অপরদিকে ঘোর আন্দোলনে সহর কম্পিত হইতেছিল। সে আন্দোলনের প্রথম কারণ রামমোহন রায়ের উত্থাপিত ধর্ম্মান্দোলন। এই যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জীবনচরিত সকলেরই বিদিত, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি :—

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় শৈশবে তাঁহাকে নিজভবনে সামান্যরূপ শিক্ষা দিয়া ৯।১০ বৎসর বয়সের সময় পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনা নগরে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া পারসী ও আরবীতে সুশিক্ষিত হন। এরূপ জনশ্রুতি যে, পাটনা বাসকালে কোরাণ পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ঐ পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্ত্তন করিয়া পারসীতে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা লইয়া নাকি তাঁহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে। সেই মনান্তর নিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী ফকীরদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করাতে, তাহারা তাঁহার প্রাণহানি করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া স্বদেশে পলাইয়া আসেন। আসিয়া কাশীধামে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার পুনরায় সম্মিলন হয়। পিতা তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। পিতার আদেশে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী

ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরি স্বীকার পূর্ব্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়া, অবশেষে রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮০৩ অব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুরশিদাবাদে গমন করেন ; এবং সেখানে "তহতুল মোহদ্দীন" নামক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পরে দশ বৎসর বিষয়কর্ম্ম করিয়া তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে স্থায়ী রূপে আসিয়া বাস করেন।

তিনি কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে রঙ্গপুরে থাকিতেই ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেখানে বিষয়কর্ম্ম করিয়া যে কিছু অবসর পাইতেন, তাহা নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনাতে যাপন করিতেন। সায়ংকালে তাঁহার ভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী, মুসলমান মৌলবী, জৈন মারোয়াড়ী প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম হইত। রাজা তাঁহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া সকলের বাগ্বিতণ্ডা শুনিতেন এবং যথাসাধ্য মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন। এখানেও তিনি সকল শ্রেণীর নিকটে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেন। এরূপ জনরব যে, তিনি রঙ্গপুরে থাকিতে পারস্য ভাষায় একেশ্বর বাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তদর্শন অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলনের ফলস্বরূপ রঙ্গপুরেই তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনিও জজ সাহেবের দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অনেক লোক ইঁহারও অনুগত ছিল। ইনি রামমোহন রায়ের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "জ্ঞানাঞ্জন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থ ১৮৩৮ সালে কলিকাতাতে সংশোধিত আকারে মুদ্রিত হয়।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই সকল আলোচনাও গ্রন্থ-প্রচার দ্বারা দেশের মধ্যে সর্ব্বত্রই আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার কলিকাতা আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন-তরঙ্গ এখানে পৌঁছিয়াছিল। তিনি কলিকাতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি বিষয়ী লোক তাঁহাকে পদস্থ ও ক্ষমতাশালী জানিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার মানসে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ সালে "আত্মীয়-সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। তাহাতে বেদান্তধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত। শাস্ত্রীয় বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন।

এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সুব্রহ্মণ্য

শাস্ত্রী নামক একজন মান্দ্রাজ প্রদেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাতে আগমন করেন, এবং দম্ভ করিয়া বলেন যে, বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, এজন্য রামমোহন রায় বেদ বেদান্তের দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা বলিতেছেন ; তিনি বেদোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে, প্রতিমা-পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। এই সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার করিবার জন্য বিহারীলাল চৌবে নামক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী একজন ব্রাহ্মণের ভবনে এক মহাসভার আয়োজন হয়। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহন রায়ের দলের বিচার হইবে এই বার্ত্তা সহরে প্রচার হইলে, সভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। রামমোহন রায় সদলে, হিন্দুসমাজ-পতি রাধাকান্ত দেব পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধব সহ, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বৈদিক-শাস্ত্র-জ্ঞানবিহীন দেশীয় ব্রাহ্মণগণ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সমক্ষে হাঁ করিতে পারিলেন না। কেবল রামমোহন রায়ের সহিত সমানে সমানে বাগ্‌যুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী পরাভব স্বীকার করিলেন ; নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 'রামমোহন রায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন,' এই বার্ত্তা যখন তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় সহরে ব্যাপ্ত হইল, তখন তাঁহার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল।

একদিকে যেমন আত্মীয়-সভার অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়া গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

আত্মীয়-সভা স্থাপন করিয়া রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিলেন। বেদান্তদর্শনের অনুবাদ ১৮১৫ ; বেদান্তসার, এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, ১৮১৬ ; কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ, এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে ১৮১৭, সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচারপুস্তক, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা পুস্তক, এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ—১৮১৮, সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ—১৮১৯। এই সকল গ্রন্থের উত্তরে তাঁহার বিরোধিগণ তাঁহার প্রতি অভদ্র কটূক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় অপরাজিত-চিত্তে ঐ সমুদয় কটূক্তি সহ্য করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায়ের ধর্মবিচার প্রথমে হিন্দুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তিনি বেদান্তদর্শনাদি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়া স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন, এবং আত্মীয়-সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার করিতেছিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর

বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকালেজ স্থাপিত হয়, তখন সহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত এক কমিটিতে কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটী হইতে তাড়িত হইয়া নিজে ধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলন ত পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, ইহার উপরে আবার ১৮২০ সালে রামমোহন রায় যীশুর উপদেশাবলী নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া বাপ্টিষ্ট (Baptist) সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারি মিষ্টার উইলিয়াম আডাম খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের সহিত রামমোহন রায়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উপর্য্যুপরি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮২৬ সালে রামতনুবাবু যখন বিদ্যারম্ভ করিলেন, তখন রামমোহন রায় হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় দলের অপ্রিয় ও উভয়ের কটূক্তির লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিয়াছিলেন। বাবুদের বৈঠকখানাতে, রাজপথে, লোক সমাগম স্থলে, এমন কি স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই সকল বিষয়ে কথাবার্তা ও বাগ্বিতণ্ডা সর্ব্বদা চলিত।

এতদ্ভিন্ন তখন সহরের লোকের চিত্তকে উত্তেজিত করিবার আর একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব্ পবলিক ইনষ্ট্রকশন নামে একটি কমিটী স্থাপিত হয়। তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। ঐ কমিটী তদানীন্তন প্রাচ্যশিক্ষা-পক্ষপাতিদিগের পরামর্শে কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপন করা স্থির করেন। রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন এদেশীদিগের শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল, তাহার সমগ্র কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যয়িত হইতে চলিল। তখন তিনি এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে, ইহাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না। এই বিষয় লইয়া রাজপুরুষদিগের মধ্যে এবং দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে দুইটি দল হইয়া পড়িল। একদল বলিতে লাগিলেন প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে ; আর একদল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যাহা কিছু প্রাচ্য সকলি মন্দ, যাহা কিছু প্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে বঙ্গদেশে প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। যাহা হউক এই ১৮২৬ সালে এই উভয় দলের বিবাদে কলিকাতা সমাজ অতিশয় আন্দোলিত ছিল।

আর এক কারণে তখন সহরের লোকের মন অতিশয় উত্তেজিত ছিল।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিকটেই এক হত্যাকাণ্ড ঘটে, তাহাতে হিন্দুবিধবাগণের সহমরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়; এবং সহমরণ প্রথা নিবারিত না হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থাপিত হয়। লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নী একজন মনস্বিনী ও সুলেখিকা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিনের ঘটনাবলীর দৈনিক লিপি লিখিয়া রাখিতেন। তদ্দ্বারা সে সময়কার অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সেই দৈনিক লিপি হইতে উক্ত হত্যাকাণ্ডের নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"A young man having died of cholera his widow resolved to mount the funeral pile. The usual preparations were made, and the licences procured from the magistrate. The fire was lighted by the nearest relations; when the flame reached her, however, she lost courage, and amid a volume of smoke and the deafening screams of the mob, tomtoms, drums etc, she contrived to slip down unperceived, and gained a neighbouring jungle. At first she was not missed; but when the smoke subsided, it was discovered she was not on the pile. The mob became furious and ran into the jungle to look for the unfortunate young creature dragged her down to the river, put her into a dingy, and shoved off to the middle of the stream, when they forced her violently overboard and she sank to rise no more!"

এই ঘটনাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; এবং রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য আবার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। লর্ড আমহার্ষ্ট ব্রহ্মযুদ্ধে অনেকের, বিশেষতঃ বিলাতের প্রভুদিগের, অপ্রিয় হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি একেবারে এ প্রথা রহিত করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন করিলেন। সেগুলি এই—(১ম) কোনও সহগমনাথিনী বিধবাকে স্বামীর দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্যরূপে দগ্ধ করা হইবে না, বা অপর কোনও প্রকারে হত্যা করা হইবে না; (২য়) সহগমনাথিনী বিধবাগণের অপরের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পত্র লইলে চলিবে না, নিজে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় জানাইতে হইবে ও অনুমতি লইতে হইবে; (৩য়) সতীর সহমরণে সহায়তাকারী কোনও ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবে না; (৪র্থ) সহমৃতা

বিধবার মৃতপতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত হইবে।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, সহমরণ নিবারণের চেষ্টা এই প্রথম নহে। ইহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে।

এদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাজ রাজপুরুষগণের দৃষ্টি এই নৃশংস প্রথার উপরে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম এদেশের প্রজাগণের মনোরঞ্জন করা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; পাছে এদেশের লোকের ধর্ম্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা সংকুচিত থাকিতেন: সুতরাং তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে শত শত বিধবাকে মৃতপতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেন না। এমন কি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের কাশীমবাজারস্থ কুঠির সমক্ষেই রামচাঁদ পণ্ডিত নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা পত্নী সহমৃতা হন। তখন সার ফ্রান্সিস রসেল কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী ও পরবর্ত্তীকাল-প্রসিদ্ধ মিষ্টার হলওয়েল সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। হলওয়েল (Holwell) স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় লেডী রসেল (Lady Russel) নাকি ঐ রমণীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না।

এই ভাবে বহুদিন গেল। অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি একটু দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্য কিছু করা উচিত বলিয়া তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুলাই গবর্ণর জেনেরালের প্রাইভেট সেক্রেটারি বিধবাদিগকে যাহাতে বলপূর্ব্বক দাহ করা না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, তৎকালে গবর্ণর জেনেরাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার আইনাদি প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী আইনাদি প্রণয়ন করিতে হইলে তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মতি ও ফৌজদারী কিছু করিতে হইলে নিজামত আদালতের অনুমতি লইতে হইত। কারণ উক্ত উভয় আদালত ইংলণ্ডাধিপতির অধীন ছিল এবং তাঁহাদের অনুমতি ইংলণ্ডাধিপতির অনুমতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তদনুসারে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল ঐ প্রশ্ন নিজামত আদালতের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিজামত আদালতে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন কোর্ট-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল। ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার

উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পর্য্যন্ত এবিষয়ে আর কিছু করা হইল না।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কয়েকটি সহমরণের কথা নিজামত আদালতের গোচর করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলেন। তদনুসারে ৩রা সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গবর্ণর জেনেরালকে বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রার্থনীয় বলিয়া পত্র লিখিলেন। ইহার পরেও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এই প্রথা বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইলে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল যে, সহগমনার্থিনী বিধবাকে অগ্রে জেলার মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোনও রাজকর্ম্মচারীর নিকট অনুমতি পত্র লইতে হইবে। এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বহুসহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্ব্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায় এই বিবাদের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রানুসারে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিলেন; এবং পূর্ব্বোক্ত আবেদন পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া এক আবেদন পত্র গবর্ণর জেনেরালের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহাও প্রাচীন সমাজের লোকের তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবার একটি প্রধান কারণ হইল।

১৮২৫ সালের আন্দোলনে পুরাতন দলাদলিটা আবার পাকিয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল দুই দলে আবার তর্ক বিতর্ক চলিল। রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দ্রিকা" সতীদাহের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে রামমোহন রায়ের নামে গান বাঁধিয়া লোকে পথে পথে গাইত। সেই গীত স্কুলের বালকদিগের মুখে মুখে ঘুরিত। সেই সঙ্গীতের কিয়দংশ এই,—

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল,
ও সে জেতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।

এই সময়ে কলিকাতা-সমাজ যে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীন্তন

সামাজিক অবস্থা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামমোহন রায়ের দলের প্রধান টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্সী) মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, তেলিনী পাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁহার অনুচর ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুদলে রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি সহরের প্রায় সমগ্র বড়লোক ছিলেন। ইঁহাদের কাহারও কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

ইংরাজদিগের প্রাচীন দুর্গ বিনষ্ট হওয়ার পর তাঁহারা যখন আবার গোবিন্দপুর গ্রাম লইয়া নূতন ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ নির্ম্মান করিতে আরম্ভ করেন, তখন জয়রাম ঠাকুর নামক একজন দেশীয় ভদ্রলোকের উল্লেখ দেখা যায়। দ্বারকানাথ এই জয়রাম ঠাকুরের বংশজাত। ১৭৯৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে (Sherburne) সর্ব্বরণ নামক একজন ফিরিঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ করেন; এতদ্ভিন্ন পারসী ও আরবী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ফার্গুসন (Ferguson) নামক একজন ব্যারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা করেন। ইহাতে আইন আদালতের কার্য্যকলাপ বিষয়ে পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। তৎপরে তিনি কিছুদিন নীল ও রেশমের রপ্তানীর কাজ করেন। অবশেষে নিমকের এজেণ্ট প্লাউডেন (Plowden) সাহেবের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুইদিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথও কতিপয় বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া বিষয় কার্য হইতে অবসৃত হন; এবং 'কার টেগোর এণ্ড কোং' নামক এক কোম্পানি স্থাপন করিয়া স্বাধীন বণিকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। তদ্ভিন্ন 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' নামে এক ব্যাঙ্কের প্রধান নির্ব্বাহকর্ত্তা হন। সহৃদয়তা, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহার সমকক্ষ লোক কলিকাতাতে ছিল না। তাঁহার উপার্জ্জন শক্তি যেমন অদ্ভুত, দানশক্তিও তেমনি অদ্ভুত ছিল। ১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সহরের সম্ভ্রান্ত ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহার অপরাপর কীর্ত্তি পরে উল্লিখিত হইবে। ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাধাকান্ত দেব

ইনি পরে শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি লর্ড ক্লাইভের মুন্সী নবকৃষ্ণ দেবের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার

শোভাবাজারের রাজবংশসম্ভূত গোপীমোহন দেবের পুত্র। তাঁহার পিতা গোপীমোহন দেব দেশের কল্যাণকর অনেক কার্য্যে সহায়তা করিতেন। এই শোভাবাজারের রাজবংশ চিরদিন কলিকাতা হিন্দু সমাজের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন। ১৭৯৩ সালে রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয়। ইনি ইংরাজী, পারসী, আরবী ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইঁহাকেই তাহাদের প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে বরণ করেন। তিনিও সেই কার্য্যে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্ব্যতীত দেশহিতকর অপরাপর কার্য্যের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭-১৮১৮ সালে যখন স্কুলবুক সোসাইটী ও স্কুল সোসাইটীদ্বয় স্থাপিত হয়, তখন তিনি উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ও দ্বিতীয় সভার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। বর্ষে বর্ষে নিজের ভবনে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সকলের বালকদিগকে সমবেত করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিতেন; এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য নিজে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ১৮২৬ সালে কলিকাতা সহরে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে অগ্রণী হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। পরে ইনি রাজসম্মান সূচক স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, বহুকাল হিন্দুসমাজপাতর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৬৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন ধামে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

রামকমল সেন

ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ। ইনি সম্ভবতঃ ১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌরীভা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামকমলের পিতা হুগলীতে ৫০ টাকা বেতনে সেরেস্তাদারী করিতেন। রামকমল ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮০৪ সালে ডাক্তার হণ্টারের (Dr. William Hunter) প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী প্রেসে একটি কর্ম্ম পান। ১৮১০ সালে ডাক্তার লীডেন (Leaden) ও ডাক্তার এইচ. এইচ. উইলসন (H. H. Wilson) ঐ প্রেসের সত্বাধিকারের অংশী হন। ১৮১১ সালে ডাক্তার হণ্টার ও ডাক্তার লীডেন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া জাভা দ্বীপে গমন করেন; তখন ডাক্তার উইলসন হিন্দুস্থানী প্রেসের একমাত্র সত্বাধিকারী থাকেন; এবং রামকমল তাঁহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮১২ সালে রামকমল ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে একটি কর্ম্ম পান। ১৮১৮।১৮১৯ সালে ডাক্তার উইলসনের সাহায্যে রামকমল এসিয়াটীক সোসাইটীর কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতার গুণে উক্ত সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক ও কমিটির সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি টাঁকশালের

দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যে যে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার অনেকের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। ১৮১৭ সালে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার কমিটীতে ছিলেন। কিছুদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মেডিকেল কালেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যে মেডিকেল কমিশন নিয়োগ করেন তিনি তাহার একজন সভ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর একখানি বৃহৎ ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্ত হয়।

মতিলাল শীল

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে সুবর্ণবণিক কুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা চৈতন্যচরণ শীল কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। ইনি পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ভালরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। তবে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী উত্তমরূপ শিখিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলিকাতার সুরতির বাগানের মোহনচাঁদ দের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহই ইঁহার সমুদয় ভাবী উন্নতির সহায় হইয়া উঠে। তিনি নিজ শ্বশুরের সহিত তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে যাত্রা করিয়া উত্তরপশ্চমাঞ্চলে নানা দেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে একটি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেখানে থাকিতে থাকিতে ১৮১৯ সালে নিজে স্বাধীন ভাবে বোতল ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে অনেক লাভ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কেল্লার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদেশাগত জাহাজ সকলের মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার কাজ ও তৎসঙ্গে ধনাগমও বাড়িতে থাকে। অবশেষে তিনি কলিকাতার কোম্পানির কাগজের বাজারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহার প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি ধনার্জ্জনের জন্য অসৎপন্থা কখনও অবলম্বন করেন নাই। তিনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক ছিলেন। ১৮৪২ অব্দে একটি অবৈতনিক কালেজ স্থাপন করেন। তাহা এখনও তাঁহার বদান্যতার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। ১৮৫৪ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ১৮২৬ সালে তিনি একজন সহরের উন্নতিশীল ধনী ও নেতাদিগের মধ্যে প্রধান-শ্রেণীগণ্য ছিলেন।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া কলিকাতা সমাজকে মহা আন্দোলন ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন, ইংরাজীশিক্ষা প্রচলন ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটি আলোচনার বিষয় ছিল; এবং স্কুলের বালকগণও এই আলোচনার আবর্ত্তের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া

পণ্ডিত। এই জন্য এই সকলের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম। বঙ্গদেশের নবযুগের সূচনাক্ষেত্রে, এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে, বালক রামতনু কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যারম্ভ করিলেন।

বালক রামতনু যদিও তখন এই সমুদয় গোলমালের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, তথাপি পথে ঘাটে যে বাগ্বিতণ্ডা, যে আন্দোলন চলিত তিনি কিয়ৎপরিমাণে তাহার অংশী না হইয়াও থাকিতে পারিতেন না। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল দুই দল হইয়াছিল, তেমনি স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও দুই দল হইয়াছিল। তাহাদেব মধ্যে সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক হইত; এবং কখন কখনও মুখোমুখি ছাড়িয়া হাতাহাতি পর্য্যন্ত দাঁড়াইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

১৮২৮ সালে লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু কালেজের শিক্ষার বিবরণ দিবার অগ্রে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও হিন্দুকালেজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

দেওয়ানী কার্য্যের ভার কোম্পানির হাতে আসার পরেও অনেক দিন ফৌজদারী কার্য্যভার মুসলমান কর্ম্মচারীদের উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্য্যে ইংরাজ জজদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এক এক জন মৌলবী সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইত। এই অভাব দূর করিবার জন্য, এবং মৈত্রী প্রদর্শন দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমান সমাজকে প্রীত করিবার আশয়ে, প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাহাদুর কলিকাতাতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহদাতা ও সহায় হইলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে উক্ত মাদ্রাসা স্থাপিত হইল। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই কালেজ স্থাপন বিষয়ে গবর্ণর জেনেরাল এতই উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, বিলাতের প্রভুদের অনুমোদনের অপেক্ষা না

করিয়াই, কালেজ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নিজ তহবিল হইতে ষাট হাজার টাকা দিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় কোর্ট অব্ ডিরেক্টারসের সভ্যগণ নাকি পরে ঐ অর্থ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বার্ষিক ত্রিশ সহস্র টাকা আয়ের উপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করা হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আরবী ও পারসী রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত; এবং একজন প্রাচীন মৌলবী তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহার পর ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে তত্রত্য রেসিডেণ্ট জোনাথান ডনকান বাহাদুরের প্রযত্নে একটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। এই জোনাথান ডনকান তৎকালের প্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী ইংরাজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয়দিগের সহিত মিশিতে, বন্ধুতা করিতে ও তাহাদের হিতচিন্তা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এজন্য তৎকালীন ভারতবাসী ইংরাজগণ তাঁহাকে আধ হিন্দু বলিয়া মনে করিতেন। সে সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতনা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশে, বিশেষতঃ রাজপুতদিগের মধ্যে, গুপ্তিভাবে কন্যা-হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ডনকান কাশীতে অবস্থিতি কালে বহু সংখ্যক রাজপুত পরিবারকে কন্যা-হত্যা হইতে বিরত হইবার জন্য শপথ-বদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি অপর কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত কন্যা-হত্যা নিবারণার্থ গুজরাট ও রাজপুতনাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষের চেষ্টাতে কাশীতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। প্রথম বর্ষে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা মঞ্জুর করেন। পরবর্ষে বার্ষিক ব্যয় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হয়।

কাশীর কালেজের নিয়মাবলীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, সেখানে বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক ব্যতীত আর সমুদয় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-জাতীয় হইবেন; এবং মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

পূর্ব্বোক্ত উভয় নিয়ম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তদানীন্তন রাজপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব কুণ্ঠিত ছিলেন; বরং সেই সকল রীতি নীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল তাহা নহে, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিধিমতে সহায়তা করিতেন। বড় বড় হিন্দু পর্ব্ব ও মহোৎসবাদির দিনে ইংরাজদুর্গে তোপধ্বনি হইত; ইংরাজ সৈন্যগণ শান্তিরক্ষার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যে মহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিত; এবং অনেক স্থলে জেলার মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তীর্থস্থানের বড় বড় মন্দিরের রক্ষকরূপে কোম্পানি তাহাদের আয়ের অংশী ছিলেন। এজন্য "পিলগ্রিমস্ ট্যাকস" বা "যাত্রীর কর" নামে

একপ্রকার শুল্ক আদায় করা হইত। ১৮৪০ সালে দেখা যায় এতদ্বারা বঙ্গদেশে বর্ষে বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাকা উঠিত। এ কথা এক্ষণে অনেকের নিকট উপকথার মত লাগিতে পারে। কিন্তু বস্তুত: ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল। আরও শুনিলে সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, যুদ্ধাদিতে জয়লাভ হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থের বড় বড় মন্দিরে পূজারিদিগের দ্বারা পূজা দেওয়া হইত। উক্ত সালে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড অকলাণ্ড বাহাদুর রাজবিধির দ্বারা ঐ সকল নিয়ম রহিত করেন। পূর্ব্বকার রাজনীতি কি প্রকার ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশেই এই সকলের উল্লেখ করা গেল।

যাহা হউক, যখন এদেশে রাজপুরুষদিগের অনেকে এদেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইতেছিলেন, তখন যে ইংলণ্ডের লোক একেবারে সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ বলা যায় না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পত্র পুনর্গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সেই প্রশ্ন সমুপস্থিত হইলে চার্লস গ্রাণ্ট (Charles Grant) নামক একজন ভারত-হিতৈষী পুরুষ এদেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার এবং এদেশ প্রবাসী ইংরাজগণের ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতি-বিধান একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এতদর্থে তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভ্যগণের হস্তে অর্পণ করেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া ক্রীতদাস-প্রথা-নিবারণকারী সুবিখ্যাত উইলবারফোর্স সাহেব চার্লস গ্রাণ্টে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি ডনডাস্ বাহাদুর প্রথমে ইঁহাদিগের প্রস্তাবের সপক্ষতা করিবার আশা দেন, কিন্তু পরে কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভ্যগণের প্ররোচনাতে সে পথ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং গ্রাণ্টের প্রস্তাবে বিশেষ ফল ফলিল না।

এইরূপে যখন একদিকে স্বদেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী ব্যক্তিগণ ক্ষীণ ও দুর্ব্বলভাবে এদেশীয়দিগের অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন অপরদিকে শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট, ডাক্তার ফ্র্যান্সিস্ বুকানান হামিণ্টন নামক একজন কর্ম্মচারীকে কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে দেশের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অবস্থাও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। হামিণ্টন অনেক জিলা পরিদর্শন করিয়া এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তদ্দ্বারা দেশের অবস্থা বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। তাহার সকল বিবরণ এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হামিণ্টন ইহার প্রজা সংখ্যা ৯২৬৭২৩ বলিয়া গণনা করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই। দেশের অপরাপর কোন

কোনও স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কেবল ব্যাকরণ, স্মৃতি ও স্থায়ের শিক্ষাতে পর্য্যবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোনও জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসকল পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল।

শিক্ষা সম্বন্ধে যখন দেশের এই দুরবস্থা, তখন নানা কারণের সমাবেশ হইয়া দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর যতই ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসন কার্য্যের জন্য আইন আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা সহরে আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের এবং বিশেষভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী শ্রীরামপুর নগরে কেরী, মার্সম্যান ও ওযার্ড নামক তিনজন ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক বাস করিতেছিলেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমার জাতির অধীনে ছিল। সে সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এমন ভয়ে ভয়ে বাস করিতেন যে, নিজরাজ্য মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে স্বীয়-ধর্ম্মপ্রচার করিবার অধিকার দিলে পাছে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, এই ভয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রচারকত্রয়কে কলিকাতাতে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিবার অনুমতি দেন নাই। তদনুসারে তাঁহারা ডেন-মার্কের অধিপতির নিকট প্রচারের অনুমতি পত্র লইয়া শ্রীরামপুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর সিং নামক কায়স্থ-জাতীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে বৎসরের পর বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুরে মিশনারিগণের দুই দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইতে লাগিল। প্রথম, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করা। ইঁহাদের প্রযত্নে শ্রীরামপুরে উক্ত উভয় বিষয়েই উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই কালের আর একটি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। সে সময়ে যে সকল সিবিলিয়ান পুরাতন হালিসবরি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে হইত এবং শাসন সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহারা যখন এদেশে পদার্পণ করিতেন তখন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, এদেশীয় রীতি নীতি, এদেশীয় লোকের স্বভাব চরিত্র, মনের ভাব, প্রভৃতি

বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। এজন্য তাঁহারা অনেক সময়ে আপনাদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না; অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশতঃ উৎকোচজীবী নিম্নতম কর্ম্মচারীদের আশ্রয় লইতেন; অনেক সময়ে বিচার কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ করিয়া ফেলিতেন। গভর্ণর-জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই অভাবটি দূর করিবার চেষ্টা করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় প্রতিভাশালী ও মনস্বী গভর্ণর-জেনেরাল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে কিছুদিন কলিকাতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া পরে রাজকার্য্যে প্রেরণ করিবেন। তদনুসারে ১৮০০ সালে কলিকাতাতে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ নামে একটি কালেজ স্থাপন করিলেন। কালেজ স্থাপন করিলেই পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইল। তখন বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক ছিল না। লর্ড ওয়েলেস্‌লি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্ররোচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নামক উড়িষ্যা-দেশীয় কালেজের একজন পণ্ডিত বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত", কেরী প্রণীত "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", রামরাম বসু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও "লিপিমালা", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "বত্রিশসিংহাসন" ও "রাজাবলী", চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রণীত "তোতার ইতিহাস", হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষা পারসী-বহুল ও দুর্ব্বোধ। তখনকার বাঙ্গালা ও বর্ত্তমান বাঙ্গালাতে এত প্রভেদ যে, পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ বহু বৎসর জীবিত ছিল। উইলিয়ম কেরী ইহার প্রথম শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন। আর এক কারণে এই কালেজ বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিছুদিন ইহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বেতালপঞ্চবিংশতি" নামক গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেন। উহা ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বেতালপঞ্চবিংশতিকে বর্ত্তমান সুললিত বঙ্গভাষার উৎপত্তি-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের সাহায্যে পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, অপরদিকে কলিকাতা সহরের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে নিজ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। সুবিধা বুঝিয়া কয়েকজন ফিরিঙ্গী কলিকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। সার্বরণ (Sherburne) নামক একজন

ফিরিঙ্গী চিৎপুর রোডে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মার্টিন বাউল (Martin Bowle) নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন; সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল সেই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আরটুন পিট্রাস (Arratoon Petres) নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আর একটি স্কুল স্থাপন করেন; তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কাণা নিতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্যাকরণ-হীন ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা সমাজে ইঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ইঁহারা যাত্রা মহোৎসবাদিতে আপনাদের পদগৌরবের চিহ্ন স্বরূপ কাবা চাপকান পরিয়া এবং জরীর জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন। লোকে সম্ভ্রমের সহিত ইঁহাদের দিকে তাকাইত।

সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে সময়ে বাক্য-রচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া হইত। যে যত অধিক সংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শোনা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে, এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া স্কুল ভাঙ্গিবার সময় নামতা ঘোষাইবার ন্যায় ইংরাজী শব্দ ঘোষান হইত। যথা—

ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লোম্যান—চাষা।
পমকিন—লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার—শশা॥

অনেকে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাক্য-রচনাহীন ও ব্যাকরণহীন ইংরাজী শব্দের দ্বারা তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিরূপে ইংরাজগণের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেন। সে সম্বন্ধে কলিকাতা সহরে প্রাচীন লোকদিগের মধ্যে অনেক কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার অনেক গল্প পাঠকগণ পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রণীত "সেকাল ও একাল" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। দুই একটিমাত্র এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার বড় ঝড় হইয়া একখানি জাহাজ গঙ্গার তীরে লাগিয়া আড় হইয়া পড়ে। পরদিন সেই জাহাজের সরকার বাবু ইংরাজ প্রভুকে আসিয়া

বলিতেছেন—"শার শাম্ শিপ ইজ এইট্টিওয়ান্" অর্থাৎ জাহাজ একাশি হইয়া পড়িয়াছে।

কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী প্রতিদিন দুপুর বেলা সাহেবের ঘোড়ার দানা খাইযা টিফিন করিতেন। দুষ্ট সহিসগণ এই সুবিধা পাইয়া ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া বেচিত। ক্রমে এবিষয় প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভৃত্যদিগকে যখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা বলিল—"হুজুর! আপনার বাবু রোজ রোজ ঘোড়ার দানাতে টিফিন করেন"। সাহেবের বড আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি বসুজ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—"নবীন। তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর?" নবীন বলিলেন—"ইয়েশ্, শার্ মাই হাউস মানিং এণ্ড ইবনিং টুয়েন্টি লীভস্ ফল, লিটিল লিটিল পে, হাউ ম্যানেজ?"—অর্থাৎ আমার বাটীতে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে কুড়ি খানা পাত পড়ে এত কম বেতনে কিরূপে চলে! শুনিতে পাওয়া যায় বসুজ মহাশয়ের এই উক্তিতে ইংরাজটি নাকি সদয় হইয়া তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ভাবে যতদূর কথাবার্ত্তা চলা সম্ভব তাহাই চলিত। ইংরাজেরা ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে, বুঝিয়া লইতেন; এবং সেই সকল কথা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে সায়াহ্নিক ভোজের সময়ে আমোদ প্রমোদের বিশেষ সহায়তা করিত।

যখন এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার জন্য দেশের লোকের ব্যগ্রতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল তখন সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ছিল না। পাছে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে দেশের লোক বিরক্ত হয় এই ভয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে হাত দিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাঁহারা কিরূপ ভয়ে ভয়ে থাকিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর হইতে পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে কলিকাতাবাসী রাজপুরুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। উক্ত পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিবার জন্য ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র গেল। তদনুসারে শ্রীরামপুরের ডেন রাজপুরুষগণ অবশিষ্ট ১৭০০ কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি প্রচারকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কলিকাতাতে গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রি সভার হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপ ভয়ে ভয়ে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা যে কেন হঠাৎ ইংরাজীশিক্ষা প্রদানে কৃতসংকল্প হন নাই তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি।

এই ভাবে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গেল। ঐ বৎসর গবর্ণর জেনেরাল লর্ড মিণ্টো বাহাদুর এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে লিখিলেন;—

It is a common remark that Science and Literature are

in a progressive state of decay among the Natives of India. From every inquiry which I have been enabled to make on this interesting subject, that remark appears to me but too well-founded. The number of the learned is not only diminished, but the circle of learning even amongst those who still devote themselves to it, appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and no branch of learning cultivated but what is connected with the peculiar religious doctrines of the people. The immediate consequence of this state of things is the disuse and even actual loss of many books; and it is to be apprehended, that unless Government interpose with a fostering hand, the revival of letters may shortly become hopeless from want of books or of persons capable of explaining them."

অর্থ—সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের মধ্যে উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তির যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। কেবল যে বিদ্বান ও পণ্ডিত জনের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে তাহা নহে, যাঁহারা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিদ্যার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ হইতেছে। মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আর অধীত হয় না; বিদগ্ধজনোচিত সুকুমার সাহিত্যের আদর নাই; এবং প্রজাকুলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিদ্যার সমাদর দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার অনাদরের ফল এই হইয়াছে যে, অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর অধীত হয় না; এমন কি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং এরূপ সম্ভব বোধ হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্যকারী হইয়া হস্তার্পণ না করেন, অচিরে পাঠ্য গ্রন্থের ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যার পুনরুদ্ধার অসাধ্য হইয়া পড়িবে।

এইরূপে দেশের প্রাচীন বিদ্যার বিলোপাশঙ্কার সূচনা করিয়া লর্ড মিণ্টো প্রস্তাব করিয়াছিলেন :—

"I would accordingly recommend that in addition to the College at Benares (to be subjected, of course, to the reform already noticed) Colleges be established at Nuddea and at Bhour * * in the district of Tirhoot."

অর্থ—অতএব আমি পরামর্শ দেই যে, কাশীর কালেজ ব্যতীত, (সে

কালেজের কিরূপে সংস্কার করিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি) নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে আর দুইটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপন করা হউক।

কেন লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বহুবৎসরের ঔদাসীন্য-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সংস্কৃত বিদ্যার রক্ষার্থে এই প্রস্তাব করিলেন তাহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। সেই ইতিবৃত্ত এই,—সার উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা করা একটা বাতিক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া তাঁহাদের মান সম্ভ্রম লাভের একটা প্রধান উপায়-স্বরূপ ছিল। এই কারণে অল্প বা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত জানা সে সময়কার ভদ্র ইংরাজদিগের একটা ফ্যাসানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্যাবিৎ কোলব্রুক সাহেব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃতবিদ্যাতে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত লোক বিদেশীয়দিগের মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হয়। কেবল তিনিই যে এ বিষয়ে গবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদাতা ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। ডাক্তার এইচ. উইলসন, জেম্স ও টোবি ও প্রিন্সেপ ভ্রাতৃদ্বয়, জে মেকনাটেন, মিষ্টর সদরল্যাণ্ড, মিষ্টর সেক্সপীয়র প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরবর্ত্তী সময়ে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের সহিত ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ এ সময়ে কোলব্রুক মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষক ও গবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদাতা ছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের অনেকে সংস্কৃতে গভীর বিদ্যা লাভ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, এ দেশীয় পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহারা সামান্য ব্যাকরণের সূত্র, সামান্য দুই-চারখানি কাব্য, নব্য স্মৃতির দুই চারিটি ব্যবস্থা ও ন্যায়ের দুই চারিটি ফাঁকি লইয়া কালাতিপাত করিতেছেন; প্রকৃত বিদ্যা ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সেই জন্য তাঁহারা পশ্চাতে থাকিয়া গবর্ণর জেনেরালকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের এই লিপি ও তজ্জনিত স্বদেশ বিদেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার ফল এই হইল যে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনর্গ্রহণের সময় পালামেণ্টের দ্বারা পাইয়া, কোর্ট অব ডিরেক্টারসের সভ্যগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিলেন;—

"That a sum of not less that a lac of Rupees, in each year, shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and

promotion of a knowledge of the sciences among the British territories of India."

অর্থাৎ—প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদান ও ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন ও উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইবে।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রকশন (Committee of Public Instruction) নামে একটি কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটীর সভাগণ সেই এক লক্ষ টাকা প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

১৮১৪ সাল আর এক কারণে চিরস্মরণীয়। ঐ সালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার ও পরিরক্ষণের মানসে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন, এবং প্রধানরূপে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

রামমোহন রায় কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অপরাপর অভাবের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব অতিশয় অনুভব করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় কলিকাতাতে আসিলেই ডেবিড হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুতা হইল। হেয়ার এদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষার অভাব বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, এবং তাঁহার ঘড়ির দোকানে সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন। রামমোহন রায়ের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার সর্বদা কথোপকথন হইত। রামমোহন ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুদিগকে লইয়া "আত্মীয়-সভা" নামে যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে সেই সভার এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন সভাভঙ্গ হওযার পর হেয়ার পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কথোপকথনের পর স্থির হইল যে, একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইবে। সেই সময়ে বৈদ্যনাথ মুখুয্যে নামক ইংরাজী-শিক্ষিত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী-কাল-প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মীয়-সভার একজন সভ্য ছিলেন; এবং তাঁহার একটা প্রধান কাজ এই ছিল যে, তিনি সর্বদা পদস্থ ইংরাজদিগের ভবনে ভবনে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেন এবং শহরের, বিশেষতঃ দেশীয় বিভাগের, সকল সংবাদ দিতেন। অনুমান করা যায়, বৈদ্যনাথ মুখুয্যেই হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

সার হাইড ইষ্ট (Sir Hyde East) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া থাকিবেন। তখন সার হাইড ইষ্ট নিজেও বোধ হয় এ দেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং বৈদ্যনাথের মুখে উক্ত প্রস্তাবের কথা শুনিবামাত্র তিনি অতীব উৎসাহিত হইয়া হেয়ার ও রামমোহন রায়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; এবং বৈদ্যনাথ মুখুয্যেকে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য নিয়োগ করিলেন। বৈদ্যনাথ যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন, সকলেই মহা উৎসাহপ্রধান করিতে লাগিলেন। তদনুসারে উক্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে সার হাইড ইষ্ট মহোদয়ের ভবনে সহরের বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের একটি সভা হইল। তাহাতে একটি কালেজ স্থাপনের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। সকলের উৎসাহাগ্নি যখন প্রজ্বলিত, তখন হঠাৎ সংবাদ প্রচার হইল যে, রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের মধ্যে আছেন এবং তিনি প্রস্তাবিত কালেজ-কমিটীতে থাকিবেন। সে সময়ে সহরের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের রামমোহন রায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি প্রবল ছিল যে, এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সকলে বাঁকিয়া বসিলেন ; "তবে এই কালেজের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকিবে না।" সার হাইড ইষ্ট মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। যে পুরুষদ্বয় এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী, তাঁহাদের একজনকে কিরূপে পরিত্যাগ করেন। তিনি নিরুপায় দেখিয়া ডেভিড হেয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হেয়ার তাঁহার বন্ধুকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না, রামমোহন রায় শুনিবামাত্র নিজেই কমিটী হইতে নিজের নাম তুলিয়া লইবেন।" তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তিনি গিয়া রামমোহন রায়কে এই কথা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, "সে কি কথা। কমিটীতে আমার নাম থাকা কি এতই বড় কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ নষ্ট করিতে হইবে?" তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের নাম তুলিয়া দিবার জন্য সার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিলেন।

ইহার পর উক্ত মাসের ২১শে তারিখে আবার এক সভা হইল, তাহাতে কালেজ স্থাপন করা ঠিক হইল ; এবং তদর্থে একটি কমিটী গঠন করা হইল। বৈদ্যনাথ মুখুয্যে ও লেফ্‌টেনেণ্ট আর্ভিন (Lieutenant Irvine) নামক একজন ইংরাজ উভয়ে উহার সম্পাদক হইলেন। কমিটীতে প্রথমে কুড়িজন এদেশীয় লোক ও দশজন ইংরাজ নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী গরাণহাটা নামক স্থানে মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কালেজ খোলা হইল।

কেবল যে কলিকাতা সহরেই ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এইরূপ আয়োজন হইল তাহা নহে। এই সময়েই মফঃস্বলের নানা স্থানেও ইংরাজী শিক্ষার উপায়-বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী চুঁচুড়া সহরে রবার্ট মে (Robert May) নামক লণ্ডন মিশনারি সোসাইটীভুক্ত একজন

খ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরাজী স্কুল খোলেন। প্রথম দিন ১৬টি মাত্র বালক উপস্থিত হয়। কিন্তু ত্বরায় ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টর ফর্বস্ (Mr. Forbes) ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্য একটি প্রশস্ত ঘর দিলেন। রেভরেণ্ড মে সেখানে স্কুল করিতে লাগিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটি শাখা স্কুল স্থাপিত হইয়া ঐ সকল স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মিষ্টর ফর্বস স্কুলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা সাহায্য দেওয়াইয়া দিলেন। রেভরেণ্ড মের চুঁচুড়ার স্কুলগুলির উন্নতিদর্শনে উৎসাহিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর আপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটিকে ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিলেন।

ওদিকে শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শমান প্রভৃতি মিশনারিগণ ইংরাজী শিক্ষার এই মহা-আন্দোলনের মধ্যে উদাসীন ছিলেন না। ১৮১৫ সালে তাঁহারা শ্রীরামপুরে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ কালেজের সূত্রপাত করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যে নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রামমোহন রায় ধর্ম্মবিহীন শিক্ষাকে বড় ভয় পাইতেন। সেজন্য নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কালেজের ধর্ম্মবিহীন শিক্ষাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরে একজন আসিয়া তাঁহাকে বলিল, —"দেওয়ানজি, অমুক আগে ছিল Polytheist, তারপর হইয়াছিল diest, এখন হইয়াছে atheist." রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন,—"শেষে বোধ হয় হইবে beast"। যাহা হউক তিনি মিশনারিদিগের ধর্ম্মানুগত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য ১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডফ আসিয়া সাহায্য চাহিলেই তাঁহার স্কুল স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে কাশীধামে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির হস্তে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া যান। গবর্ণমেণ্টকে ইংরাজী শিক্ষা দান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি ঐ প্রকার করিয়া থাকিবেন।

এদেশে রাজপুরুষগণ অনেক সময় প্রজাবৃন্দের চিন্তা, রুচি, প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া কিরূপ দূরে দূরে বাস করেন তাহার অপরাপর প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ এই যে, যখন দেশের সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গভর্ণর জেনেরাল ও তাঁহার পারিষদবর্গ কেবল প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ এবং নদীয়া ও

ত্রিহুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। নদীয়া ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হওয়া কর্তব্য কি না, এই চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহাদের বোধ হইল যে, এত দূরে উক্ত কালেজদ্বয় স্থাপন করিলে তাহাদের পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও উন্নতিবিধানাদি করিবার সুবিধা হইবে না। কাশীর কালেজ ও কলিকাতার মাদ্রাসা, এই উভয় বিদ্যালয়ের সমুচিত তত্ত্বাবধান করার কঠিনতাও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের এই সংস্কারকে বলবান করিয়া থাকিবে। তখন তাঁহারা কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন।

১৮২৩ সালে কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রক্‌শন্‌ নামে যে কমিটী স্থাপিত হয় তাহার প্রতি এই কালেজ স্থাপনের ভার অর্পিত হইল; এবং ১৮১৩ সাল হইতে যে বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা জমিতেছিল তাহা তাহাদের হস্তে অর্পিত হইল, তাঁহারা মহোৎসাহে সংস্কৃত কালেজ স্থাপন, ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান ও প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য কিরূপ ব্যয় হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আরবী 'আবিসেন্না' নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবং ছাত্রদিগের পাঠার্থ পারসী ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছিল, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অনুবাদিত গ্রন্থ সকল আবার ছাত্রেরা বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অনুবাদককে মাসিক ৩০০ তিন শত টাকা বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপরদিকে মুদ্রিত ও অনুবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাঁচিল, তাহা কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল। এই সকল কারণে অল্পকাল মধ্যেই কমিটীর সভ্যদিগকে মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল, তাঁহারা দুই দল হইয়া পড়িলেন।

১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামমোহন রায় পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। যখন দেখিলেন সেদিকে মনোযোগী না হইয়া গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে যাইতেছেন, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরকে নিজের মনের ভাব জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে সকল উন্নত ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের হৃদয়কে অধিকার করে নাই,

এবং অল্পদিন হইল ইউরোপে প্রবল হইয়াছে, তাহা সেই ক্ষণজন্মা যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন।

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Phliosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of telent and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."

অর্থ—"যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্ত্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেণ্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎ-পরিবর্ত্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দারা অপরাপর বিষয়ের সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি কালেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

সুবিখ্যাত বিশপ হিবার (Bishop Heber) এই পত্র লর্ড আমহার্ষ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পত্রখানির প্রার্থনা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু

তাহার ফল স্বরূপ এই নির্দ্ধারণ হইলে যে, কলিকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কালেজের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইবে। তদনুসারে ১৮২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত কালেজ-গৃহদ্বয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

এই সময়ে আর একটি পরিবর্ত্তন ঘটে। হিন্দু কালেজের জন্য ইহার স্থাপনকালে যে ১১৩১৭৯ টাকা মূলধন রূপে সংগৃহীত হয়, তাহা জোসেফ বেরেটো নামক এক ইটালীদেশীয় সওদাগরেব হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১৮২৪ সালে বেরেটো কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে ঐ অর্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া ২৩০০০ টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং কালেজ কমিটী নিরুপায় হইযা গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতে প্রস্তুত হন, কিন্তু প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের নিযুক্ত কোনও কর্ম্মচারীকে কালেজের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে তদানীন্তন কমিটী অব পব্লিক ইনষ্ট্রক্শনের সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট প্রথম মাসে ৯০০ শত টাকা, পরে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৫০ টাকা করিয়া সাহায্য দিতে থাকেন।

১৮২৮ সালে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে আসিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল যে, বর্ষে বর্ষে স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে অগ্রগণ্য ছাত্রেরা হিন্দু কালেজে আসিত। তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা মন্দ, তাহাদের বেতন স্কুল সোসাইটী দিতেন। তাহারা অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কালেজে পাঠ করিত। লাহিড়ী মহাশয় সেই শ্রেণীগণ্য ছাত্ররূপে হিন্দু কালেজে আসিলেন। দিগম্বর মিত্রও সেই সঙ্গে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে যে সকল সহাধ্যায়ীর সহিত সম্মিলিত হইলেন, তন্মধ্যে রামগোপাল ঘোষ পরে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহার পরবর্ত্তী সময়ের যৌবনসুহৃদগণ তখন কেহ প্রথম শ্রেণীতে, কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেছিলেন। হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও (Henry Vivian Derozio) নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক, তখন ঐ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গের নবযুগ-প্রবর্ত্তক এই অসাধরণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের কিছু বিবরণ এইখানে দেওয়া আবশ্যক।*

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও

ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইটালী পদ্মপুকুরের সন্নিহিত মামলালীর দরগা নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে পোর্ত্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী। ইঁহার পিতা জে. স্কট কোম্পানির সওদাগরী

আফিসে একটি বড় কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার আর দুই ভ্রাতা ও দুই ভগিনী ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা সচ্ছল অবস্থাতে ফিরিঙ্গীসমাজে সম্ভ্রমের সহিত বাস করিতেন। কিন্তু সে সময়ে ফিরিঙ্গীসমাজে বালকগণ সৎশিক্ষার অভাবে প্রায় বিকৃত হইয়া উঠিত। ডিরোজিওর জ্যেষ্ঠ সহোদর ফ্রাঙ্ক কুসঙ্গে পড়িয়া বিপথে পদার্পণ করে; এবং সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া যায়। দ্বিতীয় ক্লডিয়সকে পিতা শিক্ষার্থ স্কটলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরের সংবাদ জানি না। প্রথমা ভগিনী সোফিয়া ১৭ বৎসর বয়সে গতাসু হন। সর্ব্বকনিষ্ঠা এমিলিয়া ডিরোজিওর প্রতি বিশেষ অনুরক্তা ও সকল বিষয়ে তাঁহার উৎসাহদায়িনী ছিলেন।

সে সময়ে ডেবিড ড্রমণ্ড নামে একজন স্কট্‌লণ্ড দেশীয় লোক কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। এই ড্রমণ্ড সেই সময়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা সকল সে সময়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে, ধর্ম্মবিষয়ে আত্মীয় স্বজনের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। যে স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিতেছিল। ড্রমণ্ড বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ বলিতে লাগিলেন, সেখানে পড়িলে বালকগণ নাস্তিকতাতে বর্দ্ধিত হইবে। এই ভয়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় বালককে তাঁহার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন না। ডিরোজিওর পিতামাতা সে ভয় করিলেন না। বালক ডিরোজিও সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

ড্রমণ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যোতি ছিল যাহাতে তিনি বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া বালক ডিরোজিওর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাহির হইলেন। বাহির হইয়া কিছুদিন তাঁহার পিতার আফিসে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে কিছুদিন ভাগলপুরে তাঁহার এক মাসীর ভবনে বাস করেন। তাঁহার মাসী উইলসন নামক একজন নীলকর ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে থাকিবার সময় বালক ডিরোজিও একাকী গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন; এবং কবিতা রচনা করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার জ্ঞান-স্পৃহা এমনই প্রবল ছিল যে, সেই অল্প বয়সে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রন্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

সে সময়ে ডাক্তার গ্রাণ্ট (Dr. Grant) নামে একজন ইংরাজ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (India Gazette) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেন

ঐ পত্রে ডিরোজিওর লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। শুনিতে পাওয়া যায় সুবিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্টের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ডিরোজিও তাহার এক সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সে সময়কার পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে এমন প্রখর ধীশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল যে, সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, লেখক একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ভাগলপুরে বাস কালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে Fakir of Jhungeera নামক কবিতাই সুপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুরের সন্নিকটে নদীগর্ভস্থিত ঝঙ্গীরা নামক এক অরণ্যময় আশ্রমে এক ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রমকে উদ্দেশ করিয়াই ডিরোজিও উক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতা প্রকাশিত হইলে, তদানীন্তন শিক্ষিত ইংরাজ ও বাঙ্গালী সমাজে ডিরোজিওর কবিত্ব-খ্যাতি প্রচার হইয়া গেল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও তাঁহার কবিতাপুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতাতে আসেন। সেই সময়ে হিন্দুকালেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি হয়; স্কুল কমিটী সেই পদে ডিরোজিওকে নিযুক্ত করেন। ১৮২৮ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্তু চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারি দিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। স্কুলের ছুটী হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন, এবং নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন, এবং স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি কেবল স্কুলের ছুটীর পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন না; তাহাদিগকে আপনার বাড়িতে যাইতে বলিতেন। সেখানে তাহাদিগের সহিত বয়স্য ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী এমিলিয়ার সহিত তাহাদিগের পরিচয় করিয়া দিতেন এবং বিধিমতে আতিথ্য করিতেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি কতিপয় বালক ডিরোজিওর ভবনে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। এক দিনের ঘটনা লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শোনা গিয়াছে। একবার তিনি রামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্জনের সহিত ডিরোজিওর ভবনে গিয়াছিলেন। সেখানে পূর্ব্বোক্ত দুই জনে তাঁহাকে চা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তিনি

কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। ফিরিঙ্গী বাড়ীতে চা খাইবেন, ইহা কি হইতে পারে? সুতরাং তিনি অস্বীকৃত হইলেন। দক্ষিণারঞ্জন অনুরোধ করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বলপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লাহিড়ী মহাশয় চীৎকার করিবার উপক্রম করাতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন ডিরোজিওর ভবনে হিন্দুকালেজের অগ্রসর বালকদিগের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান ভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল।

এই সময়কার আর একটি ঘটনা লাহিড়ী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল যে ডিরোজিওর ভবনে কালেজের বালকদিগের সম্মিলন হইত তাহা নহে। দক্ষিণারঞ্জনের উদ্যোগে অপরাপর ইউরোপীয়দিগের ভবনেও মধ্যে মধ্যে বালকদের নিমন্ত্রণ হইত। সে সময়ে হাবড়াতে রেভারেণ্ড হাউ (Rev. Hough) নামে একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস করিতেন। রামমোহন রায়ের বন্ধু আডামের সাহায্যে হাউ মহোদয়ের ভবনে একদিন বালকদিগের সম্মিলন হয়। তাঁহার কন্যা, কুমারী হাউ, দক্ষিণারঞ্জনের প্ররোচনাতে লাহিড়ী মহাশয়কে এক গ্লাস শেরি পান করিতে দিলেন। দক্ষিণারঞ্জন আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "ইংরাজ সমাজের এই নিয়ম যে, ভদ্রমহিলার কিছু আহার বা পান করিতে দিলে, তাহা আহার বা পান না করা অসভ্যতা, অতএব পান না কর, একবার 'ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করাও"। লাহিড়ী মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহাই করিলেন। এইরূপে কালেজের ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল।

কিরূপে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত দলে সুরাপান প্রবেশ করিয়াছিল তাহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় পরোক্ষভাবে সুরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি রাত্রিকালে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া ইংরাজী রীতিতে খানা খাইতেন। ইহা হইতে এদেশীয় কোন কোনও ধনী পরিবারে রাত্রিকালে খানা খাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে সুরাপান করিবার নিয়ম ছিল। তাঁহাকে কেহ কখনও পরিমিত সীমাকে লঙ্ঘন করিতে দেখে নাই। এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। একপ শোনা যায় একবার একজন শিষ্য কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাকে এক গ্লাস অধিক সুরা পান করাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ছয়মাস কাল তাহার মুখ দর্শন করেন নাই।

রাজা বোধ হয় এ কথাটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, যাহা তাঁহার

পক্ষে পরিমিত-সীমার মধ্যে রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল, তাহা অপরের পক্ষে সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে। পরবর্ত্তী সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সুরাপান নিবন্ধন আমরা অনেক ভাল ভাল লোক অকালে হারাইযাছি। যাহা হউক, যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সুরাপান করা সুসংস্কারহীন সংস্কারকদিগের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি হিন্দুকালেজে পাঠ করেন এবং তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি তিনি সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। নন্দকিশোর বসু মহাশয় একদিন শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশিযা কখনও কখনও অতিরিক্ত সুরাপান করেন তখন তিনি একদিন রাজনারায়ণ বাবুকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি মদ খাও?" তিনি বলিলেন—"হাঁ"। তখন তাঁহার পিতা আলমারি খুলিযা একটি বোতল ও একটি মদের গ্লাস বাহির করিলেন এবং কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়া পুত্রকে পান করিতে দিলেন এবং নিজে একটু পান করিলেন। বলিলেন—"যখনি সুরাপান করিবে তখনি আমার সঙ্গে পান করিবে, অন্যত্র পান করিবে না।" তাঁহার সঙ্গে পান করিলে সন্তান সর্ব্বদা পরিমিত সীমার মধ্যেই থাকিবে, বোধ হয় এইরূপ চিন্তা করিয়াই ওপ্রকার বলিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে সে সময়কার সংস্কার পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ সুরাপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং ডিরোজিওর শিষ্যগণ অপরাপর দিকে অগ্রসর হওয়ার ন্যায় সুরাপান বিষয়েও যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিযা হিন্দু কালেজের ছাত্রগণের মনে মহা বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া একাডেমিক এসোসিএশন (Academic Association) নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। তিনি তাহার সভাপতিত্ব করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যদল প্রধান বক্তা হইত। এই সভা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের একটি প্রধান ঘটনা। ইহার বিশেষ বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে।

কালেজের বালকগণের মধ্যে যে নব অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, যে নবজীবনের সঞ্চার হইল, তাহা নানাদিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, তখন ডিরোজিওর শিষ্যগণ একত্র হইয়া "Athenium" নামে এক মাসিক ইংরাজী পত্রিকা বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন—"If there is any thing that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism." —"যদি হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুকে ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম্ম"।

এরূপ শুনিতে পাওযা যায়, ঐ পত্রিকার দুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই মাধবচন্দ্র মল্লিক পরে ডেপুটী কালেক্টর হইয়া কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়ে কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্ম-জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন :— "কলিকাতা নিবাসী মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে হিন্দুকালেজের একজন সুশিক্ষিত ছাত্র এই জেলার (নদীয়া জেলার) ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আইসেন। রামতনু বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা থাকাতে, তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং আমরাও তাঁহাকে গুরুজনের ন্যায় জ্ঞান করিতাম। তিনি চাঁদসড়কে নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের স্কুল লইয়া গেলেন এবং তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নবান হইলেন। আর আমরা এখানকার যুবকবৃন্দ কুসংস্কার নিবারণের ও চরিত্রের সংশোধনের জন্য যে উদ্যোগ করিতেছিলাম, সে বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতে লাগিলেন।"

পরে আবার বলিতেছেন,—

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপ-জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত-জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দুকালেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজ-সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমরা চারি পাঁচ জন আত্মীয় কখন কখনও তাঁহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করিতাম এবং বড়ই সুখী হইতাম।"

ইহাতেই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন, এদেশের ভদ্রলোকের মধ্যে সুরাপানটা কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাঁহারা প্রথমে এই পথের পথিক হন, তাঁহারা কি ভাবে সে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাকে কুসংস্কার-ভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মনে করিতেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ এই ভাবেই ইহাকে অবলম্বন করেন।

ক্রমে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। হিন্দু-কালেজে পাঠকালে তিনি শ্যামপুকুরের বাসা পরিত্যাগ করিয়া পাথুরিয়াঘাটাতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকখানার সন্নিকটে, আপনার জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুরদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাস-ভবনে গিয়া উপস্থিত হন। এই ঠাকুরদাস লাহিড়ী মহাশয়ের বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। ইনি কলিকাতাতে নদীয়া রাজের

প্রতিনিধিরূপে বাস করিতেন। তখন লোকে ইঁহাকে লাহিড়ী দেওয়ান বলিয়া ডাকিত। ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত নদীয়া রাজের যে সমুদয় কারবার ছিল, তাহা ইনিই নিষ্পন্ন করিতেন। ইনিও দেওয়ানদিগের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং মাতার দিক দিয়া ইঁহার সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখানে লাহিড়ী মহাশয় যে অধিককাল ছিলেন এরূপ বোধ হয় না ; কারণ নিজে ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বীয় জননীর মামাত ভাই হরিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কিছুদিন ছিলেন, এরূপ শুনিয়াছি।

প্রথম শ্রেণীতে একবৎসর পাঠ করিয়া তিনি ছাত্রবৃত্তির প্রার্থী হইলেন। তৎকালে কৃতী ছাত্রদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত। তিনি হেয়ারের নিকট বৃত্তি-প্রার্থী হইলে মহাত্মা হেয়ার তাঁহাকে কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রক্‌শনের সেক্রেটারী ডাক্তার উইলসনের নিকট প্রেরণ করিলেন। ডাক্তার উইলসন সে সময়ে টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন ; এবং জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ডাক্তার উইলসন প্রিন্সেপের উপরে রামতনু বাবুকে পরীক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিলেন। প্রিন্সেপ পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি ১৬ টাকা বৃত্তি পাইলেন।

বৃত্তি পাইয়াই তাঁহার মনে হইল যে, রাধাবিলাস ও কালীচরণকে কলিকাতায় আনিয়া লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। তদনুসারে কালেজের নিকটে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কলিকাতায় আনিলেন। এখনকার সহিত তুলনায় তখন কলিকাতা বাসের ব্যয় স্বল্পই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা হইলেও ষোল টাকাতে তিন জনের বাসা করিয়া থাকা বড় সুসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাঁহারা যে প্রকার ক্লেশে দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, শুনিলে এখনকার ছাত্রগণের কিছু জ্ঞানলাভ হইতে পারে। বাসাতে পাচক বা ভৃত্য ছিল না ; ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা, বাজার করা, কুটনা কোট., বাটনা বাটা, রন্ধন করা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য আপনাদিগকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত ; প্রাতে ও রাত্রে দুইবার মাত্র আহার, মধ্যাহ্নে জল খাবারের পয়সা জুটিত না ; কাহারও পায়ে জুতা ছিল না ; সকলেই পাদুকাহীন পদে স্কুলে যাইতেন। ইহার উপরে আবার এই সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সাহায্য রহিত হইয়াছিল। কেন রহিত হইয়াছিল বলিতে পারি না ; বোধ হয় কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে বিবাহাদি দ্বারা পরিবার বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকৃচ্ছ্রের মধ্যে পড়িতেন যে, ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেন না। একবার তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৭।৮ টাকা কর্জ্জ করিলেন। তৎপরে একবার নিরুপায় হইয়া মহাত্মা হেয়ারের শরণাপন্ন হইতে হইল। হেয়ার কাহাকেও বলিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য

করিলেন। তিনি হেয়ারের জীবদ্দশাতে এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই।

এই হিন্দু কালেজের শিক্ষার সময়ের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। এই সময়ে একবার তিনি বিষম ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সংবাদ পাইবামাত্র আসিয়া নিজেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন। হেয়ারের নিকট নানাপ্রকার ঔষধ সর্ব্বদাই থাকিত। একদিন হেয়ার সন্ধ্যার পর রোগীর সংবাদ না পাইয়া অধিক রাত্রে লালদীঘির নিকট হইতে হাঁটিয়া, এক জঘন্য, দুর্গন্ধময় গলির ভিতর রামতনু বাবুর বাসাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বাসার লোকে তাঁহার কণ্ঠস্বর ও ইংরাজী ভাষা শুনিয়া মনে করিল, বুঝি কোনও মাতাল গোরা দ্বারে আঘাত করিতেছে, তাই দ্বার খুলিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। হেয়ার তাহা বুঝিতে পারিয়া হিন্দীতে বলিলেন—"ডরো মত, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়।" তখন তাহারা দ্বার খুলিল।

হায় হায়! মানব-প্রেমিক হেয়ার এই বালকদিগকে যেরূপ ভালবাসিতেন এবং তাহাদের জন্য যাহা করিতেন, পিতা মাতাও তাহার অধিক করে না।

এই সময়েই ইহার অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটে। একবার হিন্দু-কালেজের একটি ছাত্র, চন্দ্রশেখর দেব, একদিন সন্ধ্যাকালে গ্রে সাহেবের ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আবার মুষলধারাতে বৃষ্টি নামিল। হেয়ার বালকটিকে ছাড়িলেন না। নিজের মিঠাইওয়ালার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে মিঠাই খাওয়াইলেন; এবং নিজে ইত্যবসরে আহার করিয়া লইলেন। তৎপরে বৃষ্টি থামিলে বলিলেন;—"চল তোমাকে একটু আগাইয়া দিয়া আসি, পথে গোরারা আছে, তোমাকে একেলা যাইতে দিতে পারি না।" এই বলিয়া এক গাছি মোটা লাঠি লইয়া চন্দ্রশেখরের সমভিব্যাহারী হইলেন। বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন—"আপনি আর আসিবেন না"; হেয়ার বলিলেন,—"না, চল মাধব দত্তের বাজারের নিকট দিয়া আসি।" আবার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কালেজের দীঘির কোণে আসিয়া বলিলেন—"আমি দাঁড়াইতেছি, তুমি যাও।" চন্দ্রশেখর চলিয়া গেল। সে বালক তখন পটুয়াটোলা লেনে থাকিত। বালকটি আসিয়া দ্বার দিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছে এমন সময়ে শোনা গেল কে দ্বারে আঘাত করিতেছে; লোকে দেখিল হেয়ার। হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"Is Chunder in?" "চন্দ্র কি পৌছিয়াছে?" হায় সে প্রেম কিরূপ যাহা এতদূর বালটির সঙ্গে আসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, আবার ভাবে—ছেলেটা ঘরে পৌছিল কি না একবার দেখি!

এই উদারচেতা সহৃদয় পুরুষের তত্ত্বাবধানে রামতনু হিন্দুকালেজে পড়িতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা

অতঃপর আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইতেছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে রাজা হইয়া বসিলেন, সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বণিকদিগের মনে রাজভাব প্রবেশ করা, ইহা দুই দশ দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাঁহারা বণিক ছিলেন, ততদিন ভাবিতেন এদেশের লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা বৈধ অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এইভাব কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের মনে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মচারীর মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানির কর্ম্মচারীগণ এরূপ স্বল্প বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না। কিন্তু অবৈধ অর্থোপার্জ্জনের উপায় এত অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কর্ম্মচারীর অধিকাংশকে ফ্যাক্টর বা কুঠীওয়ালা বলিত। কুঠীওয়ালাগণ কোম্পানির কুঠী সকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, হিসাবপত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরী কার্য্যের সহায়তা করিতেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারি কার্য্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গবর্ণমেণ্টের হস্তেই থাকিল। যখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আসিল, তখন কুঠীওয়ালাগণই কালেক্টর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির এজেণ্টের ন্যায় সওদাগরীর তত্ত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের

কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না। যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা তাঁহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখ দুঃখের জন্য আমরা দায়ী, এভাব তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রেই বলিয়াছি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকুলের দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্য কিছুই করেন নাই। কেবল তাহা নহে; ইহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ হয় যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রজা-সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দ্দকও ছাড়া হয় নাই। সে বৎসরে যাহা আদায় হইতে পারে নাই পর বৎসরে সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ সালে ৩রা নবেম্বর দিবসে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাকা; ১৭৬৯-৭০ সালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা, ১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরে ১৪০০৬০৩০ টাকা; এবং ১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাকা। ইহাতেই দেখা যাইতেছে তখন রাজগণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাবৃন্দের রক্তশোষণ করিতে ছাড়েন নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষের বৎসরে প্রজা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বাহাদুর তাঁহার পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"It was naturally to be expected that the diminution of the revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great a calamity. That it did not was owing to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy. * * * * One tax, however, we will endeavour to describe, as it may serve to account for the equality which has been preserved in the past collections, and to which it has principally contributed. It is called Najar, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make up for the loss sustained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled from the country."

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজস্বের যে ক্ষতি

হইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে শুদে আসলে বলপূর্ব্বক আদায় করা হইয়াছিল। এই ব্যবহারের স্বপক্ষে হেষ্টিংস বাহাদুর এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে এ প্রকারে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সংশয় নাই, তাঁহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে রাজস্বের এক কপর্দ্দকও ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ গর্হিত উপায়ে রাজস্ব আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার মূল বক্তব্য এই যে, ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও বহুদিন রাজার দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। রাজার দায়িত্ব বুঝিলে প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্য জমিদার যাহা করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা করেন নাই। দেশীয় রাজগণ সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজস্ব রেহাই দিয়া থাকেন এবং এখনও দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের জমিদারগণ পর্ব্বত সমান অন্নের স্তূপ ও শালতী ভরিয়া ডাল বাঁধিয়া শত শত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাকে বহুদিন আহার করাইয়া বাঁচাইয়াছিলেন।

এইরূপে বণিকদিগের রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্ত্তব্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে প্রজাদিগেরও নূতন রাজাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজেরা এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন কি না? পলাশীর যুদ্ধে তাঁহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে সর্ব্ববিদ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের সহিত বিবাদ, অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও পূর্ব্বে মগদিগের সহিত বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষ্ণুপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বিদ্রোহী দেখা দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরেজরাজ্য স্থায়ী হইল এবং তাঁহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইতে হইবে। ইংরাজ-রাজপুরুষগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে, ভারত-সাম্রাজ্য বহুবিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে; এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার তাঁহাদের মস্তকে।

রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উভয় শ্রেণীর মনে একই প্রশ্নের উদয় হইল। রাজারা ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অনুসারে? প্রজাগণও চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি;—প্রাচীনকে বা নবীনকে? ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যন্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার

ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া ঐ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। যেরূপে মীমাংসা হইয়াছিল তাহা পরে নির্দ্দেশ করিতেছি।

নূতন রাজারা যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া লইতে পারেন নাই, ততদিন কোনও বিভাগেই লঘুভাবে প্রাচীনকে বিপর্য্যস্ত করেন নাই। সর্ব্ববিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজনীতি বিভাগে সর্ব্বাগ্রে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা, দেশীয় রীতিতেই, সকল কার্য্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু বহুকালের পরাধীনতাজাত দায়িত্ব-হীনতা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের এমনি দুর্গতি হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে এই নায়েব-দেওয়ানগণ মনে করিতেন বিদেশীয়েরা ত বেশ লুটিয়া লইয়া যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের ভাগী নই, সুতরাং আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি করিয়া লই; এইরূপে তাঁহাদের উৎপীড়ন ও উৎকোচাদিতে লোকে এত জালাতন হইয়া উঠিল যে অবশেষে সে সকল পদ তুলিয়া দিতে হইল। ক্লাইবের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দরামের ও হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এইরূপে কিছুদিন গেল: শেষে, লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর এদেশীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া সেই সকল পদে ইউরোপীয়গণকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্ব্ববিধ উচ্চপদ হইতে চ্যুত হইয়া হীন-দশায় পতিত হইলেন। তৎপরে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত এদেশীয়দিগের সেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই কালকে এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ব্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া উন্নতির সম্ভাবনা ও তজ্জনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার গর্ত্তে এদেশীয়গণ এখনও পড়িয়া রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কারণ কোনও জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের স্পৃহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আইন আদালত সম্বন্ধেও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাসাধ্য প্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও এদেশীয় আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহুবৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন হিন্দু

পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী রাখার নিয়ম হয়; তাঁহারা এদেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া জজের সাহায্য করিতেন।

শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও তাঁহারা যে বহুবৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন তাহাও পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এমন কি এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কালেজের সঙ্গে চরক সুশ্রুতের ক্লাস ও মাদ্রাসার সঙ্গে আবিসেন্নার ক্লাস রাখা হইয়াছিল। ইহার বিবরণ পরে বিস্তৃতভাবে দেওয়া যাইবে।

অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্রকৃষ্ট রাজনীতি বোধে, তাঁহারা প্রারম্ভে সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সান্ধিক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া নবীনের প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হইয়াছিলেন।

এই আন্দোলন এদেশীয়দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাঁহারাও এই সন্ধিক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ করিবেন? তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তির স্থির করিলেন যে, প্রাচীনকে বর্জ্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তবে ইহা স্মরণীয় যে, তাঁহাতে যাহা ছিল অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই। তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ত্ব তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যনীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক সকল প্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ এক দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণও অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহা কিছু প্রাচীন সকলি মন্দ এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল পরে নির্দ্দেশ করিতেছি।

এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের

গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মনও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসিবিপ্লব-জনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, এই তাঁহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। ফরাসি-বিপ্লবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিয়া বঙ্গসমাজে কার্য্য করিয়াছে, তাহার প্রভাব এই সুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।

যে ১৮২৮ সালের মার্চ্চমাসে ডিরোজিও হিন্দুকালেজের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, সেই মার্চ্চমাসেই তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্ট এদেশ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার পদাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবর্ত্তী জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এদেশে পৌঁছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। একদিকে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং নবপ্রবর্ত্তিত ইংরাজী শিক্ষার উন্মাদিনী শক্তি, অপরদিকে বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের শুভাগমন,—বিধাতা যেন সময়োপযোগী আয়োজন করিলেন।

এই নবযুগের প্রবর্ত্তনের সময় সর্ব্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষের যে দুইটি সদ্‌গুণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কে সেই গুণদ্বয় পূর্ণমাত্রাতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহাতে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে ধীরচিত্ততা, বিচারশীলতা, সকল দিক দেখিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি, যেমন দেখা গিয়াছিল, কর্ত্তব্য পথ একবার নির্দ্ধারিত হইলে তদবলম্বনে দৃঢ়চিত্ততা তেমনি দৃষ্ট হইয়াছিল। সহমরণ নিবারণ, ঠগীদমন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যে তাঁহার গুণের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্ববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই সংকল্প করিয়া রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সপ্ত বৎসর গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এদেশে পদার্পণ করিলে রামমোহন রায়ের কার্য্যোৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাঁহার বন্ধু উইলিয়ম আডাম ত্রীশ্বর বাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বর-বাদী হওয়ার পর তাঁহাকে শ্রীরামপুরের বাপ্তিষ্ট-মিশনারিগণের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবধি শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন; এবং বৈরভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে খ্রীষ্টীয়দিগের সহিত রামমোহন রায়ের ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপর্য্যুপরি

Precepts of Jesus, Appeals to the Christian public, Brahmanical Magazine প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী ছিলেন, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়গণও বিরোধী হইলেন। রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীয় অভীষ্টপথ পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তাঁহার লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি ধর্ম্মতলাতে "ইউনিটেরিয়ান প্রেস" নামে একটি প্রেস স্থাপন করিলেন; হরকরা নামক তদানীন্তন ইংরাজী সংবাদ পত্রের আফিস গৃহের উপরতলায় তাঁহার বন্ধু আডামের জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন; আচার্য্যরূপে আডামের ভরণ পোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং স্বীয় সন্তানগণ ও বন্ধুগণ সহ তাঁহার উপাসনালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বন্ধুবর আডামের জন্য রামমোহন রায় দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ইহা তিনি নিজে দিয়াছিলেন, কি চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। বোধ হয় ইহার অধিকাংশ তাঁহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরের রাজত্বের প্রারম্ভেই সহমরণ নিবারণের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংলণ্ডের প্রভুদিগের সহিত চিঠি পত্র লেখা, নানা স্থান হইতে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছিল। তৎকালের নিজামত আদালতের কোর্টনি স্মিথ, (Courtney Smith) আলেকজাণ্ডার রস (Alexander Ross) আর. এইচ. রাট্রে (R. H. Rattray) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ প্রথা নিবারণের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সতর্কতার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, প্রজারা সহ্য করে কি না। এই সকল সংবাদ ও মত সংগ্রহ করিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইয়া গেল। ১৮২৮ সালের প্রারম্ভে লর্ড আমহার্ষ্ট লিখিলেন—"I think there is reason to believe and expect that, except on the occurrence of some very general sickness, such as that which prevailed in the lower parts of Bengal in 1825, the progress of general instruction and the unostentatious exertions of our local officers will produce the happy effect of a gradual diminution, and at no very distant period, the final extinction of the barbarous rite of suttee."—অর্থাৎ এরূপ আশা করা যায় যে, শিক্ষা বিস্তারের গুণে ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে এই নৃশংস প্রথা তিরোহিত হইবে। বলা বাহুল্য গবর্ণর জেনেরালের এইরূপ মীমাংসা

রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাঁহাদের প্রধান কার্য্য এই হইল যে, কোনও স্থানে কোনও রমণী সহমৃতা হইতেছেন এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার জন্য যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল কি না তাঁহারা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, সেই কারণে তাঁহারা দলে দলে সহমরণের স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা দমনের পক্ষে অনেক সহায়তা করিতে লাগিল।

এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ির বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদিন রবিবার রামমোহন রায় সন্ধ্যার আড়ামের উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়ীতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন,—"দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?" এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়-সভার বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে সাপ্তাহিক ব্রাহ্ম উপাসনার একটি বাড়ী ভাড়া করা স্থির হইল। তদনুসারে উক্ত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটী ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবারে সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনা হইত। কার্য্যপ্রণালী এইরূপ ছিল, প্রথমে দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। তৎপরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করিলে সংগীতানন্তর সভা ভঙ্গ হইত। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন।

ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল; তাঁহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তাঁহার আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্ব্বদা কটূক্তি বর্ষণ হইত।

যখন একদিকে এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন হিন্দুকালেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিয়াই চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে সেইরূপ কালেজের

প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়া লইলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দুকালেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন যাহা তাঁহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিভাগেই গিয়াছিলেন, কেহই ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্যের পরিচয় পরে দিব, একজনের বিষয় সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্য কিছু বলিতেছি।

একবার বোম্বাই প্রদেশে গিয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের সুযোগ্য ও সম্মানিত সভ্য পরলোকগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, তাঁহাদের যৌবনকালে বোম্বাই সহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত নামটি এখন বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি ইংরাজী ভাষাতে সুশিক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী বোম্বাই হইতে গুজরাটের অন্তর্বর্ত্তী কাটিওয়াড় প্রদেশে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কোনও সংবাদপত্রে "Misgovernment at Katiwad"—"কাটিওয়াড়ে অরাজকতা" নাম দিয়া পত্র সকল মুদ্রিত হইতে লাগিল। ঐ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা ও লোকচরিত্রদর্শন-ক্ষমতার পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্দ্দিকে সেই চর্চ্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হইল। কাটিওয়াড়ের রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। ক্রমে সন্ন্যাসী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না; রাজাকে বলিলেন,—"আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়া কাঁদে, তাই তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাসনকার্য্যের উন্নতি করুন, নতুবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।" রাজা সন্ন্যাসীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী একবর্ষকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্ষ পরে রাজা সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমার রাজপদের লালসা নাই, থাকিলে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব কেন? তবে মহারাজ যদি দেশ সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারি।" তদবধি সন্ন্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে, "পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তৎ তৎ পদে ইংরাজী-শিক্ষিত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-কলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।" তদনুসারে সন্ন্যাসী বোম্বাই সহরে আসিলেন এবং একদল ইংরাজী-শিক্ষিত কর্ম্মচারী লইয়া

গেলেন। নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা প্রায় এক বৎসরকাল সন্ন্যাসীর অধীনে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে পূর্ব্বপদচ্যুত কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে রাজার আবার মতিভ্রম হইল এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে, সন্ন্যাসীর দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তদনুসারে সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহারা সকলে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি সন্ন্যাসী তাঁহাদের নিকট তাঁহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্ব্বদা করিতেন এবং তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাঁহাদের দলের মধ্যে কে সন্ন্যাসব্রত লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না।

ডিরোজিওর কার্য্য গ্রহণের পর একবৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যগণ এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয়া পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের মধ্যেই শিষ্যদলের মনের উপরে ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ তৎকালীন কালেজের কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক মিঃ এডোয়ার্ডস কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

"The students of the first, second and third classes had the advantage of attending a conversazione established in the school by Mr. Derozio, where readings in poetry, and literature, and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours. Though they were without the knowledge or sanction of the authorities yet Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or out of the service. The students in their turn loved him most tenderly ; and were ever ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life. In fact, Mr. Derozio acquired such an ascendancy over the minds of his pupils that they would not move even in their private concerns without his counsel and advice. On the other hand, he fostered their taste in literature ; taught the

evil effects of idolatry and superstition; and so far formed their moral conceptions and feelings, as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age. Such was the force of his instructions, that the conduct of the students out of the College was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of *truth*. Indeed, the *College boy* was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which, those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy'.

ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়া তাঁহার (Academic Association) একাডেমিক এসোসিএশনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন অন্য কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মাণিকতলার একটি বাটীতে অধিবেশন হইত। ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও উমাচরণ বসু নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেবিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি Col. Benson, পরবর্ত্তী সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাল Col. Beatson, বিশপ কালেজের অধ্যক্ষ Dr Mills প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও অসংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিওর শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইল তাহা পূর্ব্বোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were

held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronised * * * *. The most glowing harangues were made at Debating Clubs which were then numerous. The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; thier ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind was viewed with indignation; the question at a very large meeting was carried unanimously that Hindu women should be taught; and we are assured of the fact that the wife of one of the leaders of this movement was a most accomplished lady, who included amongst the subjects, with which she was acquainted, moral philsophy and mathematics."

হিন্দুকালেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগের সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে লাগিল। ডেবিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,—"ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্ত্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।" আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত; তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য "আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো" বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, "এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি" এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।

তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে

বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে সহরে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। হিন্দু কালেজের কমিটী প্রথমে হেড মাষ্টার ডি. আন্সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন মাষ্টারেরা স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন না করেন। হেড মাষ্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন। একদিন ডিরোজিও তাঁহার কার্য্যের বিবরণ দিবার জন্য হেড মাষ্টারের নিকট গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়ার সেখানে দণ্ডায়মান। আন্সলেম সাহেব উক্ত কার্য্য বিবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। ডিরোজিও সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আন্সলেম রাগিয়া হেয়ারকে খোসামুদে বলিয়া গালি দিলেন। হেয়ার হাসিয়া বলিলেন—"কার খোসামুদে?" হেয়ারের অপরাধ এই যে, তিনি ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন। হিন্দুস্কুল কমিটী আবার আদেশ করিলেন যে, শিক্ষকেরা বালকদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন না এবং ক্লাসঘরে খাবার আনিয়া খাইতে পারিবেন না।

একদিকে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন অপরদিকে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিলেন:—

It is hereby declared, that, after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment"—*Regulation of 4th December, 1829.*

ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে ব্রহ্মসভাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে সেই ভবনের ট্রষ্টডীড্ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, ঐ ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহারার্থ থাকিবে, এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে; তদ্ভিন্ন তথায় কোনও পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না।

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাধাকান্ত দেব সারথি হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। মতিলাল শীল কলুটোলাতে তাহার এক শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপন

করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রিকার সম্পাদক রূপে কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে দিন ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইত সে দিন সহরের ধনীদের গাড়ীতে রাজপথ পূর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, তাঁহারা অনেক দিন রামমোহন রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, আর উপেক্ষা করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। এই আক্রোশ কার্য্যেও প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন কি যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার দলস্থ লোকদিগের ভবনে বিদায় আদায় গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকেও বর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। রামমোহন রায় অবিচলিত চিত্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গিয়া উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি উপাসনা মন্দিরে আসিবার সময়ে পদব্রজে আসিতেন, ফিরিবার সময় নিজ গাড়ীতে ফিরিতেন। গাড়ীতে যাইবার সময় কোন কোনও দিন পথের লোকে ইট পাথর, কাদা ছুড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ীর দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন, "কোচম্যান হেঁকে যাও"। সতীদাহনিবারণ ও ব্রহ্মসভা স্থাপন নিবন্ধন কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সতীদাহ নিবারণ-বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল। রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন পত্র লিখিলেন তাহাতে তাঁহার কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে সুবিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডফ কলিকাতাতে পদার্পণ করিলেন। তখন রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। ডফ রামমোহন রায়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অনুভব করিলেন যে, এদেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। তদনুসারে তিনি এক প্রকার স্কটলণ্ডস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের অনভিমতে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। রামমোহন রায় সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ব্যবহৃত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী নামক বাটী স্থির করিয়া দিলেন; এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়া দিলেন। সেই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে সহরের বড়লোক হইয়াছিলেন।

ডফ স্কুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশয়ে বর্ত্তমান হিন্দুকালেজের সন্নিকটে বাসা করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন।

রামমোহন রায় ডফকে স্বীয় কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। কালেজের বালকেরা অনেকে ডফ ও ডিয়ালট্রির বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দুকালেজ কমিটির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা আদেশ প্রচার করিলেন যে, কালেজের বালকগণ কোনও বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি দিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে কালেজ কমিটীর হিন্দুসভ্যগণ ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দু-সভ্যগণের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়া সভা ডাকিলেন। ঐ সভায় এই প্রশ্ন উঠিল—ডিরোজিওর স্বভাব চরিত্র এরূপ কি না এবং তাঁহার সংসর্গে বালকদিগের এরূপ অপকার হইতেছে কি না, যাহাতে তাঁহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত বোধ হয় না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত দিলেন, এবং হিন্দুসভ্যগণের অনেকেও এতটা বলিতে প্রস্তুত হইলেন না। অবশেষে এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া আর একভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে, দেশীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কালেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেশীয় সমাজের অবস্থা বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু বলিতে পারিলেন না; সুতরাং কোনও পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন না। অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল।

ডাক্তার উইলসন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহার প্রতি যে যে দোষারূপ করা হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে; ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই, এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সেরূপ ব্যবহার কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন।

ডিরোজিও কালেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামক একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়া তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কাগজ ত্বরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ডিরোজিও কলিকাতার ফিরিঙ্গীদলের এক জন নেতা

বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তৎপরে যে কয়েকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, সে সময়ের মধ্যে ফিরিঙ্গীসমাজের উন্নতির জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনও কাজ হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার তিনি দুরারোগ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাণবায়ু তাঁহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ইহার পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সে ব্যক্তি ডিরোজিওর মতো ও ভগিনীকে ধনে প্রাণে সারা করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা জন্মের মত সমাজসাগরবক্ষে চিরবিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গেলেন। ডিরোজিও অন্তর্হিত হইলে কিছুদিন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল; এবং তদর্থ একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালাবর্ত্তে সকলি মিলাইয়া গেল। নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা-গুরুর চিহ্নমাত্রও রহিল না।

ডিরোজিও হিন্দুকালেজ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেলেন তাহা আর থামিল না। ১৮৩১ সালের ২৩ আগষ্ট তাঁহার শিষ্যগণ এক মহা বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিষ্যদলের একটা আড্ডা ছিল। উক্ত দিবস কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান সংসাহসের কার্য্য ছিল মুসলমানের রুটি ও বাজার হইতে পক্ক করা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি পার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ঐ গোহাড়, ঐ গোহাড়।" আর কোথায় যায়! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার শব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল—"আপনার দৌহিত্রকে বর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব না।" ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিত্রের প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন। বেচারা কৃষ্ণমোহন এ সকলের কিছুই জানেন না। তিনি সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর আশ্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে যান কোথায়, উপায়ান্তর না পাইয়া স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখন কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কৃষ্ণমোহন এই

বৎসরের মে মাস হইতে Inquirer নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই পত্রে তিনি নির্য্যাতনকারী হিন্দুদিগের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়া উঠিল।

১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের Inquirer পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে, ডিরোজিওর শিষ্যদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বাল্যকালে অত্যন্ত জেঠা, ইয়ার ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া বিদিত ছিলেন। একারণে রামগোপাল ঘোষ তাঁহার সঙ্গে বড় মিশিতেন না। কিন্তু ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়া মহেশের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মানুরাগ ও সচ্চরিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

সেই ১৮৩২ সালে ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, হিন্দুকালেজের সমুদয় ভাল ভাল ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুকালেজে শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরে রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিষ্টলনগরে ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিলেন; এবং রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ও মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পরামর্শে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য উন্মুক্ত হইল। ঐ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভারতশাসনের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করেন। তাহার ৮৭ ধারাতে লিখিত হইল :—

"And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein, shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment, under this said Company."

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এদেশীয়গণ হাজার বড় হইলেও সেরেস্তাদারের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ও পদে উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন সম্বন্ধে যে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার বিষয়ে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত

ব্যক্তিদিগকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর করা হইতে লাগিল। অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইতে এদেশীয়দিগের বক্ষ হইতে একখানি পাথর তোলা হইল। সুখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়দিগকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত ঐ সকল পদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রামতনু লাহিড়ীর যৌবন-সুহৃদগণ বা নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ

শিক্ষকশ্রেষ্ঠ ডিরোজিওর প্রতিভার জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু-কালেজের যুবক ছাত্রগণ কিরূপে তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিল আশা করি তাহা সকলে এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে বঙ্গদেশে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। বালকদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি যে তাঁহার দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা এক প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা বিদ্যালয়ে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। অনেকে সেজন্য গুরুজনের হস্তে কঠিন নিগ্রহ সহ্য করিত তথাপি যাইতে বিরত হইত না। এই সকল বালকের চিত্তেই ডিরোজিওর প্রভাব প্রধানরূপে কার্য্য করিয়াছিল; ইহাদের সকলেই তাঁহার একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভ্য হইয়াছিল; ইহাদের অনেকে রোগশয্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিল। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় এই দলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রতিভাবলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ ছিলেন না, বরং অনেক বিষয়ে ইঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও উপদেষ্টার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও চরিত্রের গুণে লাহিড়ী মহাশয় ইঁহাদের সকলের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইঁহাদের সকল কার্য্যে তিনি সঙ্গে থাকিতেন; সকল চিন্তা ও শ্রমের অংশী হইতেন; এবং ডিরোজিওর উপদেশের অনুসরণে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাঠদ্দশার পরে ও যৌবনের কার্য্যক্ষেত্রে ইঁহাদের বন্ধুতা

অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল যৌবন কেন ইঁহাদের অধিকাংশের সহিত বার্দ্ধক্যেও লাহিড়ী মহাশয়ের অতি গভীর প্রীতি ও প্রগাঢ় আত্মীয়তা বিদ্যমান ছিল। বাল্যের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ প্রগাঢ় বন্ধুতা বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব হইয়াছে।

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদ্‌গণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইতেছি।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ও লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদ্‌গণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি। ১৮১৩ সালে কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে বর্ত্তমান বেচ্‌চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে মাতামহের আলয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার মাতামহের নাম রামজয় বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতার তৎকালপ্রসিদ্ধ ধনী, যোড়াসাঁকো নিবাসী, শান্তিরাম সিংহের ভবনে সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই শান্তিরাম সিংহ মহাভারত-প্রকাশক সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ। কৃষ্ণমোহনের পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার নিবাস ২৪ পরগণার নবগ্রাম নামক গ্রামে ছিল। জীবনকৃষ্ণ কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন; এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দুহিতা শ্রীমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার কৃষ্ণমোহন ব্যতীত আর দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। পুত্র দুইটির নাম ভুবনমোহন, ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সর্ব্বকনিষ্ঠ কালীমোহন। ইনি কৃষ্ণমোহনের পদবীর অনুসরণ করিয়া পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কন্যাটির শিবনারায়ণ দাসের লেন নিবাসী হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র মনুলাল চট্টোপাধ্যায় পরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বংশবৃদ্ধি হওয়াতে জীবনকৃষ্ণের শ্বশুরালয়ে বাস করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেনে একটি স্বতন্ত্র আবাসবাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কুলীনের সন্তান, সেরূপ বিদ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে অতি ক্লেশে নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। এরূপ শুনিয়াছি, পতিপরায়ণা স্বধর্ম্মনিরতা শ্রীমতী দেবী গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্রামার্থ যে কিছু সময় পাইতেন, সেই সময়ে কাটনা কাটিয়া, বেটের দড়ি পাকাইয়া, পৈতার সুতা প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা পতির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে অনেক সহায়তা হইত। সে সময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার কালীতলাতে স্কুল সোসাইটীর অধীনে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ কি ১৮১৯ সালে শিশু কৃষ্ণমোহন সেই পাঠশালাতে ভর্ত্তি হইলেন। হেয়ার তাঁহার পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধানকার্য্যে কিরূপ মনোযোগী ছিলেন,

তাহা অগ্রে বর্ণনা করিয়াছি। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ১৮২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটীর স্কুলে, বর্ত্তমান সময়ে তন্নামপ্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে লইয়া গেলেন। ১৮২৪ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকালেজ নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কালেজের নব-নির্ম্মিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কৃষ্ণমোহন স্কুলসোসাইটীর অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দুকালেজে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ মনোযোগ ছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কোনও দিন তাঁহার উদরে অন্ন যাইত কোনও দিন বা যাইত না, কিন্তু সেজন্য কেহ তাঁহাকে বিষণ্ণ বা স্বকার্য্য-সাধনে অমনযোগী দেখিতে পাইত না। এমন কি তিনি স্বীয় জননীর সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একবেলা তিনি রন্ধন করিবেন, সে সময়ে মা নিজ শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি স্কুল হইতে আসিয়া রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; অথচ বিদ্যালয়ে কেহই তাঁহাকে শিক্ষা বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারিত না।

ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিবামাত্র অপরাপর বালকের ন্যায় কৃষ্ণমোহনও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তখন প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ডিরোজিও তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন্ যখন স্থাপিত হইল, তখন কৃষ্ণমোহন তাহার যুবকসভ্যগণের মধ্যে একজন নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। ১৮২৮ সালে তাঁহার পিতা বিষম কলেরা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ১৮২৯ সালে নবেম্বর মাসে তিনি হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই হেয়ার তাঁহাকে নিজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩১ সালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর Reformer "রিফরমার" নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন; তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উক্ত বৎসরের মে মাসে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Inquirer নামে এক কাগজ বাহির করেন। এই কাগজে তৎকালোচিত রীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে ক্রটী করিতেন না। এই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতিবিদ্বেষ তাঁহার অন্তরে বহুদিন ছিল। ১৮৫০ সালে তিনি একখানি বিদ্রূপপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধাকান্ত দেবকে গাধাকান্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডফ এদেশে আসিলেন এবং কালেজের সন্নিকটে বাসা লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি; এবং ঐ সকল বক্তৃতা শুনিতে যাওয়াতে হিন্দুকালেজের ডিরোজিওর শিষ্যগণ কালেজকমিটীর কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি। কৃষ্ণমোহন বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে ঐ সকল বক্তৃতা শুনিতে

যাইতেন এবং তদ্ভিন্ন ডফ ও ডিয়াল্‌ট্রির (Dealtry) বাসাতে গিয়া তর্কবিতর্ক করিতেন।

তৎপরে ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে যে ঘটনা ঘটিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হয় তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি।

কৃষ্ণমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে সে রাত্রে আদরে গৃহীত হইলেন। তিনি এই ভবনে ঠিক কতদিন ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, তাঁহাকে কয়েক দিনের মধ্যেই এই আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিতে হইয়াছিল। কারণ দক্ষিণারঞ্জনের বন্ধুগণ তাঁহার ভবনে আসিলে, তাঁহার পিতা বিরক্ত হইতেন, এজন্য পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একবার দক্ষিণারঞ্জনের পিতা স্বীয় পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কোনও বন্ধুকে অপমান করাতে দক্ষিণারঞ্জন পিতৃগৃহ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তখন ডিরোজিও তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করেন। এই বন্ধু হয়ত কৃষ্ণমোহন।

যাহা হউক, গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া কৃষ্ণমোহন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ কিছুতেই মন্দীভূত হইল না। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাঁহার Inquirer পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন এবং অসংকোচে ডফ্, ডিয়াল্‌ট্রি প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের ভবনে যাতায়াত এবং তাঁহাদের সহিত পানভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের ইনকোয়ারারে সংবাদ বাহির হইল যে, হিন্দুকালেজের অন্যতম ছাত্র ও কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজে তুমুল আন্দোলন উঠিল। তৎপরবর্ত্তী অক্টোবর মাসের ১৭ই দিবসে কৃষ্ণমোহন স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি গৃহ-তাড়িত হওয়ার পর কিছুদিন কতিপয় ইউরোপীয়ের সহিত খুব মিশিতেন। তন্মধ্যে কাপ্তেন কর্বিন (Captain Corbin) নামে একজন সেনাদল-ভুক্ত কর্ম্মচারী প্রধান ছিলেন। তাঁহার ভবনে তিনি তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন সে সময়ে কর্ণেল পাউনি (Colonel Powney) নামক একজন খ্রীষ্টভক্ত কর্ণেল কলিকাতাতে ছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া কৃষ্ণমোহন একবার ষ্টীমার যোগে সাগর দ্বীপে গিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করিয়াছেন তাঁহার খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ ইহাদেরই প্রভাবে।

যাহা হউক ইহার পরে কৃষ্ণমোহনের জীবনে সংগ্রামের পর সংগ্রাম উন্নতির পর উন্নতি চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রণয়িনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রথমে তাঁহার সহচারিণী হইতে চান নাই। অবশেষে অনেকদিন অপেক্ষা করার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮৩৭ সালে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টিয় আচার্য্যের পদে উন্নীত হইলেন। তাঁহার প্রথম আচার্য্যের

কার্য্য তাঁহার বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে। ১৮৩৯ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কালীমোহনকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ঐ সালেই তাঁহার জন্ম হেদুয়ার কোণে এক ভজনালয় নির্ম্মিত হইল। তিনি সেখানে থাকিয়া তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্ম যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইখানে অবস্থান কালে সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; এবং তাঁহার কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন।

১৮৪৫ সাল হইতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের প্ররোচনায় তিনি "সর্ব্বার্থ সংগ্রহ" নামে জ্ঞান-গর্ভ মহা-কোষ স্বরূপ গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া ১৮৪৬ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে একখানি এলফিনষ্টোন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা বীটন বা বেথুনের মৃত্যু হইলে তাঁহার নামে যে সভা স্থাপিত হয়, কৃষ্ণমোহন তাঁহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৫২ সালে তিনি বিশপ কালেজের অধ্যাপকের পদে মনোনীত হইয়া শিবপুরে গিয়া বাস করেন। ১৮৬১-৬২ সালে হিন্দু ষড়দর্শন বিষয়ে প্রভূত গবেষণাপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ সালে শিবপুরে তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মৃত্যু হয়। ঐ ১৮৬৭-৬৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ সালে Aryan Witness "আর্য্য শাস্ত্রের সাক্ষ্য" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রুকের পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি ভারতসভার সভাপতিরূপে মনোনীত হন। ১৮৮০ সালে কলিকাতার অধিবাসিগণ তাঁহাকে মিউনিসিপালিটীতে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে বরণ করেন। মিউনিসিপালিটীতে সকলে তাঁহাকে নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ ও অধর্ম্ম-বিদ্বেষী লোক বলিয়া জানিত। তিনি স্বকর্ত্তব্য-সাধনে কখনই অপরের মুখাপেক্ষা করিতেন না। এইরূপে চিরদিন তিনি স্বদেশে বিদেশের লোকের আদর সম্ভ্রম পাইয়া সকলের সম্মানিত হইয়া কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে কৃষ্ণমোহন স্বর্গারোহণ করেন।

রামগোপাল ঘোষ

ডিরোজিওর শিষ্যদলের অগ্রণীদিগের মধ্যে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই রামগোপাল ঘোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতী ও যশস্বী হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বর্ত্তমান বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট নামক গলিতে স্বীয় মাতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ। পৈতৃক নিবাস বাগাটী গ্রামে। ঐ গ্রাম

হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী তীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত। তাঁহার পিতামহ কলিকাতার কিং হামিণ্টন কোম্পানির (King Hamilton & Co.) আফিসে কর্ম্ম করিতেন। কলিকাতায় চীনাবাজারে তাঁহার পিতার একখানি দোকান ছিল। সেখানে তিনি সামান্ত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন।

রামগোপালের শৈশবকালের শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না। সে সম্বন্ধে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে। এক জনশ্রুতিতে বলে, তিনি প্রথমে শারবরণ (Sherburne) সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে তিনি হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইতে পান। সে ঘটনাটি এই, তাঁহার কোনও স্বসম্পর্কীয়া বালিকার সহিত হিন্দুকালেজের অন্ততম ছাত্র, ও পরবর্ত্তী সময়ের ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্ততম সভ্য হরচন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়। বালক হরচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক রামগোপালের মেধার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন ; এবং তাঁহাকে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইবার জন্ম উৎসাহিত করেন। রামগোপাল তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বীয় পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। তাঁহার পিতার এরূপ অর্থ সামর্থ্য ছিল না যে, তিনি হিন্দুকালেজের বেতন দিয়া পুত্রকে পড়াইতে পারেন। এই সময়ে মিষ্টর রজার্স (Mr. Rogers) নামক কিং হামিণ্টন কোম্পানির আফিসের একজন কর্ম্মচারী শিশু রামগোপালের বেতন দিতে স্বীকৃত হন। তাহাই ভরসা করিয়া তাঁহাকে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। অপর জনশ্রুতি এই যে, রজার্স সাহেবের সাহায্যে তিনি প্রথম হইতেই হিন্দুকালেজে পড়িতে আরম্ভ করেন।

যাহা হউক তাঁহাকে অধিক দিন বেতন দিয়া পড়িতে হয় নাই। তাঁহার পাঠে মনোযোগ ও অসাধারণ মেধা দেখিয়া মহামতি হেয়ার তাঁহাকে ত্বরায় অবৈতনিক ছাত্রদলে প্রবিষ্ট করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে রামগোপাল ডিরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এখানে আসিয়া রামতনু লাহিড়ীর সহিত তাঁহার সম্মিলন ও আত্মীয়তা হইল। যে কতিপয় বালক ডিরোজিওর দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, রামগোপাল তাহাদের মধ্যে একজন। রামগোপালের আশ্চর্য্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ডিরোজিও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ; এবং ছুটীর পর তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দর্শনকার ও সুকবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। একদিন সুবিখ্যাত দর্শনকার লকের (Locke) গ্রন্থাবলী পড়িবার সময় রামগোপাল বলিয়া উঠিলেন, "লকের মস্তক প্রবীণের ন্থায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্থায়।" অর্থাৎ লক্ অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে গভীর মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পরে রামগোপাল অনুগত শিষ্যের ন্থায় ডিরোজিওর অনুবর্ত্তন করিতেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন যখন স্থাপিত হইল

তখন তিনি তাহার সভ্যগণের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। এই খানেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হইল। তিনি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এখন হইতেই তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি সার এডোয়ার্ড রায়ান, (Sir Edward Ryan) মিষ্টর ডবলিউ. ডবলিউ. বার্ড (Mr. W. W. Bird) প্রভৃতি তৎকালপ্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ একাডেমিকের অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। সার এডওয়ার্ড রায়ান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন এবং বার্ড মহোদয় পরে বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সভাতে রামগোপালের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তদবধি সর্ব্ববিষয়ে রামগোপালের উৎসাহদাতা ছিলেন।

রামগোপাল কালেজের সমগ্র পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে মিষ্টর জোসেফ নামে একজন ধনবান য়িহুদী বাণিজ্য করিবার আশয়ে কলিকাতাতে আগমন করেন। তাঁহার একজন ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ দেশীয় সহকারীর প্রয়োজন হয়। তিনি কলবিন কোম্পানির আফিসের মিষ্টর এণ্ডারসনের (Anderson) নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করেন। এণ্ডারসন মহামতি হেয়ারের নিকট লোক চাহিয়া পত্র লেখেন। হেয়ার রামগোপালকে উত্তমরূপে চিনিতেন। যে কার্য্যের জন্য লোকের প্রয়োজন রামগোপাল যে সে কার্য্যে সুদক্ষ হইবেন, ইহা তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল, সুতরাং তিনি রামগোপালকে মনোনীত করিলেন। ১৮৩২ সালে কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রামগোপাল মিষ্টর জোসেফের সহকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনুমানে বোধ হয় তাঁহার এত শীঘ্র কালেজ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কারণ তিনি বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও প্রকারে সময় করিয়া কিছুকাল কালেজে আসিতেন এবং কোন কোনও বিষয় ছাত্রদিগের সহিত সমভাবে শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।

রামগোপাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেতনে মিষ্টর জোসেফের আফিসে কর্ম্ম লইয়াছিলেন। কিন্তু ত্বরায় তাঁহার পদবৃদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে মিষ্টর কেলসল (Kelsall) নামে অপর এক ধনী আসিয়া জোসেফের সহিত যোগ দিলেন; এবং রামগোপাল তাঁহাদের সম্মিলিত কারবারের মুচ্ছুদ্দি হইলেন; তাঁহার ধন দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে জোসেফ ও কেলসল এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল, তখন রামগোপাল (Kelsall, Ghose & Co, নামে) স্বাধীন বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর গেল; তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কেলসলের সঙ্গেও তাঁহার বিবাদ ঘটিল। এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত নহে। এইমাত্র জানা আছে যে, তিনি মিষ্টর কেলসলের সহিত বিবাদ করিয়া,

ইংরাজসমাজের রীতি অনুসারে তাঁহার প্রদত্ত সমুদয় উপহার সামগ্রী ফিরাইয়া দিয়া নিজে ঘোষ কোম্পানি (R. G. Ghose & Co.) নাম লইয়া স্বতন্ত্রভাবে সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে ঘটিয়াছিল। এ কার্য্যেও তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হইয়াছিল।

এদিকে যখন তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল, অপর দিকে তিনি আত্মোন্নতি ও যথাসাধ্য স্বদেশের কল্যাণ সাধন বিষয়ে উদাসীন রহিলেন না। তাঁহার একটা বড় গুণ এই ছিল যে, তিনি বন্ধুগণের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। একদিন বন্ধুরা বাটীতে না আসিলে অস্থির হইয়া উঠিতেন; তাহাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইতেন। যতক্ষণ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার সাধ্য থাকিত করিতেন, না পারিলে অপর কোনও প্রকারে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে একবার তাঁহার প্রিয়বন্ধু রামতনু লাহিড়ীর বড় অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছিল। তখন নিজের আয় সামান্য, অধিক অর্থ সাহায্য করিতে না পারিয়া তিনি মিষ্টর জোসেফকে বলিয়া রামতনু বাবুকে তাঁহার পারসীশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন যখন যে বাল্যবন্ধুর বিপদ ঘটিয়াছে, রামগোপাল বুক দিয়া পড়িয়াছেন। উত্তরকালে তাঁহার বাল্যবন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতা আসিলে, রামগোপাল স্বীয় গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে তাঁহাকে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেমন সহৃদয়তা তেমনি সত্যপরায়ণতা। ঠিক সময়টা জানিতে পারি নাই, শুনিয়াছি তাঁহার পিতামহের যখন মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার স্বসমাজস্থ লোকেরা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ও স্বজাতিচ্যুত বলিয়া গোলযোগ করিবার উপক্রম করিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা ভীত হইয়া তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণলোচনে একবার এই কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন যে, তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজবিরুদ্ধ আচরণ কিছু করেন না। রামগোপাল পিতার কাকুতি মিনতিতে ক্লিষ্ট হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"আপনার অনুরোধে আমি সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে এবং সকল ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারিব না।" তাঁহার এই সত্যপরায়ণতার কথা দেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল; তিনি স্বদেশবাসিগণের চক্ষে অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একবার তাঁহার বাণিজ্য কর্য্যের মধ্যে সংকটকাল উপস্থিত হয়। তখন এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছিল যে, তিনি হয়ত নিজের কারবারের দেনা শুধিতে গিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইবেন। সে সময়ে তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে স্বীয় বিষয় বেনামী করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, আমি উত্তমর্ণদিগকে প্রতারণা করিতে পারিব না।"

তাঁহার সহৃদয়তা ও সত্যপরায়ণতার ন্যায় আত্মোন্নতির বাসনা ও

পরোপকার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। তাঁহার ১৮৩৮ সালের লিখিত দৈনিক লিপি আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহাতে দেখিতেছি এমন দিন যায় নাই, যে দিন তিনি কিছু না কিছু পড়িতেছেন বা জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত আছেন। যে দিন কিছু ভাল বিষয় পড়িতেছেন না সে দিন দুঃখ করিতেছেন। তিনি বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও প্রতিদিন তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে দুই চারি জন তাঁহার ভবনে আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে সদালাপে ও সৎগ্রন্থ পাঠে সুখে কাল কাটিত।

এই সময়ে তাঁহারা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আত্মোন্নতির জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। একাডেমিক এসোসিয়েশন ত ছিলই। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাহা হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব প্রভাব আর রহিল না। তথাপি রামগোপাল প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ তাঁহাকে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা কালগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ডিরোজিওর শিষ্যদল সমবেত হইয়া "লিপি-লিখন সভা" (Epistolary Association) নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাহার সভ্যগণ পরস্পরের সহিত চিঠিপত্রে নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। এ সভা কিছুদিন চলিল। তৎপরে তাঁহারা অনুমান ১৮৩৮ সালে "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; রামগোপাল এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই সভার সভ্যগণ পূর্ব্বপ্রচারিত "জ্ঞানান্বেষণ' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। রামগোপাল তাহার লেখকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তারূপেই রামগোলের প্রধান খ্যাতি আছে। নিম্নলিখিত ঘটনাসংযোগে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৪২ সালে দ্বারকনাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময় জর্জ টমসন্ (George Thomson) নামক একজন সুবিখ্যাত বক্তাকে সঙ্গে করিয়া আসেন। এই জর্জ টমসন্ সে সময়কার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

টমসন্ ১৮০৭ সালে ইংলণ্ডের লিবারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর বয়সের সময়ে ইঁহার পিতামাতা ইঁহাকে লণ্ডন নগরে আনেন। পিতামাতার অবস্থা মন্দ বলিয়া টমসন্ বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই বলিলে হয়। যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন ঘরে বসিয়া। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই দাসত্ব প্রথার দিকে ইঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইনি তাহার বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সালে বিবাহিত হইয়া ১৮৩৪ সালে

দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য আমেরিকা গমন করেন। ১৮৩৬ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ভারতহিতৈষী কতিপয় সাধুপুরুষের সহিত সম্মিলিত হন। তৎপরে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। জর্জ টমসন্ এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও রাজনীতির চর্চ্চা বিষয়ে এদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বক্তা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার এক এক বক্তৃতাতে তৎকালীন সমাজ অগ্নিময় হইয়া যাইত। তাঁহার উৎসাহে ও সাহায্যে কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পূর্ব্বপুরুষ মনে করা যাইতে পারে। জর্জ টমসন্ এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ডিরোজিওর শিষ্যদল তাঁহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল তাঁহাদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজ্রনির্ঘোষে উত্থিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন শ্রীরামপুরস্থ পত্রিকা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (Friend of India) একবার লিখিলেন—"এখন দুই দিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে বালা হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে।"

এই সময় হইতে রামগোপাল রাজনীতি সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজনীতি বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিয়া অগ্নিময় ভাষা উদ্গীরণ করিতেন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতি স্থাপনের জন্য কলিকাতার টাউনহলে ১৮৪৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর এক সভা হয়। তাহাতে টর্টন, (Turton) হিউম, (Hume) কলভিল (Colville) প্রভৃতি কতিপয় সুবাগ্মী প্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যারিষ্টার প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হন। হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এদেশে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এজন্য এদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঐ সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, উক্ত ইংরাজগণের প্রতিকূলতাবশতঃ প্রস্তাবটি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন তাঁহারা এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রথমে ইংরাজগণ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন রামগোপালের প্রজ্বলিত অগ্নিসম তেজময় ও ওজস্বিনী ভাষা জাগিয়া উঠিল, তখন সকলকেই মৌনাবলম্বন করিয়া শুনিতে হইল। দেখিতে দেখিতে রামগোপালের অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তি সমগ্র সভাকে অভিভূত করিল; এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাঁহারই প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার ফল স্বরূপ হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অশ্বারোহী মূর্ত্তি

এখন গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখস্থ ময়দানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বক্তৃতা এরূপ ওজস্বিনী হইয়াছিল যে, পরদিন ইংরাজদিগের মুখপাত্র স্বরূপ প্রধান সংবাদপত্র লিখিল—"ভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিস্ দেখা দিয়াছে, একজন বাঙ্গালি যুবক তিনজন সুদক্ষ ইংরাজ বারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছে।"

১৮৫১ সালে যখন বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয় তখন তিনি ইহার কমিটীভুক্ত হন। ১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় এক মহাসভা হয়, তাহাতে রামগোপাল এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে যেমন ওজস্বিতা, তেমনি সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে (Sir Frederick Haliday) মহোদয় এদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে তৎপূর্ব্বে পার্লামেণ্টের নিযুক্ত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। রামগোপাল এই বক্তৃতাতে সেই সাক্ষ্যকে সুতীক্ষ্ণ বিচারছুরিকার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তাহাতে তাঁহার প্রতিভার খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তৎপরে ১৮৫৮ সালে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আনন্দসূচক এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে রামগোপাল বাগ্মিতার দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে হিন্দুপেট্রিয়টের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ সভাতে, লর্ড ক্যানিং-এর সম্বর্দ্ধনার্থ সভাতে, তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন তাহাও স্মরণযোগ্য। কিন্তু তাঁহার যে বক্তৃতা কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের স্মৃতিতে চিরদিন জাগরূক থাকিবে, যে জন্য তাঁহারা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহা নিমতলার শ্মশানঘাট সম্বন্ধীয় বক্তৃতা। ১৮৬৪ সালে কলিকাতার মিউনিসিপালিটী নিমতলার বর্ত্তমান শ্মশানঘাটকে গঙ্গাতীর হইতে স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন। এই সময়ে রামগোপাল সমগ্র কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের পক্ষ হইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন; এবং প্রধানতঃ তাঁহারই অগ্নিময় বক্তৃতার গুণে ঐ প্রস্তাব স্থগিত হয়।

রামগোপাল যে কেবল বক্তৃতার দ্বারাই রাজনীতির আন্দোলনে সহায়তা করিতেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে লেখনী ধারণও করিতেন। ১৮৪৯-৫০ সালে গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতেরও দণ্ডবিধির অধীন করাই ঐ সকল পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির "কালা আইন" (Black Acts) নাম দিয়া তদ্বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে এদেশে ইলবার্ট বিলের যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, ইহা যেন কতকটা তাহার অনুরূপ। ইংরাজগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি গালাগালি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তখন দেশের এমনি

অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন; এবং "A Few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি এমনি চটিয়া গেলেন যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে Agri-Horticultural Societyর সহকারী সভাপতির পদ হইতে অধঃকৃত করিলেন। এই সভা ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অবিচার পূর্ব্বক সরাইয়া দেওয়াতে বিরক্ত হইয়া মিষ্টর সিসিল বীডন উক্ত সভার সভাপদ পরিত্যাগ করেন। ইনিই পরে সার সিসিল বীডনরূপে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কেবল রাজনীতি বিষয়ে নহে, দেশের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে রামগোপাল উৎসাহদাতা ছিলেন। মহামতি হেয়ারের যে সুন্দর শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্ত্তিটি এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছে তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টাতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৪১ সালে, ১৭ই জুন কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের আহ্বানে মেডিকেল কালেজে এক সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মা হেয়ারের একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। সেই সভাতেই অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রামগোপাল উদ্যোগী হইয়া নিজের এক মাসের আয় দিয়া হেয়ারের শিষ্যবর্গকে এক এক মাসের আয় এই জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার দৃষ্টান্ত ও আগ্রহে হেয়ারের শিষ্যগণের অনেকেই এক এক মাসের আয় দিয়াছিলেন। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা হেয়ারের প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি প্রথমে সংস্কৃত কালেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কালেজগৃহ নির্ম্মিত হইলে তাহার প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল।

বৃদ্ধাবস্থাতে রামগোপাল বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া একান্তে বাস করিতেন। তখন আত্মীয় স্বজনকে ও স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে বিবিধপ্রকারে সহায়তা করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। তখনও স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। যৌবনকালে তিনি যে স্বাধীন-চিত্ততার ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, উত্তরকালে কিয়ৎপরিমাণে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিলেও তাহা তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। ১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একটি মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের নিকটে ঋণ স্বরূপ তাঁহার প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা পাওনা ছিল; তিনি সেই

সকল ঋণের সমুদয় কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলিয়া আপনার বন্ধুদিগকে অঋণী করিয়া গেলেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক

দুঃখের বিষয় ইঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও রামগোপাল ঘোষের পর ইনিই ডিরোজিও-দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বরং এরূপ শুনিয়াছি যে, একাডেমিকের বক্তৃতাদি যাঁহারা শুনিতে আসিতেন, তাঁহারা রামগোপালের উন্মাদিনী বক্তৃতা অপেক্ষা রসিকের গভীর চিন্তা ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা ভালবাসিতেন। রামতনু বাবুর মুখে সর্ব্বদা তাঁহার নাম শুনিতাম। তাঁহার সারাজীবনে যেন একদিনের জন্যও রসিক তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রসিক যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা গুরুবাক্যের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আমাদের ন্যায় নব্যদলের কোনও মত যদি রসিকের মতের বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহা কানে তুলিতেন না; বলিতেন, "তোমরা কি রসিকের চেয়ে ভাল বোঝ?" এই বাল্য-সুহৃদ অথচ গুরুতুল্য রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কথা যে পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম না, এজন্য দুঃখিত রহিলাম। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিতেছি।

অনুমান ১৮১০ সালে কলিকাতার সিন্দুরিয়া পটী নামক স্থানে রসিককৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক। নবকিশোর মল্লিকের সহরে সুতার কারবার ছিল। প্রাচীন কলিকাতার সুবিখ্যাত শেঠবংশীয়গণ এই তিলি জাতীয় বণিকদল ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং একথা বোধ হয় বলিতে পারা যায় যে, ইঁহারা কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন।

সেকালের রীতি অনুসারে রসিককৃষ্ণ কিছুদিন গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িয়া ও সামান্যরূপে ইংরাজী শিখিয়া হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। অল্পকাল মধ্যেই সেখানে বিদ্যা বুদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৮ সালে ডিরোজিও যখন হিন্দুকালেজে আসিলেন, রসিককৃষ্ণ বোধ হয় তখন হিন্দুকালেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন। তিনিও আকৃষ্ট হইয়া ডিরোজিও দলে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং অপর সকলের ন্যায় আত্মীয় স্বজনের হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিলেন।

এরূপ জনশ্রুতি, কালেজে পাঠকালে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটে। তৎকালে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে হইত। তামা তুলসী গঙ্গাজল আনিবার জন্য একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকাতাতে

আসিয়া তাহাকে যখন দেখিয়াছি, তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থা। ঐ উড়িয়া ব্রাহ্মণ একখানি তাম্রকুণ্ডে করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজল লইয়া সাক্ষীদের সম্মুখে আনিয়া ধরিত, তাহা স্পর্শ করিয়া হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। যখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয়া বালক রসিককৃষ্ণকে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলে উড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রথামত তাম্রকুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক বিষম সংকট উপস্থিত। রসিককৃষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে চাহিলেন না; স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আদালত সুদ্ধ লোক বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রসিক বলিলেন—"আমি গঙ্গা মানি না।" যখন ইণ্টারপ্রিটার উচ্চৈঃস্বরে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া জজকে শুনাইলেন—"I do not believe in the sacredness of the Ganges" তখন একেবারে চারিদিকে ইস্ ইস্ শব্দ উঠিয়া গেল; হিন্দু শ্রোতৃগণ কানে হাত দিলেন। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পড়িল। "মল্লিকদের বাটীর ছেলে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছে গঙ্গা মানি না; ঘোর কলি উপস্থিত, দেখ কালেজের শিক্ষার কি ফল!" সম্প্রতি কুমারী কলেটের লিখিত যে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত বাহির হইয়াছে, তাহাতে রামমোহন রায়ের একজন শিষ্যের বিষয়ে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। বালক রসিককৃষ্ণই বোধ হয় সেই শিষ্য। রসিককৃষ্ণের বিষয়ে এইরূপ গল্প লাহিড়ী মহাশয়ের ও ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়াছে। রসিককৃষ্ণের যে রামমোহন রায়ের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল তাহার প্রমাণও আছে। রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ সালে তাঁহার স্মরণার্থ কলিকাতাতে এক সভা হয়। তাহাতে বাঙ্গালী বক্তার মধ্যে তিনিই ছিলেন।

ডিরোজিও কালেজ ত্যাগ করার পরও তাঁহার শিষ্যদল সংস্কার কার্য্যে কিরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রসিকও যে সে বিষয়ে তাঁহার বন্ধুদের সঙ্গী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে বাড়ীর লোক ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রসিককৃষ্ণের জননী কোনও প্রকারে তাঁহার মতিগতি ফিরাইতে না পারিয়া, পাড়ার নির্ব্বোধ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের প্ররোচনায়, তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য, তাঁহাকে পাগলা-গুঁড়ো খাওয়াইলেন। হেয়ারের জীবনচরিতে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন এবং রসিককৃষ্ণের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মুখেও শুনিয়াছি যে, এই ঔষধ খাইয়া তিনি সমস্ত রাত্রে অচেতন হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে কাশীতে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। নৌকা প্রস্তুত, তাঁহার হাত পা দড়িতে বাঁধা। তিনি চেতনালাভ করিয়া কোনও প্রকারে আপনাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন

করিয়া চোরবাগানে এক বাসা করিলেন। সেই বাসা ডিরোজিওর দলের এক আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি তিনি সর্ব্বদা সেখানে যাইতেন। সেই বাটীতে হিন্দুসমাজের কেল্লা ভগ্ন করিবার সকল প্রকার পরামর্শ স্থির হইত। ইহারই পর বোধ হয়, দক্ষিণারঞ্জনের অর্থে ও উৎসাহে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক দ্বিভাষী পত্রিকা বাহির হয় এবং রসিকের প্রতি তাহার সম্পাদকতার ভার অর্পিত হয়।

রসিককৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু ঠিক কতদিন ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক ত্বরায় তাঁহার পদবৃদ্ধি হয়। ১৮৩৪ সালের পর যখন হিন্দু কালেজের কৃতবিদ্য যুবকগণকে ডেপুটী কালেক্টরী পদ দেওয়া হইতে লাগিল, তখন তিনিও ডেপুটী কালেক্টরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অনেক দিন বর্দ্ধমানে বাস করেন। এই কালের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মভীরুতার বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার হয়। এরূপ শুনিয়াছি বর্দ্ধমানের রাজসংসারের লোক অনেকবার তাঁহাকে উৎকোচাদি দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে স্বকর্ত্তব্য-সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রসিককৃষ্ণ ঘৃণাপূর্ব্বক সেই সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন; এবং ন্যায়বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইতেন না।

বর্দ্ধমানে বাসকালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা এই যে, সেই কালের মধ্যে কিছুদিন লাহিড়ী মহাশয় বর্দ্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়া-ছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিন দুই বন্ধুতে একত্র বাস করিতেন। লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাজ করিতেন না। তখন হইতেই রসিককৃষ্ণ তাঁহার guide, philosopher and friend-এর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণের ছবি সেই যে তাঁহার মনে মুদ্রিত হইয়া গেল, সারা জীবনে আর তাহা একদিনের জন্যও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

অনুমান ১৮৫৮ সালে রসিককৃষ্ণ পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোষ তাঁহাকে কামারহাটিস্থ স্বীয় বাগান-বাটিতে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুঃখের বিষয় সে রোগ হইতে রসিককৃষ্ণ আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে বন্ধুদ্বয় রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রকে স্বীয় বিষয় বিভবের এক্‌জিকিউটার ও পরিবারগণের রক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা সমুচিতরূপেই চিরদিন ঐ ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন; এবং সকল প্রকার আপদ বিপদে চিরদিন তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন।

শিবচন্দ্র দেব

এই সাধুপুরুষ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থিত কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল সেই গ্রামকে অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস, ইংরাজী স্কুল, বাঙ্গালা স্কুল, ডিস্‌পেন্সারি, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি কোন্নগরের উন্নতির যে কিছু চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সকলি ইঁহারই চেষ্টার ফল। ইঁহার কথা কোন্নগরের লোক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। ইঁহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত হইতে ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি।

১৮১১ সালে ২০ জুলাই কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্র দেবের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ব্রজকিশোর দেব কমিসরিয়েটে সরকারের কাজ করিতেন। ঐ কাজে তখন বিলক্ষণ আয় ছিল। সুতরাং ব্রজকিশোর দেব সেই সময়কার একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহুকাল সরকারী কাজ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পেন্‌শন্ লইয়া কার্য্য হইতে অবসৃত হন। সংসারের শৃঙ্খলা, সুবন্দোবস্ত ও সকল কার্য্যের সুনিয়মের জন্য তিনি গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একটি ঘড়ি নিকটে রাখিতেন এবং তদনুসারে সকল কাজ যথা সময়ে করিতেন। তাঁহার সমুদয় কাজ কর্ম্ম ধার্ম্মিক হিন্দুগৃহস্থের আদর্শ স্থানীয় ছিল।

শিবচন্দ্র ব্রজকিশোরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে তদানীন্তন রীতি অনুসারে গ্রাম্য পাঠশালাতে শিবচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহে বসিয়াই একজন আত্মীয়ের সাহায্যে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তৎপরে কিছুদিন গোলমালেই কাটিয়া যায়। সে সময়ের মধ্যে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে কেহই বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনেন; এবং ১৮২৫ সালের ১লা আগষ্ট দিবসে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে, তাঁহাকে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। হিন্দুকালেজে তিনি ছয় বৎসর পাঁচ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলভুক্ত হইয়া তাঁহার যৌবনসুহৃদগণের সহিত সম্মিলিত হন। সে বন্ধুতার স্মৃতি চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে লেখা ছিল। উত্তরকালে যখন তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ, তখনও তাঁহার নিকটে বসিলে সময়ে সময়ে দেখা যাইত যে, ডিরোজিওর সামান্য সামান্য উক্তিগুলি তাঁহার মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে, যেন কল্যকার ঘটনা।

কালেজে পাঠের সময়ে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতৃব্য হরিমোহন সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে; এবং সে সময়ে

উভয় বন্ধুতে মিলিয়া আরব্য উপন্যাস বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন।

কালেজ ছাড়িয়া তিনি কয়েক বৎসর প্রথমে জি. টি. সারভে আফিসে ৩০ টাকা বেতনে কম্পিউটারের কাজ করেন। তৎপরে ১৮৩৮ সালে ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হইয়া বালেশ্বরে গমন করেন। ১৮৪৪ সালে বালেশ্বর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিকটস্থ আলিপুরে চব্বিশ পরগণার ডেপুটি কালেক্টর হইয়া আসেন।

১৮৫৭ সালে যখন সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন শিবচন্দ্র বাবুকে অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সে সময়ে একদিন তিনি রেলগাড়িতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। সেই গাড়িতে কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মিউটিনীর কথা উপস্থিত হয়। তখন শিবচন্দ্র বাবু স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ ভদ্রলোকগুলি কলিকাতাতে পৌঁছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। এই সামান্য কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান।

ইহার পরে তিনি আরও অনেক পদে উন্নীত হইয়া দক্ষতার সহিত অনেক কার্য করিয়া ১৮৬৩ সালে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। অপরাপর লোকের পক্ষে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম-সুখ ভোগ করা; কিন্তু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পক্ষে তদ্বিপরীত ঘটিল। পেন্সন লইয়া কোন্নগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই স্বদেশের উন্নতি সাধনে তিনি মনোযোগী ছিলেন। মেদিনীপুরে বাস কালে সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতাতে বদলী হইয়াই স্বীয় বাসগ্রামের উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তৎপূর্ব্বে ১৮৫২ সালে গ্রামবাসিগণকে সমবেত করিয়া কোন্নগর হিতৈষিণী সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮৫৪ সালে তাঁহারই প্রযত্নে ও তাঁহার বন্ধুগণের সাহায্যে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে উক্তগ্রামে হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের সময়ের স্থাপিত একটি মডেল বাঙ্গালা স্কুল মাত্র ছিল। ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৫৬ সালে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলটি তুলিয়া দেন। কিন্তু গ্রামমধ্যে একটি বাঙ্গালা স্কুল থাকা আবশ্যক বোধে ১৮৫৮ সালে প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে আবার একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়।

স্কুল দুইটি স্থাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসিগণের ব্যবহারার্থ একটি সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তদনুসারে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতে ১৮৫৮ সালে একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল।

এখানেই তাঁহার শ্রমের বিরাম হইল না। হিন্দুকালেজে পাঠকালে তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বড়ই অনুভব করিয়াছিলেন; এবং ১৮২৬ সালে হুগলী জেলার গোপালনগরের বৈদ্যনাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হইলে তিনি স্বীয় বালিকা পত্নীকে বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতে আরম্ভ করেন। পৌঢ়াবস্থাতেও তাঁহার সে উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই। যখন যেখানে গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া আপনার কন্যাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা বেথুন কলিকাতাতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, দলপতিদিগের মহা আন্দোলন সত্ত্বেও তিনি আপনার এক কন্যাকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ যাঁহার উৎসাহ, তিনি যে স্বীয় বাসগ্রামের বালিকাগণের শিক্ষার উপায় বিধান না করিয়া স্থির থাকিবেন ইহা সম্ভব নহে। ১৮৫৮ সালে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি বালিকাস্কুলের গৃহনির্ম্মাণার্থ পাঁচ শত টাকা দেন, তাহা হইলে তিনি নিজে আর পাঁচ শত টাকা দিতে পারেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫ টাকা দিলে তিনি ১৫ টাকা চাঁদা তুলিতে পারেন। অনেক লেখালেখির পরে গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

শিবচন্দ্র বাবু তাহাতে নিরুদ্যম না হইয়া, স্বীয় চেষ্টায়, স্বীয় অর্থে, স্বীয় ভবনে ১৮৬০ সালে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; কিছু দিন পরে তাঁহারই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে, তাঁহারই ব্যয়ে ঐ বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মিত হইল। তাহাতে বালিকা-বিদ্যালয় উঠিয়া গেল এবং এখনও সেইখানে আছে।

কেবল তাহা নহে, ১৮৬২ সালে তিনি শিক্ষিতা নারীদিগের ব্যবহারার্থ "শিশুপালন" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলেন। পরে ১৮৬৭ সালে "অধ্যাত্মবিজ্ঞান" নামে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অগ্রে কোন্নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশন ছিল না। কোন্নগরবাসীদিগের হয় বালি ষ্টেশনে, না হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়া গাড়িতে উঠিতে হইত; তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার মানসে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকটে কোন্নগরে একটি ষ্টেশন করিবার জন্য আবেদন করেন। ঐ আবেদনের ফলস্বরূপ ১৮৫৬ সালে কোন্নগর ষ্টেশন খোলা হয়।

তাঁহারই আবেদন অনুসারে ১৮৫৮ সালে কোন্নগরে একটি ডাকঘর স্থাপিত হয়।

কোন্নগরে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দিলে, তাঁহারই প্রযত্নে গবর্ণমেণ্ট একটি চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারি স্থাপন করেন। তিনি সেজন্য একটি বাড়ী

ডিস্‌পেন্সারির ব্যবহারার্থ বিনা ভাড়াতে দেন। ঐ ডিস্‌পেন্সারির দ্বারা কোন্নগরের লোকের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, ১৮৮১ সালে গবর্ণমেণ্ট ঐ ঔষধালয়টি তুলিয়া দেন। ১৮৮৩ সালে শিবচন্দ্র বাবু নিজের ব্যয়ে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। উহা হইতে প্রতিদিন প্রাতে দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইত। এই কার্য্যটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যৌবনকালে যখন তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলভুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার প্রাচীনধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, এবং তিনি অন্তরে অন্তরে একেশ্বর-বাদী হন। কিন্তু বহুবৎসর কর্ম্মসূত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়ে সে অন্তরের বিশ্বাস অন্তরেই থাকে; তদনুসারে কার্য্য করিবার বিশেষ সুবিধা পান নাই। পরে ১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ইহাকে বলশালী করিয়া তোলেন এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতার অধীনে যোগ্যতাসহকারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদিত হইতে থাকে, তখন ১৮৪৪ সালে, তিনি উক্ত পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি বালেশ্বর হইতে বদলী হইয়া মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি ৮১৪৬ সালে মেদিনীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; এবং উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুরে যখন চব্বিশ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে পরিগণিত হন। কেবল তাহা নহে; আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে ঐ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন; এবং ঈশ্বর প্রসাদে সে চেষ্টাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ সালে রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া যখন স্বীয় বাসগ্রামে বাস করিলেন, তখন সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমাজ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৬৬ সালে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তিনি ঐ দলের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। বহুবৎসর ইহার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে পুত্রের বিবাহ দেওয়াতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও তাঁহার স্বগ্রামবাসী বন্ধুগ

তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্যও দুঃখিত ছিলেন না বা একদিনের জন্য গ্রামবাসীদিগের হিতেচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সমভাবে সকলের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিতে সহায় হইবার চেষ্টা করিতেন।

জীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। এখানেই ১৮৯০ সালের ১২ই নবেম্বর বুধবার মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এরূপ সাধুপুরুষের অবসানকাল যেরূপ হয় শিবচন্দ্র দেবের অবসানকাল সেইরূপই হইয়াছিল। ভাঁটার জল যেমন অল্পে অল্পে নামিয়া যায়, তাঁহার জীবননদীর জল যেন তেমনি অল্পে অল্পে কমিয়া গেল। জীবনের সঙ্গিনী সহধর্ম্মিনীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, পুত্র কন্যা দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেশহিতকর নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে শান্তিতে শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে সদাশয়তা, মিতাচারিতা, পরহিতৈষণা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মভীরুতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। সত্য সত্যই ডিরোজিওবৃক্ষের এই ফলটি অতি মধুর হইয়াছিল।

হরচন্দ্র ঘোষ

ইনি কলিকাতার ছোট আদালতের সুবিখ্যাত জজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত; ইনিও ডিরোজিও-বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদগণের মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি। অনুমান ১৮০৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশব কাল হইতেই ইঁহার জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোন্নতির ইচ্ছা অতিশয় বলবতী দৃষ্ট হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে সন্তানদিগকে পারসী শিখাইবার রীতি ছিল। ইংরাজী শিক্ষার দিকে কেহ বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। কিন্তু বালক হরচন্দ্র কেবল পারসী শিখিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া ইংরাজী শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এরূপ শোনা যায়, নিজের ব্যগ্রতা ও চেষ্টার গুণে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। হিন্দু-কালেজের যে সকল বালক ডিরোজিওর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীভুক্ত হন, হরচন্দ্র ঘোষ তন্মধ্যে একজন প্রধান। চিরদিনই তাঁহার প্রকৃতিতে এক প্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। তিনি ডিরোজিওর শিক্ষার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপরাপর বন্ধুদিগের ন্যায় ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই।

একাডেমিক এসোসিয়েশন্ স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; এবং উক্ত সভাতে বক্তৃতাদি করিতেন। এরূপ শোনা যায়, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক মহোদয়

তাঁহাকে নিজের সঙ্গে পশ্চিমে লইয়া যাইতে চাহিলেন। হরচন্দ্র কেবল স্বীয় জননীর প্রতিকূলতা বশতঃ সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে যাইতে না পারিলেও উক্ত মহামতি রাজপুরুষের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হন নাই। ১৮৩২ সালে যখন এদেশীয়দিগের জন্য মুন্সেফী পদের সৃষ্টি হইল, তখন গবর্ণর জেনেরাল হরচন্দ্রকে বাঁকুড়ার মুন্সেফ নিযুক্ত করিলেন। তিনি বাঁকুড়াতে পদার্পণ করিবামাত্র লোকে বুঝিতে পারিল যে, একজন উন্নতচেতা, সত্যপ্রিয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ আসিয়াছেন। হরচন্দ্র আদালতের চেহারা, হাওয়া ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। রীতিমত ১০টা ৫টা কাছারি আরম্ভ হইল; হরচন্দ্র স্বহস্তে সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লাগিলেন; সর্ব্বসমক্ষে আপনার রায় লিখিতে ও ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বিচারকার্য্যের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা জন্মিল। সে সময়ে লোকে উৎকোচগ্রহণকে পাপ বলিয়াই মনে করিত না। কিন্তু হরচন্দ্র ঘোষ এমনি ধর্ম্মপরায়ণতার সহিত বিচারকার্য্য করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়াছি তাঁহার এক শত টাকা বেতনে কুলাইত না বলিয়া কলিকাতা হইতে তাঁহার খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা লইতে হইত।

বাঁকুড়া বাসকালে কেবল যে তিনি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন তাহা নহে ডিরোজিও মণ্ডলী হইতে তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ভিন্ন এদেশের দুর্গতি দূর হইবার উপায়ান্তর নাই। তাই নিজ কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াই সেই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজ ব্যয়ে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া সেখানে বালকদিগকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। আবার নিজ জ্ঞানের উন্নতিসাধনেও মনোযোগী রহিলেন।

এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি সদর আমীনের পদে উন্নীত হইলেন। বাঁকুড়াতে সুখ্যাতির সহিত ছয় বৎসর কার্য্য করিয়া হরচন্দ্র ১৮৩৮ সালে হুগলীতে বদলী হন। ১৮৪৪ সালে প্রিন্সিপাল সদর আমীন হইয়া ২৪ পরগণাতে আসেন। ১৮৫২ সালে তিনি কলিকাতা পুলিস-কোর্টে জুনিয়ার মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালে কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হন।

কিন্তু তিনি অপর লোকের ন্যায় কেবল আপনার পদবৃদ্ধি ও অর্থাগম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। কলিকাতাতে অবস্থান কালে তিনি দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়তা করিতেন। মহাত্মা বেথুন যখন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার কমিটীভুক্ত হইয়া বিশেষরূপে সহায়তা করেন। মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হয়, তখন তিনিই ঐ কমিটীর সম্পাদক হইয়া সে কার্য্য সমাধা করেন।

প্রতিভাশালী ও জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিদিগকে সহায়তা করিতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। হিন্দুপেট্রিয়টের সুবিখ্যাত সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালকে তিনি এক সময়ে পুত্র-নির্ব্বিশেষে সহায়তা করিয়াছিলেন। অপরাপর অনেক দরিদ্র সন্তানকে তিনি অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা পালন করিতেন।

১৮৬৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর রমাপ্রসাদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে, দেশীয় ও বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকের উপরই যেন একটা শোকের ছায়া পড়িল। ১৮৬৯ সালে ৪ঠা জানুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে তাঁহার স্মরণার্থ এক সভা হয়। ঐ সভাতে নিযুক্ত কমিটীর চেষ্টাতে অর্থ সংগৃহীত হইয়া তাঁহার এক মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাহা ১৮৭৬ সালে কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বারে স্থাপিত হয়। এখনও উহা আদালত গৃহকে সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪ সালে কলিকাতাতে প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। তৎকাল-প্রসিদ্ধ রীতি অনুসারে কিছুদিন গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়াইয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে পারস্য ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সে বন্দোবস্ত রহিত হইল। আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে ইঁহাকে হিন্দুকালেজে দেওয়াই স্থির হইল। তদনুসারে ১৮২৯ সালে ইনি হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে সমুদয় পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদের অন্তরে জনহিতৈষণা স্বভাবতঃ এরূপ প্রবল ছিল যে, নিজে ইংরাজী শিখিতে শিখিতে নিজ পল্লীর অপরাপর বালকদিগকে সেই বিদ্যাবিতরণের বাসনা প্রবল হইল। তদনুসারে স্বভবনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া পল্লীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিদ্যালয় কত দিন ছিল বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ শুনিয়াছি যে, প্রথম প্রথম তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব ইহাতে শিক্ষকতা করিতেন এবং মহাত্মা ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও ইহার পরিদর্শক ছিলেন।

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৩৫ সালে তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটী লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরেই এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই লাইব্রেরী কিছুদিন এসপ্লানেডে ষ্ট্রং নামক একজন ইংরাজের ভবনে থাকে। তৎপরে কিছুদিনের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের বাটীতে উঠিয়া যায়। তৎপরে সার চার্লস মেটকাফের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান মেটকাফ হল নির্ম্মিত হইলে ১৮৪৪ সালে সেই হলে উঠিয়া আসে। ডেপুটী লাইব্রেরিয়ানের পদ হইতে প্যারীচাঁদ নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা

প্রভৃতির গুণে একাদিক্রমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি ও কিউরেটারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং ঐ পদেই চিরদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

অন্য লোক হইলে কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনের জন্য এ পদকে ব্যবহার করিত; কিন্তু প্যারীচাঁদ লাইব্রেরিটি হাতে পাইয়া আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং নানা বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। বালক কাল হইতেই তাঁহার যেমন জ্ঞানলাভ-স্পৃহা ছিল, তেমনি জ্ঞানবিতরণ-স্পৃহাও ছিল, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার সেই জ্ঞান-বিতরণ-স্পৃহা এখনও বলবতী দৃষ্ট হইল। তিনি একদিকে যেমন জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, অপরদিকে সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহিত মিলিয়া "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। তৎপরে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি একত্র হইয়া যখন "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন, সে সময়ে তিনি তাহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বেঙ্গল হরকরা, ইংলিসম্যান, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতিতে সর্ব্বদা লিখিতেন।

কিন্তু একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য বঙ্গসাহিত্যে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। একদিকে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপরদিকে খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষা যখন নবজীবন লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃত-বহুল হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত-ভাষানুরাগী লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন তাহা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট, ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে পাঁচজন ইংরাজী-শিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একত্র বসিলেই এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরের' ন্যায় পত্রেও সেই উপহাস বিদ্রূপ প্রকাশিত হইত। অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া, "জিগীষা" "জিজীবিষা", প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম "জিগীষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিট্‌টীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবুর সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালার ভার দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল, তখন ১৮৫৭ কি ৫৮ সালে, "মাসিক পত্রিকা" নামে এক ক্ষুদ্রকায়া পত্রিকা দেখা দিল। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা লোকপ্রচলিত সহজ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত। স্ত্রীলোকে বালকে যেন বুঝিতে পারে

এই লক্ষ্য রাখিয়া লেখকগণ লিখিতেন। এই জন্ত মাসিক পত্রিকা পড়িতে সকলে এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিত। কখন পত্রিকা আসে তজ্জন্ত উৎসুক হইয়া থাকিত। ইহারই কিছুদিন পরে টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইল। প্যারীচাঁদ মিত্রই এই টেকচাঁদ ঠাকুর। আলালের ঘরের দুলাল একখানি উপন্যাস। কুমার-খালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত "বিজয়বসন্ত" ও টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস। তন্মধ্যে বিজয়বসন্ত তৎকাল-প্রচলিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালাতে লিখিত। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল, বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম 'আলালী ভাষা' হইল। তখন আমরা কোনও লোকের ভাষাকে গাম্ভীর্য্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম। এই আলালী ভাষায় উৎকৃষ্ট নমুনা "হুতমের নক্সা।" যাঁহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়া দেখিবেন তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল। এজন্য আমার পূজ্যপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ সম্পাদক, খ্যাতনামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশে কতই শোক করিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় ভালই হইয়াছে; জীবন্ত মানুষ ও ভাষা যত কাছাকাছি থাকে ততই ভাল।

যাহা হউক প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে এই যুগান্তর আনয়ন করিলেন। তৎপরে তিনি "অভেদী", "যৎকিঞ্চিৎ", "বামাতোষিণী", "রামারঞ্জিকা", "আধ্যাত্মিকতা" প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে কিন্তু আলালী ভাষা ব্যবহার করেন নাই, বরং বঙ্কিমী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল বঙ্গসাহিত্যেই প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র উভয়ে তৎসমকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী লেখা সম্বন্ধে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইহা অগ্রেই বলিয়াছি প্যারীচাঁদ প্রথমে তাঁহার বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রামগোপাল ঘোষের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রচারিত "জ্ঞানান্বেষণ" নামক দ্বিভাষী পত্রিকাতে লিখিতেন; তদ্ভিন্ন ইংলিসম্যান, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি ইংরাজ সম্পাদিত পত্রিকাতেও সর্ব্বদা লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজীতে মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত, রামকমল সেনের জীবনচরিত ও গ্রাণ্ট সাহেবের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহাতে যেমন সাহিত্যানুরাগ তেমনি বিষয়কর্ম্মে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে লাইব্রেরিয়ানের কর্ম্ম করিতেন, অপরদিকে তাহার বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত সম্মিলিত,

হইয়া বিবর বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতেন। এই কারবারে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইলে, তিনি আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবার করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কারবারে তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কলিকাতা বণিক-সমাজের এমনি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানির ডাইরেক্টার পদে বৃত হইয়াছিলেন।

একদিকে যেমন বৈষয়িক উন্নতি, অপরদিকে তেমনি স্বদেশের হিতসাধনে মনোযোগ। যৌবনে বাল্যসুহৃদ রামগোপাল, রামতনু প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া "সাধারণ জ্ঞানার্জ্জন সভার" সভ্যরূপে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থাতেও সোসিয়াল সায়েন্স এসোসিয়েশন, এগ্রি-হর্টিকালচারল সোসাইটী, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী, স্কুলবুক সোসাইটী, পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারণী সভা প্রভৃতি বহু সভা সমিতির সভ্য ছিলেন। কেবল যে নাম মাত্র সভ্য ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সভ্য থাকার অর্থ ছিল সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা। আমরা অনেক সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতাম, কিরূপে তিনি এত সভাতে যোগ দিয়া হৃদয় মনের সহিত সকলেরই উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে পারেন।

১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। এই পদে দুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কায়মনে স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরলোক হইলে তিনি অনেকটা সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া পড়েন; এবং প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার এই স্বভাব ছিল যে, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন তাহার আধখানা জানিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। যখন প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ভূরি ভূরি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার বাল্যসুহৃদ ও তাঁহার বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেব মহাশয় তাহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দুই বৈবাহিকে মিলিয়া সর্ব্বদা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তাঁহারা উভয়ে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট যখন এদেশে আসিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের স্থাপিত থিওসোফিকাল সোসাইটীতে যোগ দিলেন এবং উক্ত সভার বঙ্গদেশীয় শাখার প্রধান পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সকল প্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাতে তাঁহার বালকের ন্যায় উৎসাহ দেখিতাম। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চাতে সর্ব্বদা

উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার কাছে বসিলে অনেক জ্ঞানলাভ করা যাইত।

এইরূপে জ্ঞানালোচনা, সৎসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গে তাঁহার কাল এক প্রকার সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ সালে দারুণ উদরী রোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ রোগে কিছুদিন কষ্ট পাইয়া ঐ সালের ২৭শে নবেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া এক সভা করিয়া, তাঁহার দুই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। মেটকাফ হলে তাঁহার এক ছবি আছে এবং কলিকাতার টাউন হলে এক প্রস্তর-নির্মিত উত্তমাঙ্গ আছে।

রাধানাথ শিকদার

ইনিও ডিরোজিও-বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে কলিকাতা জোড়াশাঁকোর অন্তঃপাতী শিকদার-পাড়া নামক স্থানে রাধানাথের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। ইঁনি ভিন্ন তিতুরামের আর এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। রাধানাথ সকলের বড়। এই শিকদারগণ ব্রাহ্মণ-বংশ সম্ভূত এবং কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী। মুসলমান নবাবদিগের সময় ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশ-পরম্পরাক্রমে শিকদার বা পুলিশ কমিশনরের কাজ করিতেন। ইঁহাদের অধীনে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, পাইক ও সৈনিক প্রভৃতি থাকিত। ইঁহারা দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিতে, কয়েদ করিতে ও সাজা দিতে পারিতেন। অনেক স্থলে এই শক্তির অপব্যবহার হইত এবং যাহা লোকের রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা লোকের পীড়নের জন্য ব্যবহৃত হইত। এমন কি এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কলিকাতা ইংরাজদিগের অধিকৃত হওয়ার পরেও যখন ফৌজদারী কার্য্যের ভার মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে ছিল, তখনও ইঁহারা শিকদারের কাজ করিতেন। পরে কোনও এক বিশেষ স্থলে একজনের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন হওয়াতে সে দিকে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং সেই আন্দোলনে ইঁহাদের হস্ত হইতে শক্তি অপহৃত হয়।

রাধানাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা বা তাঁহার বংশের কেহ শিকদারের কাজ করিতেন না। তিতুরাম আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথকে কিছুদিন পাঠশালে ও ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে পড়াইয়া হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮২৪ সালে তিনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন এবং সাতবৎসর দশমাস কাল তথায় অধ্যয়ন করেন। ইঁহার একটি উৎকৃষ্ট অভ্যাস ছিল; দৈনিক লিপি লিখিতেন।

তাহা হইতে সে সময়কার অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীনাথ শিকদার রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহপাঠী ও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত লাহিড়ী মহাশয় সর্ব্বদা ইঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন, তখন রাধানাথের জননী পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে যত্ন করিতেন। সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও সদাশয়তার স্মৃতি চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের মনে মুদ্রিত ছিল।

রাধানাথ যে শ্রেণীতেই উন্নীত হইতেন সেই শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য বালকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াই রাধানাথ তৎকালের রীতি অনুসারে ষোল টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সমুদয় শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণিতের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। সে সময়ে ডাক্তার টাইট্‌লার (Dr. Tytler) নামে হিন্দু কালেজে একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। এই ডাক্তার টাইট্‌লার সে সময়কার উৎকেন্দ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডাক্তার টাইট্‌লারের সহিত বিচার বলিয়া যে সকল বিচার দৃষ্ট হয় তাহা বোধ হয় ইঁহারই সঙ্গে ঘটিয়াছিল। ইঁহার বিষয়ে এইরূপ শোনা যায় যে, ইনি সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতে ও শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বালকেরা তাহা জানিত এবং যে বালক যে দিন পড়া প্রস্তুত করিয়া না আসিত সে সেদিন ডাক্তার টাইট্‌লারকে প্রবঞ্চনা করিবার এক উপায় বাহির করিত। তাঁহাকে শুনাইয়া কোনও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিত। অমনি ডাক্তার টাইট্‌লার তন্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"কি, কি, আবার বল, সমগ্র কবিতাটা বল।" এইরূপে কবিতা শুনিতে ও তাহার অর্থ বুঝিতে সময়টা কাটিয়া যাইত, বালক নিষ্কৃতি লাভ করিত। সহরে এরূপে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি নাকি একবার নিজের পুত্রের ছাগলের গাড়ি চাড়িয়া গড়ের মাঠে বাহির হইয়াছিলেন।

ডাক্তার টাইট্‌লার একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। গণিত বিদ্যার তাঁহার মত সুপণ্ডিত লোক তখন কলিকাতাতে ছিল না। রাধানাথ টাইটলারের নিকটে গণিত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে নিউটন-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' পড়িয়াছিলেন।

ডিরোজিও যখন একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপন করিলেন, তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় রাধানাথও তাহাতে যোগ দিলেন; এবং ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহে যে প্রকার বল, মনে সেইরূপ সাহস ছিল। তিনি বাক্যে যাহা বলিতেন কার্য্যেও সেই প্রকার করিতেন; কাহাকেও ভয় বা কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। তিনি যে স্বীয় হৃদয়স্থিত বিশ্বাসানুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, কেহই

তাঁহাকে দেশীয় রীতি অনুসারে একটি অল্পবয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত করিতে পারে নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের মুখে শুনিতে পাই, তিনি মাতৃভক্তির জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও জননীর সন্নিধানে আসলে শিশুর মত হইয়া যাইতেন। অথচ মাতার অনুরোধেও নিজের হৃদয়স্থিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অনুসারে একটি আট বা দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।

রাধানাথ যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন, অর্থাৎ ১৮৩২ সালে, জি. টি. সারভে আফিসে একটি ৩০, টাকা বেতনে কম্পিউটারের কর্ম্ম পান। পরিবারের ব্যয়নির্ব্বাহ বিষয়ে পিতার সাহায্যার্থ তাঁহাকে এই কর্ম্ম লইতে হইয়াছিল। ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার মনে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল সংস্কৃত ভাষাতে অনুবাদিত করিবার বাসনা প্রবল হয়। তদনুসারে মনোযোগের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হয়। সেখানে তিনি বহুবৎসর বাস করিয়া নানাস্থানে কাজ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার তেজস্বিতা, আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি দেখিয়া ইংরাজগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন; এবং সমকক্ষের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে মিশিতেন।

এই কালের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। একবার তিনি সারভে কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া দেরাদুনে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন সংবাদ আসিল যে, উক্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ভান্সিটার্ট (Mr. Vansittart) মহোদয় তাঁহার সারভে আফিসের কতকগুলি কুলীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া কোন কোনও দ্রব্য বহন করাইয়া লইবার আদেশ করিয়াছেন। এই সংবাদে রাধানাথ বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের কুলীর প্রয়োজন হইয়া থাকিলে তাঁহাকে লিখিতে পারিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ হয় কালা মানুষ বলিয়া পত্র লেখা উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। তিনি বাহির হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের জিনিস পত্র সহিত স্বীয় কুলীদিগকে নিজের আফিসের প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন; এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের আরদালীদিগকে বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানা ভিন্ন আমার কুলী দিব না।" এই কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি রাগিয়া আগুন হইলেন; এবং রাজকার্য্যের অবরোধ এই দোষ দিয়া তাঁহার নামে নালিস করিলেন। আর একজন সিবিলিয়ানের কাছে বিচার হইল। অনেকে রাধানাথকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমা চাহিতে পরামর্শ দিলেন; তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। সিবিলিয়ানের বিচারে তাঁহার ২০০ দুই শত টাকা জরিমানা হইল। তিনি গ্রাহ্যই করিলেন

না; দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড দিলেন। কিন্তু ইহাতে যে আন্দোলন উঠিল তাহাতে বলপূর্ব্বক গরীব কুলীদিগকে শ্রম-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবার রীতি রহিত হইয়া গেল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালের মধ্যে তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়া তিনি ৬০০ শত টাকা বেতনে সর্ব্বপ্রধান কম্পিউটারের পদে আরোহণ করেন। কেবল তাহা নহে; সারভে সংক্রান্ত গণিতে তিনি এমনি পারদর্শী ছিলেন যে, কর্ণেল থুলিয়ার সারভে বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান গণনা তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৫৩ সালে তাঁহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি পেন্সন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তখন তাঁহার আচার ব্যবহার অনেকটা ইংরাজের মত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজী ধরনে থাকিতে ও খাইতে ভালবাসিতেন। এমন কি তাঁহার বাঙ্গালার উচ্চারণও বদলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার উৎসাহ ও আত্মোন্নতি-বাসনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষায় চর্চ্চাতে নিযুক্ত হইলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি তৎপদানুযায়ী লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যেরূপ পরিচ্ছদ পরাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন 'যে ভাষা স্ত্রীলোক বুঝিবে না, তাহা আবার বাঙ্গালা কি?' এই ভাবটা তাঁহার মনকে এমনি অধিকার করিল যে, তিনি বাল্যবন্ধু পরম সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্রকে সরল সহজ বাঙ্গালা লিখিবার জন্য প্ররোচনা দিতে লাগিলেন। উভয়ের সম্পাদকতাতে "মাসিক পত্রিকা" নামক পত্রিকা বাহির হইল; এবং অল্পদিন পরে প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" নামক উপন্যাস প্রচার করিলেন।

সরল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গালা লেখা রাধানাথের একটা বাতিকের মত হইয়া উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রিকাতে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন কিনা। শুনিতে পাওয়া যায় একদিন রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই প্যারীচাঁদ মিত্রের গৃহের দ্বারে গিয়া ডাকাডাকি,—"প্যারি, প্যারি! উঠ উঠ, এবারকার পত্রিকা পড়িয়া তোমার স্ত্রী কি বলিলেন?"

তিনি অতিশয় সহৃদয় ও স্বগণ-বৎসল লোক ছিলেন। নিজে দারপরিগ্রহ করেন নাই; ঘরে শিশু-সন্তানের মুখ দেখার সুখ হয় নাই; কিন্তু শিশুদিগকে বড় ভালবাসিতেন; আত্মীয় স্বজনের বালক বালিকাদিগকে লইয়া নিজের নিকটে রাখিতেন; তাহাদের সহিত গল্প করিতে ও খেলা করিতে ভালবাসিতেন।

জীবনের শেষদশাতে তিনি চন্দননগর গোঁদলপাড়াতে গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাটী ক্রয় করিয়া সেখানে অবস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে ১৮৭০ সালের ১৭ই মে দিবসে তাঁহার দেহান্ত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা-কাল

১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই ঐ কালেজে এক নিম্নতন শিক্ষকের কর্ম্ম পাইলেন। সে পদের বেতন ৩০৲ টাকার অধিক ছিল না। সেই বেতনেই তিনি নিজের ও ভ্রাতৃদ্বয়ের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে, এই কর্ম্ম লইয়া বসিবামাত্র তাঁহার বাসা নিরাশ্রয় ও আশ্রয়ার্থী ব্যক্তিগণের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ উদারতা ও অমায়িকতা গুণে কাহাকেও "না" বলিতে পারিতেন না। এইরূপে সর্ব্বদাই দুই একজন লোক আসিয়া তাঁহার ভবনে আশ্রয় লইয়া থাকিত। এই সময়ের আশ্রয়ার্থীদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি উত্তরকালে দেশের মধ্যে একজন মান্য গণ্য লোক হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার। ইনি হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রিণ্টার ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতারূপে যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রথম শর্ম্মা-সরকার মহাশয় খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে তাঁহার পিতার বন্ধু চার্লস্ রীড নামক এক ইংরাজের অধীনে দশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। যে কারণে ও যে ভাবে তিনি সে কর্ম্ম ছাড়িয়া রামতনু বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্যামাচরণ সরকারের জীবনবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"পূর্ণিয়া নিবাসী মণিলাল খোট্টা নামক তাঁহার (সাহেবের) একজন খাজাঞ্চী ছিল। তাঁহার স্বভাবগত কোনও দোষ দৃষ্টে কার্য্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মণিলাল তাঁহার প্রাপ্য বেতনাদি লইয়া রীড সাহেবের নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রীড সাহেব স্বপক্ষ সমর্থন জন্ম শ্যামাচরণ বাবুকে সাক্ষী মানিলে, কি জানি সাহেবের অনুরোধে পাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে তাঁহার তৎকালীন ১০৲ টাকা বেতনের দুর্লভ চাকরিটি ধর্ম্মের অনুরোধে অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া

তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু এবং হিন্দুকালেজের সুবিখ্যাত ছাত্র রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ন্যায়পরায়ণ রামতনু বাবু তৎশ্রবণে আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে নিজ প্রবাস গৃহে রাখিয়া সহোদর নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।"

"যখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। রামগোপাল বাবু যত্ন চেষ্টা করিয়া জোসেফ কোম্পানির অফিসের অধ্যক্ষ জোসেফ সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি তৎপরে ক্যাল্‌সেল সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দী পড়াইবার সময়েই তাঁহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজী না জানিলে বিষয় কার্য্য লাভ করা দুষ্কর, তজ্জন্য যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর তখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন

পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তিতে আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের সদাশয়তার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি! তিনি ৩০৲ টাকা বেতন হইতে নিজের ও ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এবং দেশে পিতামাতার পারিবারিক ব্যয়ের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের জন্য দ্বার উন্মুখ রাখিতেন। কেবল আশ্রয় দান নহে, তাহাদিগকে পড়াইবার ভার লইয়া তাহাদের ভাবী-জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বলিখিত জীবন-চরিতে উল্লেখ দেখিতে পাই যে, তিনিও ইহার কয়েক বৎসর পরে, নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কালেজে পড়িবার অভিপ্রায়ে আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেওয়ানজী একস্থানে বলিতেছেন, "কলিকাতায় আমি কালীর (রামতনু বাবুর কনিষ্ঠ কালীচরণ লাহিড়ী) আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম। নূতন বান্ধবগণের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয়ের মিত্রতা লাভে বড়ই সুখী হইলাম। ঠনঠনিয়ার একটি বৃহৎ বাটীর কোনও অংশে রামতনু বাবু থাকিতেন, কোনও অংশে মদন তাঁহার দুই পিতৃব্যের সহিত অবস্থান করিতেন। আমি রামতনু বাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে কালীর সহিত একত্রে থাকিতাম।"

এইরূপে আত্মীয় স্বজনে বেষ্টিত হইয়া রামতনু বাবু তাঁহার প্রবাসভবনে বাস করিতেন। কিন্তু শুনিয়াছি তাঁহাদিগকে অতি ক্লেশে থাকিতে হইত। সকলকে পালা করিয়া স্বহস্তে হাট-বাজার করা, জলতোলা, বাটনা কুটনা, রন্ধন প্রভৃতি সমুদয় করিতে হইত। এরূপও শুনিয়াছি যে, এত কষ্ট সহিতে না

পারিয়া শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় একটু অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলেই চলিয়া যান; এবং দেওয়ানজী যে অল্পদিন ছিলেন তাহাতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; এবং তাঁহাকে মেডিকেল কালেজ ছাড়িতে বাধ্য হইতে হয়। দেশে গিয়া এক মাস সাবধানে থাকিয়া তবে তাঁহার শরীর সারে।

যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতেন তাঁহাদের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের স্নেহ যত্নের পরিসীমা ছিল না। কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে বন্ধুবান্ধবকে একটি ঘটনার কথা সর্ব্বদা বলিতেন এবং বলিবার সময়ে তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একবার পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে কালীচরণ বাবুর চক্ষে এক প্রকার পীড়া হয়, সে জন্য তাঁহাকে চক্ষুর্দ্বয় ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষা সন্নিকট, অথচ পড়িতে নিষেধ, এই সঙ্কটে ভ্রাতৃবৎসল রামতনু বাবু এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রতিদিন কালেজ হইতে পড়াইয়া আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কালীচরণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পাঠ্য সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন; ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এইরূপে কালীচরণ বাবু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময়ের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব চন্দ্রের যশোহর গমন। কেশব জজের সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইয়া আলিপুর হইতে যশোহরে গমন করেন। ঠিক কোন্ সালে যশোহর গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না; কিন্তু সেখানে গিয়া অধিক দিন সুখে যাপন করিতে পারেন নাই। এরূপ শোনা যায়, তিনি সেখানে গিয়া অল্পদিন পরেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া নিজের কার্য্যের সাহায্যার্থ রাধাবিলাসকে যশোহরে লইয়া যান। ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালে যশোহরে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রথম দেখা দেয়। অতএব তিনি ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ সালে সেখানে গিয়া থাকিবেন।

যশোহরে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রথম প্রাদুর্ভাবের ইতিবৃত্ত এই যে, ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালের শীতকালে পাঁচ শত কি সাত শত কয়েদী যশোহরের সন্নিকটে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ঐ রাস্তাটি যশোহর হইতে মহম্মদপুর দিয়া ঢাকার অভিমুখে যাইবে এইরূপ স্থির ছিল। মহম্মদপুরে নদীর অপর পারের কাজ শেষ হইলে, পর বৎসর জানুয়ারি মাসে কয়েদীগণ নদী পার হইয়া মহম্মদপুরের পারে কাজ আরম্ভ করিল। তাহারা রামসাগর ও হরেকৃষ্ণপুরের মধ্যস্থিত রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে, এমন সময়ে মার্চ্চ মাসে হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জ্বর দেখা দিল; এবং অল্পদিনেই প্রায় দেড়শত মজুরের মৃত্যু হইল। যাহারা মজুর খাটাইতেছিল তাহারা প্রাণ ভয়ে কাজ ছাড়িয়া পলাইল;

রাস্তা জির্ণাণ পড়িয়া রহিল। ঐ জ্বর ক্রমে মহম্মদপুর নগরে ও যশোহরে প্রবেশ করিয়া সহর নিঃশেষ করিতে লাগিল। এই জ্বরই কয়েক বৎসরের মধ্যে নদীয়া জেলাতে প্রবেশ করিয়া উলা (বীরনগর) গ্রামকে উৎসন্ন করিয়া দিল। পরে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতিকে উৎসন্ন করিয়াছে।

এই ম্যালেরিয়া জ্বরে অগ্রে রাধাবিলাসের প্রাণ গেল; পরে কেশবচন্দ্রও তাহাতে আক্রান্ত হইলেন। তিনি সেরেস্তাদারি কর্ম্ম পাইয়াই পৈতৃক বাসভবনের শ্রীবৃদ্ধি ও পিতামাতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সংকল্প সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ভবধাম পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি অনেক দিন জ্বরে ভুগিয়া অনুমান ১৮৪১ কি ১৮৪৩ সালে পরলোক গমন করেন।

কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় যখন এই সকল পারিবারিক ঘটনার মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিলেন, তখন নানা কারণের সমাবেশ হইয়া সমগ্র বঙ্গ-সমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতেছিল। এই কালকে ইংরাজী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠা কাল বলা যাইতে পারে। কথা উঠিয়াছিল এদেশীয়দিগকে কোন্ রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য? এই প্রশ্ন লইয়া কমিটী অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্‌শনের সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। উভয়দলেই প্রায় সম-সংখ্যক ব্যক্তি, সুতরাং কোন মতই নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় না; কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচ্যশিক্ষা পক্ষপাতীদিগের পরামর্শানুসারে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত কালেজে ও মাদ্রাসাতে ছাত্র আকৃষ্ট করা হইতে লাগিল; সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করিয়া স্তূপাকারে বদ্ধ রাখা হইতে লাগিল, দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকে আনিয়া উক্ত কালেজদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা করা হইতে লাগিল; তথাপি প্রাচ্য শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের অনুরাগ দৃষ্ট হইল না। "ইংরাজী শিক্ষা চাই, ইংরাজী শিক্ষা চাই" এই রব যেন দেশের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ শিক্ষা কমিটীর নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সকল প্রশ্নই বদ্ধ রহিল। ১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের বন্ধু মিষ্টর উইলিয়ম আডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে ভ্রমণ করিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ওদিকে সুবিখ্যাত লর্ড মেকলে আসিয়া বিবাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি গবর্ণর জেনেরালের প্রথম ব্যবস্থাসচিবরূপে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যেন দক্ষিণ হস্ত পাইলেন।

কোর্ট অব ডাইরেক্টারস্‌দিগের ১৮১৩ সালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় আদেশ ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে কি না, জানিবার জন্য ঐ নির্দ্ধারণ পত্র সূত্রক

ব্যবস্থা-সচিব মেকলের বিচারার্থ অর্পণ করা হইল। মেকলে বিশেষে বিবেচনা করিয়া ১৮৩৫ সাল ২রা ফেব্রুয়ারী দিবসে এক সুযুক্তি-পূর্ণ মন্তব্যপত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। সেই মন্তব্যপত্রের উপসংহারে লিখিলেন ;

"To sum up what I have said : I think it is clear that we are not fettered by any pledge expressed or implied ; that we are free to employ our funds as we choose ; that we ought to employ them to teaching what is best worth knowing ; that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic ; that the natives are desirous to be taught English and are not desirous to be taught Sanskrit or Arabic ; that neither as the language of law nor as the language of religion, have the Sanskrit and Arabic any peculiar claim to our encouragement ; that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars ; and that to this end our efforts ought to be directed."

মেকলের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয় সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ঐ বৎসরের ৭ই মার্চ্চ দিবসে তিনি এক বিধি প্রচার করিলেন, তাহাতে এই আদেশ করিলেন যে,—১৮১৩ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণ যে লক্ষ টাকা এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা সে সময় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ প্রাচ্য শিক্ষার উন্নতিবিধানে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা অনন্তর কেবল "ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে এবং ইংরাজী ভাষাতেই সে শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের মধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা পক্ষপাতীদিগের মধ্যে বহুদিন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা ঘোরতর ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হইয়া পড়িল। প্রাচ্য-শিক্ষা-পক্ষীয়গণ মেকলের সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্যপত্রের উত্তর দিতে পারিলেন না ; পরন্তু মেকলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার একটু কারণও ছিল। মেকলেকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানেন যে, মেকলে মৃদুভাবে আপনার মত প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ মন্তব্য পত্রেরই একস্থানে লিখিয়াছিলেন ;—

"I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have done what I could to form a correct estimate of their values. I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works. I have conversed both here

and at home with men distinguished by their proficiency in Eastern tongues. I am quite ready to take the oriental learning at the valuation of the orientalists themselves. I have never found one among them, who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia."

"এক সেল্‌ফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই"—এই কথাটা প্রাচ্য শিক্ষা-পক্ষীয়দিগের গাত্রে তপ্তজলের ছড়ার ন্যায় পড়িল। তাঁহারা ক্ষেপিয়া আগুন হইয়া গেলেন। পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্‌ কমিটীর সভাপতি মে: সেক্সপিয়ার ও সেক্রেটারি মে: জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেপ পদত্যাগ করিলেন। গবর্ণর জেনেরাল মেকলেকে উক্ত কমিটীর সভাপতির পদে বরণ করিলেন। এদেশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের রাজ্য আরম্ভ হইল।

বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে,—এক সেল্‌ফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল, বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।

মানুষ যে আলোক পায় তদনুসারেই যদি চলে তবেই তাহার প্রশংসা। আমরা এক্ষণে এই যুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার অনুমোদন করিতে পারি না সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে অকপটচিত্তে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের আলোক অনুসারে চলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেবিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিন জনই তাঁহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন;—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার ঝোঁক বঙ্গসমাজে বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে। তাহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

রামগোপাল ঘোষের ভবনে এই যুবকদলের এক আড্ডা ছিল।

তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে রামতনু লাহিড়ী তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি আদর করিয়া "তনু" "তনু" বলিয়া ডাকিতেন। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে লাহিড়ী মহাশয় প্রিয়বন্ধু রামগোপালের ভবনে যাইতেন; এবং অনেকদিন সেইখানে রাত্রি যাপন করিতেন। এই বন্ধুবর্গের সমাগমকাল অতি সুখেই কাটিত। মধ্যে মধ্যে শেরী শ্যাম্পেন চলিত বটে, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি যে, এই যুবকদল একত্র সমবেত হইলেই কোন না কোন হিতকর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত ও সদালাপে সময় চলিয়া যাইত। সকলেরই মনে জ্ঞান-স্পৃহা অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। পরস্পরের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহারা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি অগ্রে উল্লেখ করা গিয়াছে; যথা "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই দ্বিভাষী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি কর্ম্মসূত্রে সত্বর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যুবক বন্ধুগণ তাহার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর "একাডেমিক এসোসিয়েশন" হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সভার কার্য্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৩৪ সালের মধ্যে ঐ সভা উঠিয়া যায়। এই নব্যবঙ্গের নেতৃগণ নিরুদ্যম না থাকিয়া, আপনাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য নিজেদের মধ্যে একটি সার্কুলেটিং লাইব্রেরী ও একটি এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। লাইব্রেরী হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বন্ধুগণের পাঠের জন্য বিতরণ করা হইত; এবং এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে বিষয়ে চিঠি পত্রে আলাপ হইত। রামগোপাল ঘোষ ও লাহিড়ী মহাশয় এই দুই কার্য্য প্রধানভাবে দেখিতেন।

এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা অবশেষে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, নিজেদের জ্ঞানোন্নতির জন্য একটি সভা স্থাপন করা আবশ্যক। তদনুসারে তারিণীচরণ বাঁড়ুজ্যে, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও রাজকৃষ্ণ দে, এই কয়েকজনে স্বাক্ষর করিয়া ১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি দিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন। তাহাতে এক নূতন সভার প্রস্তাব করিয়া বলা হইল যে, সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে পরস্পরের সহায়তা করা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন করা উক্ত সভার উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অপর কথা এই তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, এই নিয়ম করা উচিত যে, যিনি বক্তৃতা দিব বলিয়া সমুচিত কারণ ভিন্ন বক্তৃতা না দিবেন, তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবে। এরূপ নিয়ম কোনও সভাতে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইহাতে বুঝা

যাইতেছে তাঁহারা কিরূপ চিত্তের একাগ্রতার সহিত উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী রামকমল সেন মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত কালেজের হল চাহিয়া লইয়া সেখানে নব্যশিক্ষিত দলের এক সভা আহ্বান করা হইল। উক্ত আহ্বানানুসারে ১২ই মার্চ্চ দিবসে ঐ হলে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। সেই সভাতে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি করিয়া "Society for the Acquisition of General Knowledge" অর্থাৎ "জ্ঞানার্জ্জনসভা" নামে এক সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভা কয়েকবৎসর জীবিত থাকিয়া যুবক সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ঐ সভাতে কিরূপ বিষয় সকলের আলোচনা হইত, তাহার ভাব পাঠকগণের গোচর করিবার জন্ম কয়েকজন বক্তার ও তাঁহাদের আলোচিত বিষয়ের নাম উদ্ধৃত করিতেছি :—

K. M. Banerjea—Reform—civil and social—among educated natives.

Hurro Chunder Ghose—Topographical and statistical sketch of Bankurah.

Mahesh Chunder Deb—Condition of Hindu women.

Govind Ch Sen—Brief outline of the History of Hindustan.

Govind Ch. Bysak—Descriptive notices of Chittagong.

Peary Chandra Mitra—State of Hindustan under the Hindus.

Govind Ch. Bysak—Descriptive notices of Tipperah.

Prosonno Kumar Mitra—The Physiology of Dissection.

এই সভা সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। একদিন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের এক বক্তৃতাতে প্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে টোরীদলভুক্ত লোক ছিলেন। যুবকদলের অতিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি উক্ত বক্তৃতাতে বিরক্ত হইয়া তাহা থামাইয়া দেন ; এবং এই যুবকদলকে চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্শন, (Chuckerbutty Faction) বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৩ সালে যখন জর্জ্জ টমসন্ এদেশে আসেন তখন ইঁহারা চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্শন নামে প্রসিদ্ধ।

বক্তাদিগের মধ্যে প্রসন্ন কুমার মিত্র এই সময়কার নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে একজন বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ন্যায় মেডিকেল কালেজ স্থাপনও এইসময়কার একটি

প্রধান ঘটনা। অগ্রে এদেশীয়দিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্ম বিশেষ আয়োজন ছিল না। ইংরাজ ডাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট প্রেরণ করা আবশ্যক হইত। তাই একদল এদেশীয় হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্ম "মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন" নামে একটি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রের কতকগুলি ঔষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন উপদেশ দেওয়া হইত মাত্র। ডাক্তার টাইটলার (Dr. Tytler) ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। যে ১৮৩৪ সালের কথা বলিতেছি, তখন Dr. Ross ঐ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাতে সোডার গুণ সর্ব্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ফলতঃ বোধ হয় তিনি সোডা-তত্ত্ব ব্যতীত অপর পদার্থতত্ত্ব বড় অধিক জানিতেন না। যখন তখন সোডার মহিমা শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রেরা এমনি বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা তাঁহার নাম সোডা রাখিয়াছিল। নব্যবঙ্গের নেতৃগণ এই সোডাকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে "Soda and his Pupils" এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। Dr. Tytler একজন প্রাচ্যপক্ষপাতী ও উৎকেন্দ্র লোক ছিলেন। এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এই কারণে বর্ত্তমান মেডিকেল কালেজ স্থাপনের সময় তিনি বড় বাধা দিয়াছিলেন।

যাহা হউক সে সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল না। পাঠকগণ অগ্রেই জানিয়াছেন যে, সংস্কৃতকালেজে চরক ও সুশ্রুতের শ্রেণী এবং মাদ্রাসাতে আবিসেন্নার শ্রেণী খুলিয়া দেশীয় বৈদ্যকশাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। মেডিকেল কালেজ স্থাপন পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতে লাগিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের প্রকৃতি এই ছিল যে, তিনি সহজে কোন নূতন পথে পা দিতে চাহিতেন না; কিন্তু কর্ত্তব্য একবার নির্দ্ধারিত হইলে, বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে সে পথে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন আর বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার চরিত্রের এই গুণের প্রমাণ মেডিকেল কালেজ স্থাপনেও পাওয়া গেল।

১৮৩৪ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যার অবস্থা অবগত হইবার জন্ম সে সময়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন

নিয়োগ করিলেন। সুবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় ঐ কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ১৮৩৫ সালের জুনমাসে মেডিকেল কালেজ খোলা হয়। ডাক্তার ব্রাম্‌লি (Dr. Bramley) ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে মহামতি হেয়ার ইহার সম্পাদক হন। তাঁহারই প্ররোচনাতে তাঁহার ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে মৃতদেহব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এই মৃতদেহব্যবচ্ছেদ লইয়া সে সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক মহোদয় সে সময়ে এ দেশে ছিলেন না। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মার্চ্চ মাসের শেষে তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় হেয়ারের পরামর্শে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণকে ঐ কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং বিধিমতে তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছাত্রগণকে রীতিমত উৎসাহ দিয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত কালেজকে সবল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আরও কতকগুলি শুভানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়, তাহার সহিত নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের অল্পাধিক পরিমাণে যোগ ছিল। তাহার কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, ১৮৩৪ সালে সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়া টাউনহলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্য এক সভা করেন। তাহাতে নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে ১৮৩৪ সাল হইতেই তাঁহারা সহরের বড় বড় কাজে হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়, ১৮৩৬ সালে কলিকাতাবাসী ইংরাজ ও ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে বর্ত্তমান "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী" স্থাপিত হয়। এই শুভানুষ্ঠান হওয়াতে ডিরোজিওর শিষ্যদল আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলেন এবং সর্ব্বদা লাইব্রেরিতে যাতায়াত ও পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই দলের অন্যতম সভ্য প্যারীচাঁদ মিত্র লাইব্রেরির প্রথম দেশীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যতের সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ হইল। ১৮৪৪ সালে লর্ড মেটকাফের স্মরণার্থ বর্ত্তমান মেটকাফ হল নির্ম্মিত হইলে উক্ত লাইব্রেরী সেখানে উঠিয়া আসে।

তৃতীয় শুভানুষ্ঠান ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপন। রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেবের সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা ছিল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনেক কাজ

করিতেন। তাঁহার ভবনে মধ্যে মধ্যে যুবকদলের সম্মিলন হইত। আডাম ঠিক কোন সালে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে গিয়াও ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে, প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে, ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর সুখ দুঃখ ইংলণ্ডের লোকের গোচর করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভা জর্জ্জ টমসন্, উইলিয়াম এডনিস, মেজর জেনারেল ব্রিগ স্ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াতেই আরম্ভ করেন; এবং ১৮৪১ সালে British Indian Advocate নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আডাম সাহেব তাহার সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত হইলেই রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি পত্রযোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বোধ হয় প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

চতুর্থ অনুষ্ঠান বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইলে এবং হিন্দুকালেজের উন্নতি হইলে, কালেজ কমিটী অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের শিশুশিক্ষা শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করিয়া একটি বাঙ্গালা পাঠশালা রূপে স্থাপন করিলে ভাল হয়। মহামতি হেয়ার এ বিষয়ে অতিশয় উৎসাহিত হইলেন এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকেও উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের সকলের চেষ্টাতে ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে বাঙ্গালা পাঠশালার গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন।

পঞ্চম অনুষ্ঠান মেকানিকাল ইনষ্টিটিউট্ নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন। সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ উহার উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৯ সালের প্রথম ভাগে টাউন হলে একটি মহাসভা হইয়া ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা দেওয়া ঐ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়টি মহা আড়ম্বর করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিক দিন টেকে নাই। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যে এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কালের উল্লেখযোগ্য সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ অনুষ্ঠান মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান। এই মহাকার্য্যে যুবকদলের প্রধান হাত ছিল। তাঁহারা ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের পূর্ব্বে এই ১৮৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দিবসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। সুতরাং সে আন্দোলনে নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ যোগ দিয়াছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত একটি জ্ঞাতব্য বিষয়।

১৭৮০ সালে সর্ব্বপ্রথমে "হিকীর গেজেট" (Hickey's Gazette) নামে

একখানি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র বাহির হয়। তৎপরেই বেঙ্গল জর্ণাল (Bengal Journal) নামে আর একখানি কাগজ প্রকাশিত হয়। এই দুইখানিতে এরূপ অভদ্র ভাষা ব্যবহৃত হইত যে, ১৭৯৪ সালে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ বেঙ্গল জর্ণালের সম্পাদক উইলিয়াম ডুইএনকে (W. Duane) ধরিয়া বন্দী করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে কিছুদিন যায়। পরে যখন টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরাজদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিধিমতে সংবাদ পত্র পরীক্ষার রীতি (Censorship) স্থাপন করেন। এই বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া মুদ্রিত করিতে হইত। ১৮১৩ সালে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হয় হয়। ১৮১৮ সালে লর্ড হেষ্টিংস এই নিয়ম এক প্রকার রহিত করেন। তাহার ফলস্বরূপ নূতন নূতন কাগজ দেখা দেয়। তন্মধ্যে এই ১৮১৮ সালে কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal) নামে এক কাগজ বাহির হয়। বকিংহাম (Buckingham) নামক একজন ইংরাজ তাহার সম্পাদক ও স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট (Sandford Arnot) নামে একজন ইংরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সংবাদপত্রের সমালোচনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া লর্ড হেষ্টিংসকে মুদ্রাযন্ত্রের শাসনের জন্য বার বার উত্তেজিত করিতে থাকেন; কিন্তু সেই উদার-নৈতিক রাজপুরুষ তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এই পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন জন আডাম, ইনি পরে কিছুকালের জন্য গবর্ণর জেনেরালের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

১৮২৩ সালে যখন জন আডাম গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লইয়া আবার গোলযোগ উঠে। ডাক্তার ব্রাইস (Dr. Bryce) নামক গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করাতে গবর্ণর জেনেরাল কলিকাতা জর্ণাল নামক পত্রের সম্পাদক বকিংহাম সাহেবকে দুই মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ঐ পত্রের সহকারী সম্পাদক (Sandford Arnot)-কে ধরিয়া অব্যবহিত পরগামী জাহাজে তুলিয়া বিলাতে রওয়ানা করা হয়। ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠে, ইংরাজকে যেন স্বদেশে ফিরিয়া পাঠান হইল, কিন্তু ইক্রঁস, পিক্রঁস, বা গমিস নামক কোনও ফিরিঙ্গী সম্পাদক ঐরূপ অপরাধ করিলে কি করা হইবে? তাঁহাকে কি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত দেখাইয়া আনা হইবে? এই সংকট মোচনের উদ্দেশে আডাম মুদ্রাযন্ত্রের শাসনার্থ তাড়াতাড়ি এক কড়া আইন প্রণয়ন করেন; এবং তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লন। যখন এই নূতন বিধি প্রণীত হয় তখন রামমোহন রায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ হইতেছে দেখিয়া

স্বদেশবাসীদিগকে এই নূতন রাজবিধির বিরুদ্ধে উত্থিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তিনি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিলিয়া বারিষ্টারের সাহায্যে, সুপ্রিমকোর্টে বিচার উপস্থিত করেন; এবং যাহাতে সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদিত না হয় তাহার চেষ্টা করেন। সেখানে অকৃতকার্য্য হইয়া ইংলণ্ডাধিপতির নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। কিছুতেই কিছু হয় নাই।

তৎপরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয় যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সাহসের সহিত সৈন্যবিভাগের বাটার হ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে। বেণ্টিক্ক ইংরাজগণের অপ্রিয় হইয়া পড়েন। ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সকল তাঁহার প্রতি অতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। সে সময় অনেকে বেণ্টিক্ক মহোদয়কে মুদ্রাযন্ত্রের শাসনের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের ন্যায় বহু বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যকে সুশাসন করিতে গেলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি স্বাস্থ্যের হানিবশতঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া যাইতে পারিলেন না। সে কার্য্যের ভার তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনেরাল লর্ড মেটকাফের জন্য রাখিয়া গেলেন। যে আইনের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীন করা হয়, তাহা লর্ড মেকলে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লর্ড মেটকাফের প্রশংসার্থ একথা বলা আবশ্যক যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করাতে গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি ঐ সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং সত্যসত্যই তাহাই তাঁহার উক্ত পদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদ আইন ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রণীত হইয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে জারি হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা হইলেই বঙ্গদেশে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। নূতন নূতন সংবাদপত্রসকল দেখা দিতে লাগিল; নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতার ভাব সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা ও কার্য্যে এক নূতন তেজস্বিতা প্রবিষ্ট করিল; এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকর কার্য্যের উৎসাহ যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ডিরোজিওর শিষ্যদল নানা বিভাগে নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে জুরি-বিচার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য ও মফঃস্বল আদালত সকলে ওকালতিতে পারস্য-ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য, হেয়ার যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, যুবকদল সে সকল বিষয়ে তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ক্রমে আমরা ১৮৪২ সালে উপস্থিত হইতেছি। ঐ সালের প্রারম্ভে

সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাতযাত্রা করিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পর দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে এই প্রথম বিলাত-যাত্রা। তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত হিন্দুসমাজের সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে এরূপ মুক্তহস্ত দাতা আর দেখা যায় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী স্থাপন, মেডিকেল কালেজ হাসপাতাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় সাধারণের হিতকর অপরাপর অনুষ্ঠানেও তিনি অকাতরে সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সদাশয়তার অনেক গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সদাশয়তার একটি মাত্র নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে। তিনি শৈশবে (Sherburne) শার্বরণ নামক যে ফিরিঙ্গী শিক্ষকের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা পর্য্যন্ত চিরদিন তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দ্বারকানথের সদাশয়তা স্বদেশীয় বিদেশীয় গণনা করিত না; যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন সেইখানেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ছিল। এই সদাশয় মুক্তহস্ত পুরুষ যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? তাঁহার ইংলণ্ড-গমন যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা আন্দোলন ও সমালোচনা উত্থিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এদেশে যেমন সম্মানিত ছিলেন, ইংলণ্ডেও সেইরূপ বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পতি প্রিন্স এলবর্ট, ফ্রান্সের রাজা ও রাণী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। বলিতে কি তিনি সর্ব্বত্রই রাজোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংলণ্ড-যাত্রার পর তৎপরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে রাম-গোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সমবেত হইয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটর (Bengal Spectator) নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। এই পত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই ভাষাতে লিখিত হইত এবং প্রথম প্রথম মাসে একবার প্রকাশিত হইত। এই পত্রে নব্য যুবকদল সাধ মিটাইয়া আপনাদের উদার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। এই পত্র ১৮৪৩ সালে মার্চ্চ মাস হইতে সাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়; পরে নবেম্বর হইতে সাহায্যাভাবে উঠিয়া যায়।

কিন্তু আর এক কারণে এই ১৮৪২ সাল বঙ্গদেশের পক্ষে চিরস্মরণীয় দুর্ব্বৎসর। ঐ বৎসরে মহামতি হেয়ার ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। সেকালের

লোকের মুখে যখন তাঁহার মৃত্যুদিনের বিবরণ শ্রবণ করি তখন শরীর কণ্টকিত, চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে প্লাবিত এবং হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, হেয়ার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে (Gray) নামক তাঁহার এক বন্ধুকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারই সঙ্গে বর্ত্তমান কয়লাঘাটের নিকটস্থ এক ভবনে বাস করিতেন। সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১শে মে দিবসে রাত্রি ১টার সময়ে তিনি হঠাৎ দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি আমরণ কৌমার্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার প্রিয় বেহারা ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না। দুই একবার দাস্ত ও বমন হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে, কালশত্রু তাঁহাকে ধরিয়াছে। নিজের বেহারাকে বলিলেন—"গ্রে সাহেবকে গিয়া আমার জন্য কফিন (শবাধার) আনাইতে বল"। প্রাতঃকালে ডাক্তার ডাকা হইল। তাঁহার প্রিয় ছাত্র মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ সুযোগ্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বিধিমতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা বিদ্যাতে যাহা হয়, ঔষধে যাহা করিতে পারে, বন্ধুজনের যত্ন, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রহিল না। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন ওলাউঠা হইলে সর্ব্বাঙ্গে ব্লিষ্টার লাগাইত। তদনুসারে হেয়ারের গাত্রে ব্লিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্ণে তিনি ধীরভাবে প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন—"প্রসন্ন! আর ব্লিষ্টার দিও না: আমাকে শান্তিতে মরিতে দেও"। এই বলিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা শান্তভাবে যাপন করিয়া ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে হেয়ার চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ কলিকাতা সহরে প্রচার হইলে উত্তরবিভাগে ঘরে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে সকল দরিদ্র পরিবারের পিতা মাতা ছিলেন, সেই সকল পরিবারে হিন্দুরমণীগণ আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তিনি যে সকল দরিদ্র বালককে পালন করিতেন, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিমুখে ছুটিল। গ্রে সাহেবের ভবনে ছোট বড় বাঙ্গালী ভদ্রলোকে লোকারণ্য! হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় রাধাকান্ত দেব হইতে স্কুলের ছোট ছোট বালক পর্যন্ত কেহ আর আসিতে বাকি থাকিল না। কথা উঠিল তাঁহার সমাধি কোথায় হইবে? তিনি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি লাভ করা কঠিন হইল। অবশেষে তাঁহারই প্রদত্ত, ও হিন্দুকালেজের সংলগ্ন, ভূমিখণ্ডে তাঁহাকে সমাহিত করা স্থির হইল। তাঁহার শব যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল তখন গাড়ীতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহা আর দেখিবে না! বহুবাজারের চৌরাস্তা হইতে মাধব দত্তের বাজার পর্য্যন্ত সমগ্র রাজপথ

জনতার প্লাবনে নিমগ্ন হইয়া গেল। একদিকে সহরের পথে যেমন শোকের বন্যা, অপরদিকেও তেমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হইতে লাগিল। মনে হইল দেবগণও প্রচুর অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন। এইরূপে সুরনরে মিলিয়া হেয়ারের জন্য শোক করিলেন। হেয়ারকে সমাহিত করা হইল; ওদিকে প্রবল ঝড়ে কলিকাতা সহর কাঁপিয়া গেল।

লাহিড়ী মহাশয় সেদিন প্রাণে কি আঘাত পাইলেন তাহা বলিবার নহে। যে হেয়ার তাঁহার পিতার কাজ করিয়াছিলেন, যে হেয়ার আপদে বিপদে তাঁহার সাহায্যের জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন, যে হেয়ার কেবল তাঁহার নহে তাঁহার ভ্রাতাদেরও শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, যে হেয়ার তিনি পীড়িত হইলে মাতার ন্যায় আসিয়া রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিয়াছেন, সেই হেয়ার চলিয়া গেলেন। আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি এ দারুণ শোক তাঁহার প্রাণে কিরূপ বাজিল। উত্তরকালে হেয়ারের নাম করিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হইত। শরীরে যত দিন চলিবার শক্তি ছিল, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, প্রতি বৎসর ১লা জুন হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রের নিকটে গিয়া বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া তাঁহার স্মরণার্থ সভা করিয়াছেন। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাধু-ভক্তি লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রের দুইটি প্রধান গুণ ছিল।

কেবল যে রামতনু লাহিড়ী হেয়ারের শোকে শোকার্ত্ত হইলেন তাহা নহে, রামগোপাল প্রমুখ যৌবন-সুহৃদগণও সকলে সেই শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সে সময়ে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে তাঁহারা হেয়ারের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় এক সভা আহ্বান করিলেন। ১৭ই জুন মেডিকেল কালেজে ঐ সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে হেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য এক কমিটী নিযুক্ত হইল। রামগোপাল ঘোষ ঐ কমিটীতে ছিলেন। এই কমিটীর চেষ্টাতে হেয়ারের এক সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইল। তাহাই এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হেয়ারের স্কুলের প্রাঙ্গণকে সুশোভিত করিতেছে।

১৮৪২ সালের শেষ ভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার সময় সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ টমসন্‌কে সঙ্গে করিয়া আসিলেন। ইঁহার মত বাগ্মী ও তেজস্বী লোক অল্পই এদেশে আসিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি অগ্নিময় বক্তৃতা করিয়া আপনাকে যশস্বী করিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মিষ্টর উইলিয়াম আডামের প্রতিষ্ঠিত

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সহিত যোগ দেন। সেই সূত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দ্বারকানাথ বাবু নিজ সহৃদয়তা ও দেশহিতৈষিতা গুণে, এদেশের লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে, তাঁহাকে এখানে আনয়ন করেন।

জর্জ টম্‌সন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায়, তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ টমসনের সহিত মিশিয়া গেলেন। নানা স্থানে নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা হইয়া অবশেষে কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে একটি ভবনে টমসনের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। এরূপ বাগ্মিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীরামপুরস্থ মিশনারি সম্পাদিত ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক একবার লিখিলেন—"এখন দুইদিকে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হইতেছে। পশ্চিমে বালাহিসারে ও পূর্ব্বে ফৌজদারী বালাখানাতে।" বাস্তবিক জর্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির ন্যায় উন্মাদকারিণী ছিল।

জর্জ টমসনের বাগ্মিতার ফলস্বরূপ ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল দিবসে, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর অনুকরণে কলিকাতাতেও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপিত হইল। শিক্ষিত যুবকদল একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ও যে তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পশ্চাতে পশ্চাতে এই জন্য বলিতেছি যে, তাঁহার স্বভাব এই ছিল যে, তিনি অধিক কথা কহিতেন না; সর্ব্বদা বিনয়ে মৌনী থাকিতেন; নিজের বয়স্যদিগকে অনেক বিষয়ে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন; এবং সকলের মধ্যে মৌনী থাকিয়া তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে যাহা ভাল থাকিত তাহাই গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বয়স্যগণের মধ্যে যখনি তাঁহাকে দেখি, দেখি তিনি মৌনী ও তিনি সকলের পশ্চাতে। এই স্বভাবসুলভ বিনয় আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার এই স্বাভাবিক বিনয়ের প্রমাণ স্বরূপ ১৮৩৯ সালে লিখিত রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"20th Nov. 1839. In the evening Tarachand, Callachand, Peary, Ramtonoo, Ramchunder and Horomohun were here to make arrangements for the conducting of *Gnananweshan*. It appeared from what the two latter said, that it was a losing concern. This they never before gave me to understand, which they should have done before calling the

meeting. Every body spoke freely on the subject, *with the exception of Tonoo, who was silent.*"

পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, কোনও গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্ম বয়স্যগণের সম্মিলন হইলেই লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে থাকিতেন; তাঁহাকে বাদ দিয়া কোনও কাজ হইত না; কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় মৌনী থাকিতেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভাতে গরম গরম বক্তৃতা করিয়া বয়স্যগণ যখন রামগোপালের ভবনে আসিয়া "ভারতের শুভদিন সন্নিকট" বলিয়া আনন্দ করিতেন এবং শ্যাম্পেনের বোতল খুলিয়া সে আনন্দের উপসংহার করিতেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ও তাঁহাদের সহিত পূর্ণমাত্রায় স্বদেশের নবযুগের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং সেই মহোল্লাসে যোগ দিতেন।

ফৌজদারী বালাখানাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপিত হইলে, সেই ভবনে যুবকদলের জ্ঞানার্জ্জন সভাও উঠিয়া আসিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব দক্ষিণারঞ্জনের এক রাজনীতি সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া এই যুবকদলের চক্রবর্ত্তী ফ্যাকশন নাম দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সে সময়ে "The Quill" নামে এক কাগজ বাহির করিতেন; তাহাতে রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম প্রবন্ধ সকল বাহির হইত; এবং তারাচাঁদ ইহাদের দলের একজন অগ্রণী ছিলেন।

অনুমান ১৮০৪ সালে কলিকাতার যোড়াশাঁকো নামক স্থানে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মহাত্মা হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাতে ইঁহার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখানে হইতে ফ্রী ছাত্ররূপে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তৎপরে অপরাপর কাজ করিয়া শেষে সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটী রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেখান হইতে মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইয়া জাহানাবাদে গমন করেন। কেন যে সে পদে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই তাহা বলিতে পারি না। কিছুদিন পরে সে কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া তিনি সংস্কৃত মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন; এবং একখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ডিক্শনারি বাহির করেন। এই সময়ে তিনি "The Quill" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতেন। তাহা গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি যে কেবল জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞান বিস্তারে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা নহে, দেশহিতকর সর্ব্ববিধ কার্য্যে যুবকবন্ধুগণের সঙ্গী হইতেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন; এবং

১৮২৮ সালে রাজা যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনিই তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

জীবনের শেষভাগে তিনি বর্দ্ধমান-রাজের ম্যানেজারি কার্য্যে নিযুক্ত হন। শুনিতে পাই বর্দ্ধমানাধিপতি মহতাপ চন্দ বাহাদুর তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে তাঁহার দেহান্ত হয়। ১৮৪৩ সালে যে সকল ব্যক্তি নব্যবঙ্গের নেতৃরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একজন প্রধান।

আর এক কারণে এই ১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয়। এই সালে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে নবজীবন ও নবশক্তি প্রদান করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;—

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। অনুমান ১৮১৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হিন্দুকালেজে আসেন। হিন্দুকালেজে আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরিগণিত হন। এরূপ বোধ হয় ডিরোজিওর শিষ্যদলের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। যদিও তাঁহার পিতা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ও রাজার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, তথাপি গৃহস্থিত প্রাচীন মহিলাগণের শিক্ষার গুণে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রাচীন ধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়। সে সমুদয় কথার এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিষয় সুখকে হেয়জ্ঞান করিয়া যখন তিনি প্রাচীন বেদান্ত ধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান হইলেন, তখন, ১৮৩৮ সালে, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। ১৮৪০ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাহাতে ছাত্রদিগকে রীতিমত বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে, যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন ; এবং বেদ বেদান্তের আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আপনার কার্য্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন রক্ষা করিয়াছেন।

একদিকে যখন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনের চেষ্টা চলিতে লাগিল অপরদিকে ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রায় বিংশতিজন বয়স্যের সহিত প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কল্পে আপনার সমগ্র হৃদয় মন নিয়োগ করিলেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল; সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিলেন; এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার লেখক-শ্রেণী গণ্য হইলেন।

ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করিলে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার প্রধানতঃ ইহার প্রথম আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরে পতিত হয়। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরাগের অল্পতা ছিল না; কিন্তু কতিপয় বৎসরের মধ্যেই সমাজের সভ্যগণ অনেকেই ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন কেবল একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অপর কতিপয় ব্যক্তি বৃদ্ধ আচার্য্যের পৃষ্ঠপোষক হইয়া সমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এরূপ শুনিতে পাই সমাজের সমগ্র মাসিক ব্যয় একা দ্বারকানাথ ঠাকুর দিতেন। সুতরাং এই ১৮৪৩ সালকেই ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থানের বৎসর বলিতে হইবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে উঠিয়া যায়, পরে ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা হইতে তিনি চারিজন ব্রাহ্মণকে চারিবেদ পাঠ করিবার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহাদিগকেও ফিরিয়া আসিতে হয়।

১৮৪৪ সালে দুইটি ঘটনা ঘটে। প্রথম, বর্ত্তমান মেটকাফ হলের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে পাবলিক লাইব্রেরী সেই ভবনে উঠিয়া আসে। নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় উহার লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হওয়াতে লাইব্রেরীটি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি যুবকদলের একটি সম্মিলন ও জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হইয়া উঠে। বিশেষতঃ রামগোপাল ঘোষ এই লাইব্রেরীর একজন প্রধান উৎসাহদাতা ও অধ্যক্ষ হন।

দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয়বার বিলাত গমন। এবার তিনি বিলাত যাত্রার সময় নিজের উদার হৃদয় ও দেশহিতৈষিতার অনুরূপ একটি সৎকার্য্য করেন। কলিকাতা মেডিকেল কালেজ স্থাপনে তিনি যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। উক্ত কালেজের বর্ত্তমান হাসপাতালটি নির্ম্মাণের জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন, তাহারও

উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা বা দানশক্তি তাহাতেও পর্য্যবসিত হয় নাই। ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড-যাত্রায় অভিপ্রায় করিলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করিলেন যে, নিজের ব্যয়ে মেডিকেল কালেজের কয়েকজন ছাত্রকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া শিক্ষিত করিয়া আনিবেন। তদনুসারে এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। উক্ত কাউন্সিলের চেষ্টাতে চারিজন ছাত্র জুটিল। তন্মধ্যে শ্রীমান্ ভোলানাথ বসু ও শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর ব্যয় তিনি দিলেন; এবং শ্রীমান্ দ্বারকানাথ বসু ও শ্রীমান্ গোপাললাল শীলের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিলেন। এই চারিজন ছাত্র ডাক্তার এডোয়ার্ড গুডিভের তত্ত্বাবধানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন। দুঃখের বিষয় এই বিলাত যাত্রাই দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ যাত্রা হইল। সেখানে ১৮৪৬ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়; এবং তাঁহার দেহ লণ্ডন সহরের এক সুপ্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত রহিয়াছে।

এদিকে এই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাহা এই সময়ে বঙ্গসমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুকালেজের ষোল সতের বৎসরের বালকেরা সুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এই সময়ে হিন্দুকালেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়কার লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, কালেজের বালকেরা গোলদীঘির মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মাধবদত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরাপান করিত। যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাদুরি হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত!

একদিকে যুবক বয়স্যদিগের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ ওদিকে কালেজ গৃহে ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়ার পাঠ। এরূপ সেক্সপীয়ার পড়িতে কাহাকেও শোনা যায় নাই। তিনি সেক্সপীয়ার পড়িতে পড়িতে নিজে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া যাইতেন এবং ছাত্রগণকেও মাতাইয়া তুলিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুসূদনের কবিত্ব শক্তি স্ফুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মুখে সেক্সপীয়ার শুনিয়া ছাত্রগণ সেক্সপীয়ারের ন্যায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বর্দ্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি আর দৃক্‌পাত করিত না। স্বজাতি-বিদ্বেষ অনেক বালকের মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপান অবাধে

চলিত। অতিরিক্ত সুরাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

সময় বুঝিয়া এই সময়ে সুবাগ্মী খ্রীষ্টীয় প্রচারক ডফ তাঁহার মধ্য বয়সের অদম্য উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্য ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করার পর দেশমধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল বলিতে গেলে তাহা আর থামে নাই। এই সময়ে বা ইহার কয়েক বৎসর পরে পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। এতদ্ব্যতীত গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঠাকুর বাবুদের দেওয়ানের পুত্র উমেশচন্দ্র সরকার খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণের আশয়ে সস্ত্রীক পলাইয়া মিশনারিদিগের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাকে মিশনারিদিগের হাত হইতে ছিঁড়িয়া লইবার জন্য তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা করেন। ডফ সাহেব সে পথে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হন। ইহা লইয়া হিন্দুসমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণও এই আবর্ত্তে পড়িয়া খ্রীষ্টীয়-বিরোধী-দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়ান। কলিকাতার ভদ্র গৃহস্থগণ এক মহাসভা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং কিছুদিন মহা উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত টাকা যাঁহাদের হস্তে গচ্ছিত ছিল, তাঁহাদের কারবারে ক্ষতি হওয়াতে ঐ সমুদয় টাকা নষ্ট হয়, তাহাতেই কয়েক বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয় উঠিবা যায়।

একদিকে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতি গোলাগুলী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টানগণও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন বলিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তত্ত্ববোধিনী আপনার অবলম্বিত ধর্ম্মকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদকে তাহার অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে 'বেদ অভ্রান্ত ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ হইতে পারে কি না ?' এই বিচার ব্রাহ্মসমাজের ভিতর ও বাহিরে উপস্থিত হইল। ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন; এবং বাহির হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগকে কপট ও ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

এই সকল সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। প্রথম, লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্রের মৃত্যু। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাবিলাস তাঁহার অগ্রেই গিয়াছিলেন, তৎপরে যখন কেশবের যাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণনগরের লোক সাধু পিতা রামকৃষ্ণের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এরূপ শুনিতে পাই, কেশবচন্দ্রকে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল। যখন তাঁহাকে গঙ্গাতে লইয়া যাওয়া হয়, কেশবচন্দ্র পিতার পদধূলি-প্রার্থী হইলেন। তদনুসারে রামকৃষ্ণ ধীর গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া পুত্রের মস্তকে নিজের পদধূলি দিয়া বিদায় করিলেন। সেই সাধুর মুখে কোনও শোক বা বিকারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পরই সমুদয় সংসারের ভার কনিষ্ঠভ্রাতা রামতনুর স্কন্ধে পড়িয়া গেল। তিনি যথা-সাধ্য সে ভার বহন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়, এই ঘটনার অল্পকাল পরেই বোধ হয় তাঁহার তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ হয়। তিনি যখন হিন্দুকালেজের তৃতীয় কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন কাঁদবিলা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়। ঐ পত্নী চারি পাঁচ বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন না। তৎপরে পাবনার অন্তর্গত মথুরা নামক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে পুনরায় বিবাহ করেন। এরূপ শুনা যায়, এই বিবাহে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। কি কারণে জানি না, বোধ হয় তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন বলিয়াই হইবে, তাঁহার দ্বিতীয় শ্বশুর স্বীয় কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতে চাহিতেন না। ইহা লইয়া দুই পরিবারে মনান্তর ঘটে; এবং সে কারণে লাহিড়ী মহাশয়কে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় এই পত্নীকেই লক্ষ্য করিয়া রামগোপাল ঘোষ তাঁহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিতেছেন :—

April 4th, 1839—"But our conversation did not thicken till we touched the subject of women—bright women! We spoke of the peculiarities of each other's wives. * * * Poor Ramtonoo appeared to be worried by his wife. But I should not indulge myself in writing the secrets of my friends in this book."

ঘোষজ মহাশয় আপনার ভদ্রতার দ্বারা আপনাকে বাধা না দিলে, বোধ হয় লাহিড়ী মহাশয়ের মানসিক অশান্তির সমগ্র কারণটা ব্যক্ত হইয়া পড়িত।

যাহা হউক দ্বিতীয় বিবাহ লাহিড়ী মহাশয়ের সুখের কারণ হয় নাই। আর সে পত্নীকেও শ্বশুর ঘরে আসিতে হয় নাই। তিন চারি বৎসরের মধ্যে তিনিও গত হন। তৎপরে এই সময়ে কি ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হাবড়ার সন্নিহিত সাঁতরাগাছি গ্রামের স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর কনিষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁহার তৃতীয়বার পরিণয় হয়। ইনিই তাঁহার সন্তানগণের জননী।

তৃতীয়, তাঁহার আরাধ্যা জননীদেবী এই সময়ে কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হন। কৃষ্ণনগরে রাখিলে তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইবার আশা না দেখিয়া তাঁহাকে কলিকাতাতে আনা হয়। যে মাতাকে কেশবচন্দ্র পুষ্প চন্দন দ্বারা পূজা করিতেন, যাঁহাকে প্রতিবেশিগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, যিনি নিতান্ত দারিদ্র্যে বাস করিয়াও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পিতৃকুলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, যিনি সততা, তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন, সেই জননীর সেবা তাঁহার পুত্রগণ কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। লাহিড়ী মহাশয় এ সময়ে যেরূপ মাতৃসেবা করিয়াছিলেন সেরূপ মাতৃসেবা কেহ কখনও দেখে নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তখন বালিকা, কিন্তু ঐ মাতৃসেবার কথা চিরদিন তাহার স্মৃতিতে মুদ্রিত ছিল। চিরদিন পুলকিতচিত্তে নিজের সন্তানগণের নিকট সেই মাতৃসেবার বিষয় বর্ণন করিতেন।

জননী কলিকাতায় আসা অবধি লাহিড়ী মহাশয়ের আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছিল। কোনও প্রকারে স্কুলে গিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া দিন রাত্রি মায়ের পার্শ্বে যাপন করিতেন; ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিতেন; পুত্রের ন্যায় তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন; মেথরের ন্যায় তাঁহার মলমূত্র দক্ষিণ হস্তে পরিষ্কার করিতেন; এবং কন্যার ন্যায় তাঁহার রোগশয্যাকে আরামের স্থান করিবার প্রয়াস পাইতেন। দুঃখের বিষয় জননী আর সে পীড়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। সেই রোগে কলিকাতা সহরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপরে ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে কৃষ্ণনগর কালেজ খোলা হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহার স্কুল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণনগর গমন স্থির হইলে, তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণ আপনাদের মধ্য হইতে চাঁদা করিয়া নিজেদের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে একটি ঘড়ি উপহার দিলেন। যে কয়জন বন্ধুর প্রতি ঐ ঘড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিবার ভার ছিল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ঐ ঘড়িটি মহামূল্য সম্পত্তি জ্ঞানে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন

১৮৪৬—১৮৫৩ পর্য্যন্ত

১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহ সহকারে কৃষ্ণনগর কালেজ খোলা হইল। কৃষ্ণনগরের পক্ষে সে দিন এক স্মরণীয় দিন। সে সময়ে

শ্রীশচন্দ্র নদীয়ার রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত কালেজের উৎসাহদাতা হইলেন। তৎপূর্ব্বে নদীয়ার রাজবংশের কোনও সন্তান সাধারণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে নাই। রাজারা নানা স্থান হইতে সুযোগ্য ওস্তাদ আনাইয়া স্বীয় পরিবারের বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীশচন্দ্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্বীয় পুত্র সতীশচন্দ্রকে কালেজে পড়িতে দিবার সংকল্প করিলেন; এবং নিজে কালেজ কমিটীর একজন সভ্য হইলেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য হইলেন তাহা নহে, কমিটীর প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিলেন; এবং লাহিড়ী মহাশয় একশত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গেলেন। সে সময়ে যাঁহারা কৃষ্ণনগর কালেজে লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মুখে যখন তাঁহার তৎকালীন উৎসাহ ও অনুরাগের কথা শুনি তখন চমৎকৃত হইয়া যাই। তিনি যখন পড়াইতে বসিতেন তখন দেখিলে বোধ হইত যেন পৃথিবীতে তাঁহার করিবার বা ভাবিবার অন্য কিছু নাই। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দিতেন। তিনি স্বীয় কার্য্যে এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, এক এক দিন কালেজের অধ্যক্ষ বা হেড মাষ্টার তাঁহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার পড়ান শুনিতেন; একটু অবসর পাইলে কথা কহিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার পাঠনার রীতি এই ছিল যে, কোনও পাঠ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে কোনও জ্ঞানের কথা পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে বালকদিগের জ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রভাবে না বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। পড়াইতে পড়াইতে যদি আরবের নাম কোথাও পাইলেন তাহা হইলে আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহার অধিবাসীদের স্বভাব ও প্রকৃতি, মহম্মদের জন্ম ও ধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ প্রভৃতি বালকদিগকে না জানাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। এইরূপ অধ্যাপনায় পাঠ্যগ্রন্থগুলি পাঠের বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইত না বটে, কিন্তু বালকেরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিত; এবং তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা তাহাদের অন্তরে জ্ঞানানুরাগ উদ্দীপ্ত করিত। কেবল তাহা নহে তিনি কালেজের ছুটীর পর ডিরোজিওর ন্যায় বালকদিগের সহিত কথাবার্ত্তাতে অনেকক্ষণ যাপন করিতেন। অনেক সময়ে কালেজের মাঠে তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। এইভাবে তাঁহার কৃষ্ণনগরের শিক্ষকতার কার্য্য আরম্ভ হইল।

এই সময়ে দুই দিক হইতে দুই স্রোত আসিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণনগর সমাজে মহা তরঙ্গ উত্থিত করিল। তাহার বিবরণ ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"১২৪৩ কি ৪৪ বাং অব্দে কৃষ্ণনগরনিবাসী দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী (রামতনু বাবুর কনিষ্ঠ) নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। * * * তৎকালে শ্রীপ্রসাদের স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং তিনি প্রথমে এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোনও উপদেশ দিতেন না। কিয়ৎকালানন্তর তিনি ও তাঁহার সমবয়স্ক দুই তিন জন ছাত্র স্বদেশের ধর্ম্ম ও রীতি-নীতির গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন; এবং ক্রমশঃ সাকার উপাসনার অলীকতা ও প্রচলিত আচার ব্যবহারের দোষ গুণ বুঝিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বে ছাত্রগণের মনোবৃত্তির উন্নতিসাধনে যেমন যত্ন করিতেন, ইদানীং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন করণেও তেমনি যত্নবান হইলেন।"

"কিছুদিন পরে তাঁহার মতাবলম্বী ছাত্রগণ আপন প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের কুসংস্কার দূরীভূত করিতে প্রগাঢ় যত্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সোণাডেঙ্গানিবাসী, অধুনা কৃষ্ণনগরবাসী, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এই নগরস্থ মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মিশনারিরা তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী করিতে বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু সফল-প্রযত্ন হইতে পারেন নাই। তিনি এক-ব্রহ্ম-বাদী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনিও শ্রীপ্রসাদের অনুকরণ করিয়া আপনার ছাত্র ও বান্ধবদিগের দূষিত সংস্কার সকল দূরীভূত করণে প্রবৃত্ত হন; এইরূপে কৃষ্ণনগরে প্রচলিত ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটিয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক যুবা এই অভিনব মতের অনুরাগী হইলেন। যদিও তাঁহাদের বাহ্যিক ভাবের বড় বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্তু আন্তরিক ভাবের প্রভূত পরিবর্ত্তন হইল। নূতন সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাব যে এককালে সাধারণের অগোচর ছিল এমনও নহে, নগরের অনেক প্রধান বংশোদ্ভূত যুবকগণ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন এই বলিয়া কোনও গোলযোগ উপস্থিত হইত না।"

শ্রীশচন্দ্র কেবল পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসংস্কারার্থী যুবকদলকে আদর শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে, তিনি নিজে রাজবাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতকার আর এক স্থানে লিখিতেছেন :—

"তিনি (শ্রীশচন্দ্র) ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে এ প্রদেশস্থ তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত কলিকাতার তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের নিয়ম-পত্রে তাহাদের স্বাক্ষর করাইলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করণার্থ একজন বেদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাতে তৎকালীন উক্ত-সমাজাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লিখিলেন। তিনি সহসা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত না পাইয়া হাজারি লাল নামে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকে

পাঠাইয়া দিলেন। হাজারি একে শূদ্রজাতি তাহাতে আবার বেদবেত্তা ছিলেন না, একারণ রাজা নিজে সাতিশয় ক্ষুণ্ণমনা হইলেন। তৎকালে রাজার নিকট ভাটপাড়া-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন কিন্তু লোকনিন্দা-ভয়ে প্রকাশ্যরূপে বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচারে সম্মত ছিলেন না; সুতরাং রাজা হাজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না করিয়া রাজবাটীতে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।"

"দুই তিন দিবস পরে রাজা কোনও প্রয়োজনানুরোধে মুরশিদাবাদে গমন করিলেন; এবং হাজারি ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। রাজা মাসাবধি মুরশিদাবাদে অবস্থান করেন; এইকাল মধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রায় চল্লিশ জন যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে দুই বুধবারে সকলে একত্রিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিলেন। রাজা শূদ্রজাতীয় হাজারি, সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং বাটী প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মদিগকে রাজবাটীতে সমাজ করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মগণ আমিনবাজারে একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করিয়া তন্মধ্যে সমাজ সংস্থাপন করিলেন; এবং আপাততঃ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ উপাচার্য্য প্রেরণ করিলেন।"

"ব্রাহ্মগণের শ্রেণী যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, নগরমধ্যে এ বিষয়ের আন্দোলন তেমনি বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা বীরনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়কে সহায় করিয়া গোয়াড়িতে এক ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবং ব্রাহ্মদিগের অনিষ্টসাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কিন্তু মহারাজা ব্রাহ্মগণের স্বপক্ষ থাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইল না। কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও ব্রাহ্মগণের প্রযত্নে ১৭৬৯ শকে (১৮৪৭ খৃঃ অব্দে) বর্ত্তমান সমাজ-মন্দির নির্ম্মিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গৃহ নির্ম্মাণার্থে এক সহস্র টাকা দান করেন।"

পাঠকগণ দেখিতেছেন কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহা নহে, ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইয়াছিল; এবং প্রধান প্রধান ধনিগণ তাহার সারথি-স্বরূপ হইয়া নব্যদলের শাসনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এই উভয়দলের মধ্যে দণ্ডায়মান; সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার পশ্চাতে, সুতরাং তিনি পূর্ণমাত্রায় নবোত্থিত বেদান্তধর্ম্মের মুখপাত্র হইতে পারিলেন না; কিন্তু উৎসাহদান, অনুরাগ, আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে, তিনি নবদ্বীপ হইতে বড় বড় পণ্ডিতদিগকে

আনাইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন—"কেন আপনারা বেদ-বিহিত বেদান্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন না ?" ফল কি হইল তাহা উক্ত গ্রন্থকার সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্বজন হিতকর বলিয়া স্বীকার করিলেন ; কিন্তু দেশাচার ভয়ে জনসমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে বা তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতে পারিলেন না।"

অনেকে হয় ত স্বভাবতঃ মনে করিবেন যে, লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করিয়াই ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বেদান্তধর্ম্মাবলম্বী সংস্কারকদলের অগ্রণী হইলেন। কিন্তু তাহা নহে। ১৮৪৫ সালে, উমেশচন্দ্র সরকারের আন্দোলন উঠিলে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ একদিকে আপনার ধর্ম্মকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বর-বাণী বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, এবং অপর দিকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উভয় কার্য্য-নীতিই সত্যানুরাগী ডিরোজিও-শিষ্যদলের চক্ষে নিন্দনীয় বোধ হইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণের মুখে বেদের অভ্রান্ততাবাদ কপটতা বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের নিন্দা অনুদারতা বলিয়া প্রতীতি করিলেন, সুতরাং তিনি বেদান্তধর্ম্মীদিগের সহিত সংযুক্ত হইলেন না। সংযুক্ত হওয়া দূরে থাক তাঁহাদের পত্রিকা "তত্ত্ববোধিনী" লইতেও স্বীকৃত হইলেন না; এবং তাঁহাদের মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিলেন না। কেন তিনি ইঁহাদের প্রতি চটিয়াছিলেন তাহার কারণ উক্ত সময়ে ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত পত্রের নিম্নলিখিত অংশ হইতে জানা যাইবে।

১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই কৃষ্ণনগর হইতে তিনি কলিকাতাতে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে পত্র লিখিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবু তখন হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বর্ষের প্রারম্ভে ব্রাহ্মধর্ম্মে বা তদানীন্তন বেদান্তধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে যাতায়াত করিতেছেন ; এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহকারী হইবেন, এইরূপ প্রস্তাব চলিতেছে। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যদলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই যে রাজনারায়ণ বাবুর আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে।

MY DEAR RAJNARAIN,

I cannot think much of the Vedantic movements here or elsewhere. The followers of Vedanta temprorize. They do not believe that the religion is from God, but will not say so to their countrymen, who believe otherwise. Now, in my

humble opinion, we should never preach doctrines as true, in which we have no faith ourselves. I know that the subversion of idolatry is a consummation devoutly to be wished for, but I do not desire it by employing wrong means. I do not allow the principle that means justify the end. Let us follow the right path assured that it will ultimately promote the welfare of mankind. It can never do otherwise.

I wish to request the Secretary of the *Tuttobodhini Sabha* to discontinue sending me the Society's paper (Patrika), as a person cannot subscribe to it who is not a member of the Society. * * * I fear also that there is a spirit of hostility entertained by the Society against Christianity which is not creditable. Our desire should be to see truth triumph. Let the votaries of all religions appeal to the reason of their fellow-creatures and let him who has truth on his side prevail."

যে সরল সত্য-প্রিয়তার ও উদারতার নিদর্শন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে আমরা উত্তরকালে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোত্তমেও দেখিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের লোক যতদিন মুখে বলিয়া কার্য্যে তাহা না করিতেন, ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই,—উৎসাহ দিতেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত একীভূত হইতেন না। পরে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল দেখা দিলে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত যোগ দিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবে ও তাঁহার সংশ্রবে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর নিকটে যে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান মন্ত্র এই ছিল যে, মানবের চিন্তা ও কার্য্যকে স্বাধীন রাখিতে হইবে। হিন্দু কালেজ কমিটী কালেজের ছাত্রদিগকে ডফ্ ও ডিএলট্রির বক্তৃতা শুনিতে যাইতে নিষেধ করিলে ডিরোজিও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই ভাব তাঁহার শিষ্যদলের মনে চিরদিন পূর্ণমাত্রায় কার্য্য করিয়াছে। তাঁহারা চিরদিন মানবের স্বাধীনতাকে পবিত্র পদার্থ মনে করিয়া আসিয়াছিলেন; কোনও কারণেই তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের পূর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় কার্য্য করিতেছিল। তিনি শিক্ষকরূপে বালকদিগের মধ্যে বসিতেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদের সহিত বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। স্বীয় গুরু ডিরোজিওর

ন্যায় কোনও একটা বিষয়ে তর্ক তুলিয়া স্বাধীন ও অসংকুচিত ভাবে তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে দিতেন। নিজে পূর্ব্বপক্ষ লইয়া তাহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। কেবল যে মানবের চিন্তার স্বাধীনতাকে আদর করিতেন বলিয়া এইরূপ করিতেন, তাহা নহে, চিরজীবন তাঁহার এ প্রকার বাল-সুলভ বিনয় ছিল যে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি মনে করিতেন বালকের নিকটেও কিছু শিখিবার আছে। আমরা বয়সে তাঁহার পুত্রের সমান, অথচ অনেক সময় আমাদের একটি সামান্য মত বা উক্তি এরূপ সম্ভ্রমের সহিত শুনিতেন যে, আমাদের কথা কহিতে লজ্জা হইত। পূর্ব্বপুরুষগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যং" ভাল কথা বালকের মুখ হইতেও শুনিতে হইবে। লাহিড়ী মহাশয় কাজে তাহাই করিতেন। কোনও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া কোন্ বালক কি বলে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন; এবং কাহারও মুখে কোনও একটা ভাল কথা শুনিলে আনন্দিত হইয়া উঠিতেন। "একথা তুমি কোথায় পাইলে? এরূপ কথা তোমাকে কে শুনাইল!" বলিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। যদি শুনিতেন যে, সে নিজগৃহে গুরুজনের মুখে শুনিয়াছে, অমনি বলিতেন "হবে না, কিরূপ বংশের ছেলে।" চিরদিন বংশ-মর্য্যাদার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহা হউক এইরূপ স্বাধীন বিচারের ভাব প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক নবভাব দেখা দিল। তাহারা স্বাধীন ভাবে সমুদয় সামাজিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কৃষ্ণনগরে একটা বিষয়ের বিচার চলিতেছিল—তাহা বিধবা-বিবাহ। অনেকের সংস্কার আছে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্ব-প্রথমে বঙ্গসমাজে বিধবা বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যগণ যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটার" নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা বিধবা বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পণ্ডিতদ্বয় পশ্চাতে থাকিয়া ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া লেখকদিগের হস্তে দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। তাহার কোনও প্রকাশ নাই। তবে উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের যে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল, তাহা জ্ঞাত আছি। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি জীবনচরিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে,

১৮৪৩ সালে একবার রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় "লোটাস" নামক জাহাজে করিয়া কতিপয় বন্ধুসহ গঙ্গা পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু ও পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই কতিপয় বন্ধুর মধ্যে ছিলেন। অতএব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটারের লেকখগণের সাহায্য করা পণ্ডিতদ্বয়ের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।

তবেই দেখা যাইতেছে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত করা যে কর্তব্য এই বিশ্বাস ১৮৪৩ সাল হইতে চক্রবর্তী ফ্যাকশনের সভ্যগণের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া ছিল। তাঁহারা দশজনে একত্র হইলেই সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন, উৎসাহের সহিত সেই মত প্রচার করিতেন, চারিদিকে তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেন। ক্রমে এই মত কৃষ্ণনগরেও যায়।

রাজা শ্রীশচন্দ্র নিজে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আশা হইয়াছিল যে, পণ্ডিতগণকে লওয়াইয়া তিনি কাজে কিছু করিলেও করিতে পারেন। যে কারণে তিনি সে বিষয়ে নিরুদ্যম হন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতকার মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিতে গিয়া বলিতেছেন ;—

"রাজা বেদানুমোদিত পরব্রহ্মের আরাধনা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিধবা কামিনীদিগের অবস্থা একদিনের নিমিত্তও বিস্মৃত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এ-প্রদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা শাস্ত্রের সহায়তায় যতদূর হইবেক, কেবল যুক্তি অবলম্বন করিলে ততদূর হইবেক না ; একারণ, যদ্যপিও এদেশস্থ পণ্ডিতগণ বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত স্বীকার করিয়াও তাহার ব্যবস্থা দিতে অসম্মত হন, তথাপি রাজা এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। অবশেষে নবদ্বীপস্থ কয়েকজন পণ্ডিত পুরস্কার লাভাশয়ে ব্যবস্থা দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগরস্থ নব্যসম্প্রদায় সহসা এখানকার কালেজগৃহে এক সভা করিয়া স্বদেশের প্রচলিত রীতি নীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণান্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধবাদিগণ, নবমন্তাবলম্বীরা কালেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, তাহার মাংস ভোজন ও মদিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্ব্বত্র রটনা করিয়া দিলেন। এই অমূলক কথা দূর ও অদূরবর্ত্তী নানাস্থানে আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রথমে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় আপন স্বসম্পর্কীয় বালকগণের কালেজে যাওয়া রহিত করিলেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইলেন।

কালেজে এরূপ সভা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কালেজের অধ্যক্ষ তিরস্কৃত হইলেন। মহারাজ, যাহাতে কালেজের হানি না হয়, তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই উপরোক্ত জনরবের মূল বৃত্তান্ত প্রচলিত হইল এবং যে সকল বালক কালেজ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় কালেজে প্রবেশ করিল, কিন্তু নগর মধ্যে এক বিষম দলাদলি হইয়া উঠিল। যাহা হউক, মহারাজার আনুকূল্য প্রযুক্ত নব্যদল সবল থাকিল এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত গোল তিরোহিত হইল। রাজা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা এই গোলযোগে বিফল হইয়া গেল।"

ঐ কালেজগৃহে সভার পূর্ব্বে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যদলের ঐ গোখাদক অপবাদ প্রবল হল। সে ঘটনাটির বিবরণ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবন-চরিত হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"কলিকাতা হইতে বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন সুবিজ্ঞ সুহৃদ্বর কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তদীয় প্রীত্যর্থে তাঁহাকে লইয়া বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, তারিণীচরণ রায়, বামাচরণ চৌধুরী প্রভৃতি দশ বার জন আত্মীয় ও আমি কৃষ্ণনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন করিতে যাইতাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকায় নৌকায় আমাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অনুকূল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পরে কৃষ্ণনগর কালেজগৃহে এবিষয়ের জন্য একটি সভা হইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ কালেজের ও স্কুলের ছাত্র।"

"যে দিবস আমরা আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোনও হিংস্রক ও দুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, আমাদের বাটীর সন্নিহিত কোন স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে ও মাথাটি দেখিয়াই বোধ হয় যেন তাহা অস্ত্র দ্বারা ছেদিত হইয়াছে। কিঞ্চিত পরে রটনা করিল যে, কোনও ব্যক্তির এক গো-বৎস পাওয়া যাইতেছে না। পরদিবস কৃষ্ণনগরে কোন স্থানে বহুলোকের সমাগম দেখিয়া গো-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া কহিল যে, কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোজন জন্য এই গো-হত্যাটি হইয়াছে। নগর মধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল।"

আমি কৃষ্ণনগরের সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি ঐ গো-বৎস হত্যা বৃত্তান্তটি আনন্দবাগের বনভোজন সহিত সংযুক্ত করিবার আরও একটি

কারণ ছিল। যুবকদল বাস্তবিক একটি খাসী মারিয়াছিলেন এবং তাহার দেহটি একটি বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। একজন লোক দূর হইতে দোদুল্যমান প্রাণিদেহটি দেখিয়া আসে ও নগরমধ্যে গো-বৎস হত্যা বিবরণ প্রচার করে, তারপর দেওয়ানজীর উল্লিখিত পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি তাহাতে সাক্ষ্যযোগ করে। উভয় সাক্ষ্যে মিলাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে আর বিলম্ব হইল না। সকলেই অনুমান করিতে পারেন, ইহাতে যুবকদলের প্রতি কি ঘোর নির্য্যাতন উপস্থিত হইল।

অনুমান করি পূর্ব্বোক্ত গোহত্যার আন্দোলন ও বিধবা-বিবাহের সভা ১৮৫০ সালের অবসানে বা ১৮৫১ সালের প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকিবে এবং সেই আন্দোলনেই লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগর বাস ক্লেশকর করিয়া তুলে। একদিকে সামাজিক নির্য্যাতন অপরদিকে বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয়স্বজনের মানসিক অশান্তি এই উভয়বিধ কারণে তাঁহার চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিল। ১৮৪৮ কি ১৮৪৯ সালে তাঁহার যে প্রথম পুত্রটি জন্মিয়াছিল, সেটি এই সময়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া মারা গেল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে খাট হইতে পড়িয়া মস্তকে আঘাত লাগিয়াছিল। ৩।৪ দিবস নানা প্রকার চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয় নাই; শেষে তাহার প্রাণ যায়। তাহাতে আত্মীয় স্বজন বিধাতার অভিসম্পাত বলিয়া তাঁহার বালিকা পত্নীকে অস্থির করিয়া তুলেন। এই সকল কারণে ১৮৫১ সালের মার্চ্চ মাসে বদলীর প্রার্থনা করিয়া তিনি বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া যান। পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে দেড়শত টাকা বেতনের হেডমাষ্টার হইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। তাঁহার প্রিয় বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক তখন বর্দ্ধমানে ডেপুটী কালেক্টরী কাজ করিতেছিলেন, তাহাও তাঁহার বর্দ্ধমানে বদলী হইবার অন্যতম কারণ হইয়া থাকিবে।

যখন কৃষ্ণনগরে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকল ঘটিতেছিল, তখন কলিকাতাতে একটি নূতন কার্য্যের সূত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ বা বেথুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। বীটন্ সাহেব ইংলণ্ডের স্যালফোর্ড নামক স্থান-নিবাসী কর্ণেল জন ড্রিঙ্কওয়াটারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্ণেল ড্রিঙ্কওয়াটার জিব্রাল্টার দুর্গের অবরোধের ইতিবৃত্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বীটন যৌবনে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া র‍্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের কাউন্সিলের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে তিনি গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবরূপে এদেশে প্রেরিত হন। তিনি বড় মাতৃভক্ত লোক ছিলেন; এবং এইরূপ কথিত আছে যে, মাতৃভক্তিই তাঁহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা সমুৎপন্ন করিয়াছিল।

তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার স্বভাব-সুলভ সদাশয়তার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। এই পণ্ডিতদ্বয়ের সাহায্যে ও দেশের ভদ্রলোকদিগের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে দিবসে তন্নাম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বীটন এই কার্য্যে দেহ-মনঃপ্রাণ নিয়োগ করেন; হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া মাতিয়াছিলেন, বীটন তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া একেবারে মাতিয়া যান। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন; আসিবার সময় বালিকাদিগের জন্য নানা উপহার লইয়া আসিতেন; মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন; কখন কখনও চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়া খেলা করিতেন। বলিতে কি যে সকল উদারমতি মানব-হিতৈষী ইংরাজ পুরুষের নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, এই মহাত্মা তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি নিজের নাম বঙ্গবাসীদিগের স্মৃতি ফলকে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত ইতিবৃত্তে ইঁহার নাম চিরদিন উজ্জ্বল তারকার ন্যায় থাকিবে।

কিন্তু ১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়া যেন কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি :—

১৮১৮ সালে স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা? এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটীর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন এবং স্কুল সোসাইটীর অধীনস্থ কোন কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। সম্বৎসর পরে তাঁহার ভবনে স্কুল সোসাইটীর পাঠশালা সকলের বালকদিগের যখন পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইত, তখন বালকদিগের সহিত বালিকারাও আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত।

এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল না। এই বিষয়ে যে বিচার উপস্থিত হইল, তাহার ফলস্বরূপ ১৮১৯ সালে বাপ্তিস্ত মিশন সোসাইটীর

একজন সভ্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দ্দশা ও শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন [illegible] এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া Mr. Lowson and Pearce's Seminary নামক তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের মহিলাগণ একত্র হইয়া ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য এক সভা স্থাপন করিলেন, তাহার নাম হইল—"Female Juvenile Society"। এই সভার মহিলা সভ্যগণ কলিকাতার নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব ইঁহাদের উৎসাহ-দাতা হইলেন, এবং তিনে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটীর কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলণ্ডের British and Foreign School Society-র সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুমারী কুক (Miss Cooke) নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। কুমারী কুক ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, স্কুল সোসাইটীর সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত সভা তাঁহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অসমর্থ। এই বিপদে চর্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর সভ্যগণ অগ্রসর হইয়া কুমারী কুকের ভার গ্রহণ করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত স্বীয় অবলম্বিত কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি কর্মারম্ভে ভারতবর্ষে [illegible] বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ করিলেন। যখন মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন, তখন একদিন শিশুদের [illegible] [illegible] পাঠশালাতে গিয়া দেখেন একটি [illegible] চাহিয়া [illegible] দিতেছে, গুরুমহাশয় [illegible] বালকদিগের [illegible] [illegible] না। অনুসন্ধানে জানিলেন যে বালিকাটির ভ্রাতা ঐ পাঠশালে পড়ে, [illegible] বালিকাটি স্বীয় ভ্রাতার সহিত [illegible] গুরু মহাশয়কে [illegible] [illegible] করিতেছে। কুমারী কুক সেই বালিকার [illegible] পাড়ার [illegible] মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন। অনেক কথোপকথনের পর সেই পাড়াতে বালিকাবিদ্যালয় খোলা স্থির হইল। অল্পদিনের মধ্যে [illegible] স্থানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ন্যূনাধিক ২৭৭টি বালিকা শিক্ষা করিতে লাগিল। কুমারী কুক দুই বৎসর এই ভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি (Mr. Wilson) উইলসন নামক একজন মিশনারী সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রত রহিলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় সময় দিতে পারিতেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাজ-মহিলা সমবেত হইয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নী লেডী আমহার্ষ্টকে আপনাদের অধিনেত্রী

করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটী (Bengal Ladies' Society) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার মহিলাসভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যে ইঁহারা সহরের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ মহাসমারোহে গৃহের ভিত্তিস্থাপন পূর্ব্বক গৃহনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ গৃহ নির্ম্মাণকার্য্যের সাহায্যার্থ রাজা-বৈদ্যনাথ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটি বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিল। অমন কি ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকাবিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি লেডীস্ সোসাইটির সভ্য মহোদয়াগণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল।

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন বীটন সাহেব সর্ব্বপ্রথমে করেন। সে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয়; তাহার বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। বীটনের বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই বারাসাত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মফঃস্বলেরও অনেক স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন লইয়া কলিকাতার হিন্দু-সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্যাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদগণ স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষা লইয়া সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত, এবং সুকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল—"এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি

থাকবে না।” নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন ;—“বাপ্‌রে বাপ্‌ মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক “আন” শিখাইয়াই রক্ষা নাই। চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে!” লোকে শুনিয়া হা হা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল। বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বর গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন :—

“যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে ;
আর কিছু দিন থাকরে ভাই। পাবেই পাবে দেখ্‌তে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।”

বীটনের বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে যেমন সমাজমধ্যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং বীটন দেশীয় শিক্ষিতদলের প্রিয় হইলেন, তেমনি রাজনীতি বিষয়ে এক মহা আন্দোলন উঠিল, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। এই আন্দোলন অনেক পরিমাণে পরবর্ত্তী সময়ের ইলবার্টবিলের আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। ঐ আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক।

১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গাল', বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কার্য্যের ভার ইংরাজদিগের প্রতি অর্পিত হইলে, বহু বৎসর ধরিয়া ফৌজদারী কার্য্যের ভার মুসলমান নবাবের হস্তেই ছিল। ইহাতে রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। ক্রমে সে নিয়ম রহিত হইয়া বিচারকার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য কলিকাতাতে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়, এবং দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নানা স্থানে ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। মফস্বলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু মফস্বলবাসী ইংরাজগণকে তাহার অধীন করা হইল না। তাঁহারা নামতঃ সুপ্রিমকোর্টের এলাকাধীন রহিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ নিরঙ্কুশ হইয়া রহিলেন। ইহার ফল কি হইল সকলেই তাহা অবগত আছেন। মফস্বলবাসী ইংরাজগণের অত্যাচার প্রজাকুলের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জিলাতে নীলকরগণ যথেচ্ছাচারী দুর্দ্দান্ত রাজার ন্যায় হইয়া উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবারণের উপায় রহিল না। অত্যাচারী ইংরাজগণ আপনাদিগকে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের বাহিরে রাখিয়া, সুপ্রিমকোর্টের দোহাই দিয়া, স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৮৪৯ সালের পূর্ব্বে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের ও কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই অনিষ্টকর নিয়ম রহিত করিবার জন্য নূতন রাজবিধি প্রণয়নের পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

তদনুসারে তৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব বীটন সাহেব চারিখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

1. **Draft of an Act abolishing exemption from the jurisdiction of the East India Company's criminal courts.**

2. **Draft of an Act declaring the privileges of Her Majesty's European subjects.**

3. **Draft of an Act for the protection of judicial officers**

4. **Draft of an Act for trial by jury in the Company courts.**

পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন তদানীন্তন ইংরাজগণ যে কেবল এদেশবাসী অসহায় কৃষ্ণবর্ণ প্রজাকুলের প্রতিই অত্যাচার করিতেন তাহা নহে তাঁহাদের অত্যাচার হইতে কোম্পানির জুডিশিয়াল অফিসারদিগকেও বাঁচান আবশ্যক হইয়াছিল।

যাহা হউক এই চারিটি আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থিত হইবা মাত্র এদেশবাসী ইংরাজগণ ইহাদের (Black Acts) "কালা আইন" নাম দিয়া, তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন তাঁহাদের সম্পাদিত সংবাদ-পত্র সকলে ঐ চারি আইন প্রণেতাদিগের প্রতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ চলিতে লাগিল। বীটন তাঁহাদের উপহাস, বিদ্রূপ ও আক্রোশের লক্ষ্যস্থলে পড়িলেন। ইংরাজগণ কলিকাতাতে এক মহাসভা করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিকট আবেদন করা স্থির করিলেন; এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে ঐ আন্দোলন চালাইবার জন্য কতিপয় দিবসের মধ্যে ছয়ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন।

আন্দোলনে দেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এদেশীয়দিগের পক্ষ হইয়া বলিবার কেহই ছিল না। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বলিতে পারে এমন সংবাদ-পত্রই ছিল না। এদেশীয়গণ নীরবে বাদ-বিতণ্ডা শুনিতে লাগিলেন; এবং সদাশয় রাজপুরুষগণের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কেবল একমাত্র রামগোপাল ঘোষ উক্ত আইনগুলির পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার বিবরণ রামগোপালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে দেওয়া গিয়াছে।

অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজগণের অভীষ্টই পূর্ণ হইল। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইনগুলি ব্যবস্থাপক সভা হইতে অপসারিত হইল। মফস্বলবাসী ইংরাজগণ আরও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে শত শত প্রজার প্রাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল।

অতিরিক্ত শ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা ও এই সকল আন্দোলন জনিত উত্তেজনাতে মহাত্মা বীটনের আয়ু সংকীর্ণ করিয়া আনিল। তিনি ১৮৫১

সালের ১২ আগষ্ট ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ নূতন সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাহিত রহিয়াছে।

কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন; যে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল; মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন; কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। একতা ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপরে দেখিলেন। ইংরাজগণ তাঁহাদের চীৎকার-ধ্বনিতে কিরূপে ভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬ হাজার টাকা তুলিলেন, এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর ন্যায় তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল। রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদিগের অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদ করাতে এগ্রি-হর্টিকালচরল সোসাইটীতে কিরূপে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইল তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিলেন। এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক। সে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে দুইটি সভা ছিল; প্রথমটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Bengal Landholders' Association বা বঙ্গদেশীয় জমিদার সভা। কলিকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি ইহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহা এক প্রকার মৃত্যু দশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় সভাটির উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি, তাহা জর্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্যবঙ্গের "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী"। এরূপ প্রশ্ন উঠিল, উভয় সভাকে মিলিত করা যায় কি না? রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে ঐ সম্মিলন কার্য্য সমাধা হইল। ১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর এক সাধারণ সভা আহূত হইয়া, উক্ত উভয় সভা সম্মিলিত করিয়া বর্ত্তমান "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" স্থাপিত হইল। তাহার প্রথম কমিটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে ঐ সভার উদ্যোগকারিগণ কিরূপ সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উক্ত সভার প্রথম কমিটীভুক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

রাজা রাধাকান্ত দেব—সভাপতি।	রাজা কালীকৃষ্ণ দেব—সহ সভাপতি।
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল।	বাবু হরকুমার ঠাকুর।
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	বাবু রমানাথ ঠাকুর।
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।	বাবু আশুতোষ দেব।
বাবু হরিমোহন সেন।	বাবু রামগোপাল ঘোষ।
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত—(রামবাগান)	বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।	বাবু প্যারী চাঁদ মিত্র।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সম্পাদক।
বাবু দিগম্বর মিত্র—সহ সম্পাদক।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা এই যুগের একটি প্রধান ঘটনা। সভাটি স্থাপিত হইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনাদের অভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য এবং দেশীয়গণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা তিরোহিত হইতে লাগিল। দেশের লোকেও জানিল, তাহাদের হইয়া বলিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভার দিকে আকৃষ্ট হইল। লোকে আশার নয়নে ইহাকে দেখিতে লাগিল। একথা এখানে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সে সময়ে সে আশা প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছেন। যখন দেশের লোকের হইয়া বলিবার কেহই ছিল না, তখন তাঁহারাই একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন। লোকের হইয়া বলিবার ও তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ রাজকীয় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারাই একমাত্র শক্তি ছিলেন। সুতরাং এই সভার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বশ্রেণীর মনে হর্ষ ও আশার সঞ্চার করিল।

১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্দ্ধমানে গেলেন বটে, কিন্তু সেখানেও বহুদিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার উপবীত পরিত্যাগের গোলোযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে দুই প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথম,—তিনি কৃষ্ণনগরের বাটীতে তাঁহার জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন, এমন সময় একটি বালক দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল,—"এদিকে ত বলা হয় কিছু মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্ত্তে বসা হয়েছে, পৈতাটী বেশ ঝুল্‌চে, বামনাই দেখান হচ্ছে।" এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাইলেন। ঐ বালকের বাক্যগুলি তাঁহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কার্য্যের একতা যাঁহার জীবনের মহামন্ত্র ছিল, তাঁহার পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি ক্লেশকর হইবার সম্ভাবনা! এই ঘটনা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প তাঁহার মনে উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়;—১৮৫১ সালের পূজার ছুটীর সময় লাহিড়ী মহাশয় নৌকাযোগে কতিপয় বন্ধুসহ গাজিপুরে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোষ তখন গাজিপুরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, তাঁহারা গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে নৌকার মাল্লাদিগের দ্বারাই পাকাদি কার্য্য করাইয়া আহারাদি

চলিতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়া বলিলেন—"এদিকে ত মাল্লাদের হাতে খাইতেছি, অথচ পৈতাটা রাখিয়া ব্রহ্মণ্য দেখাইতেছি, কি ভণ্ডামিই করিতেছি!" বাক্যগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত হইল বটে, কিন্তু তাহা লাহিড়ী মহাশয়ের চিত্তে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। তিনি তৎপূর্ব্বে আপনার উপবীতটি নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আর গ্রহণ করিলেন না।

উভয় বিবরণের মধ্যে কোনও বিবাদ দৃষ্ট হইতেছে না। ইহা সম্ভব যে গাজিপুর যাত্রার পূর্ব্বে তিনি জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে পূর্ব্বোক্ত বালকটির বিদ্রুপোক্তি শুনিতে পান। তাহা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প তাঁহার অন্তরে উদিত হয়। তৎপরে গাজিপুর যাত্রাকালের ঘটনাটি ঘটে, তাহাতে সেই সংকল্পকে দৃঢ়ীভূত করে। এরূপ একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন যে একদিনে ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তাহা জীবনের অনেক দিনের সংগ্রামের ফল। আরও অনেকের জীবনে এই প্রকার ভাবেই এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং ইঁহার জীবনেও সেই প্রকার ঘটিয়া থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যাহা হউক তিনি যখন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দুসমাজের লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল; দাসদাসীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিশু, তৎপূর্ব্ব চৈত্র মাসে কলিকাতা সহরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। সেই শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার তাঁহার বালিকা পত্নীর উপরে পড়িয়া গেল। যিনি অপরের ক্লেশ একটু সহিতে পারিতেন না, সেই লাহিড়ী মহাশয় যে স্বীয় পত্নীর ক্লেশ দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি জল বহা, কাঠ কাটা, বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমুদয় কাজ নিজেই নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে এক দিনের জন্য ক্লান্তি বোধ করিতেন না; অথবা লোকের প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। শ্রমের অন্ন সুখেই আহার করিতেন; এবং অহরহঃ স্বকর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। কিন্তু লোকের নির্য্যাতনের সমুদয় ভার বিশেষ ভাবে তাঁহার পত্নীর উপরেই পড়িত। পাড়ার অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের অবজ্ঞাসূচক বাক্যে ও আত্মীয় স্বজনের আর্ত্তনাদে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাঁহার মনস্তাপ দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুণ্ণচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় ঘরে বাহিরে যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ওদিকে কৃষ্ণনগরে এই উপবীত-ত্যাগের কথা প্রচারিত হইয়া সেখানেও মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। সেখানে

সমাজের লোক রামতনু বাবুকে হাতের কাছে না পাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সাধু রামকৃষ্ণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। বিনা অপরাধে তাঁহাকেও অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইল। তাঁহার স্বভাব-নিহিত ধর্ম্মানুরাগবশতঃ তিনি উগ্রভাব ধারণ করিলেন না; পুত্রকে শাস্তি দিবার পরামর্শ করিলেন না; বা তাঁহার প্রতি বল-প্রয়োগের অভিসন্ধি করিলেন না; কিন্তু মরমে মরিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। বহুদিন পরে লাহিড়ী মহাশয় যখন আমাদের নিকট তাঁহার পিতার এই সময়কার ভাবের বর্ণনা করিলেন তখন দর দর ধারে দুই চক্ষে জলধারা বহিল। বস্তুতঃ বলিতে কি আমরা তাঁহাতে একসঙ্গে পিতৃভক্তি ও নিজের বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার সাহস উভয় যে প্রকার সম্মিলিত দেখিয়াছি তাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

বর্দ্ধমানের আন্দোলন বশতঃই হউক অথবা শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্ত বশতঃই হউক একবৎসরের অধিক কাল তিনি বর্দ্ধমানে থাকেন নাই। ১৮৫২ সালে তিনি বালি-উত্তরপাড়ার ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আসিলেন।

উত্তরপাড়াতে আসিয়া তাঁহার সামাজিক নির্য্যাতনের ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। তাঁহার কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ পাচক ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন, কাল পলাইয়া গেল। তিনি আবার পাচক যোগাড় করিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যের পর ভৃত্য পলাইতে লাগিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার পাঠাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন গার্হস্থ্য সামগ্রী সকল কলিকাতাতে ক্রয় করিয়া নৌকাযোগে প্রেরণ করিতেন; বন্ধুকে কোন অভাব অনুভব করিতে দিতেন না। এইরূপে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার কাটিয়া যাইত। উপবীত পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিলেন তখন হিন্দুসমাজের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার শিক্ষিত বন্ধুদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সেরূপ পরামর্শের প্রতি কোনও দিন কর্ণপাত করেন নাই।

লাহিড়ী মহাশয় যখন উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন কলিকাতা সমাজের নব অভ্যুদয়ের দিন। তখন চারিদিকে ইংরাজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে উদীয়মান শক্তিরূপে উঠিতেছে; এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত করিতেছেন। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে সুললিত বাঙ্গালা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়।

তৎপরে তিনি ১৮৪৮ সালে "বাঙ্গালার ইতিহাস," ১৮৫০ সালে "জীবনচরিত" ও ১৮৫১ সালে "বোধোদয়" মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ১৮৫১ সালে ও ১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের এক নবযুগের অবতারণা হইল। বিশেষতঃ "বাহ্যবস্তুর" প্রচার যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবকে উদ্দীপ্ত করে। ইহার প্ররোচনাতে অনেকে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন এবং সামাজিক নীতি ও চরিত্র সম্বন্ধে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এ সময়ে বঙ্গসমাজের নেতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন।

অক্ষয় কুমার দত্ত

ইং ১৮২০ সালের ১লা শ্রাবণ দিবসে নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। ইঁহার পিতা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার সপ্তম বর্ষ বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে বিদ্যারম্ভ করেন। তৎপরে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি খিদিরপুরে নীত হন। সেখানে ইঁহার পিতা ও পিতৃব্যপুত্রগণ তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে ইঁহাকে পারসী ভাষাতে সুশিক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু শিশু অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য অত্যধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অভিভাবকগণ প্রথমে কতিপয় ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ আত্মীয়কে অনুরোধ উপরোধ করিয়া উক্ত ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। তাহাতে তিনি আশানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন। অমূল্য সময় চলিয়া যাইতে লাগিল, অথচ পাঠে অল্পই উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বালক অক্ষয়কুমার ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ছিঁড়িয়া পড়িলেন; এবং খিদিরপুরে খ্রীষ্টীয় মিশনারিদিগের একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহাতে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। ইহাতে তাঁহার অভিভাবকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতাতে রাখিয়া গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি" নামক স্কুলে ভর্ত্তি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইবে।

স্কুলে পদার্পণ করিয়াই দত্তজ মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে আশ্চর্য্য অভিনিবেশ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞানের বুভুক্ষা যেন কিছুতেই মিটিত না। স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ ভিন্ন যেখানে যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হাতে পাইতেন,

অতৃপ্ত ক্ষুধার সহিত তাহার উপরে পড়িতেন এবং তাহাকে অধিগত না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না।

পরিতাপের বিষয় এই, অচিরকালের মধ্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে ইঁহাকে লেখা পড়া ছাড়িতে হইল। আড়াই বৎসর কি তিন বৎসরের অধিক কাল বিদ্যালয়ে থাকিতে পারেন নাই। তৎপরে একদিকে যেমন আরাধ্যা জননীদেবীর ভরণপোষণার্থে অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা ও তজ্জনিত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, অপর দিকে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন চেষ্টা, দুই এক সঙ্গে চলিল। বাস্তবিক কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিয়া তিনি জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সময়ে তিনি যে যে বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা একটি। তিনি একাগ্রতার সহিত কতিপয় পণ্ডিতের নিকট পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৎপরে কিছুদিন বহু দারিদ্র্যভোগ করিয়া ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতা কার্য্য লাভ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তত্ত্ববোধিনী-সভার অধিবেশনে লইয়া যান এবং তাঁহারই উৎসাহে তিনি উক্ত সভার সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকরূপে তিনি প্রথম মাসে ৮৲ তৃতীয় মাসে ১০৲ ও তৎপরে ১৪৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইতেন। তদনন্তর ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই তত্ত্ববোধিনীর সংশ্রবই তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল কারণ হইল। এতদ্দ্বারা এক দিকে যেমন তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইল, অপর দিকে তেমনি প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার তাঁহার নিকটে উন্মুক্ত হইল। এই সময়ে তিনি কিছুদিন মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা, রাসায়নবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্যে ভূরি ভূরি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে যে মানুষ যে কার্য্যের উপযোগী যেন তাঁহার হস্তে সেই কার্য্যই আসিল। তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না। "রসরাজ," "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও "প্রভাকর" ও "ভাস্করের" ন্যায় ভদ্র ও

শিক্ষিত সমাজের জন্ম লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন—"রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ," বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।

১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত অক্ষয় বাবু দক্ষতা সহকারে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে অর্থোপার্জ্জনের কত উপায় তাঁহার হস্তের নিকট আসিয়াছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। এই কার্য্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক এক দিন জ্ঞানালোচনাতে ও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তিনি তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না।

এই কালের মধ্যে অক্ষয় বাবু আর একটি মহৎ কার্য্য সংসাধন করিয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহার নাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রকৃতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতেন না। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না, করিলে শীঘ্র ছাড়িতেন না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীক্ষার পর কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেন; এবং একবার যাহা নির্ণীত হইত তাহা হইতে সহজে বিচলিত হইতেন না। সুতরাং তাঁহাকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয় বাবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয় বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সাহায্যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক গ্রন্থ সংকলিত হইল; ইহা চিরদিন মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের পরিণত ফল স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ১৮৫২ সালের কথা কহিতেছি, তখনও এই মহা পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজকে ও সমগ্র বঙ্গদেশকে আন্দোলিত করিতেছে। তখনও দত্তজ মহাশয় স্বীয় মতের জয় দেখিয়া মহোৎসাহে উদার, আধ্যাত্মিক, একেশ্বরবাদের মহানিনাদে তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ সকলকে পূর্ণ করিতেছেন।

ইহার পরেও অক্ষয় বাবু কয়েক বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন।

মধ্যে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রিয় তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৫ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পর এক দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল বটে, কিন্তু দুই দিবস পরে একদিন তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন সময়ে মস্তিষ্কের এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব জ্বালা হওয়ায় লেখনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই।

আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা! আশ্চর্য্য কার্য্যশক্তি! ইহার পর এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অধিক কি তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সংকলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তিনি প্রাতঃকালে, স্বল্পক্ষণ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন এক ঘণ্টা কোনও দিন দেড় ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূপ করিয়া এ সকল মহাগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল।

জীবনের অবসান কালে তিনি বালি গ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উদ্যানবাটিতে থাকিয়া এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন, এবং অবশিষ্ট কাল উদ্ভিদ-তত্ত্বের আলোচনা ও নানা গ্রন্থ বা জাতিদিগের সাহিত্য জ্ঞানানুশীলনে কাটাইতেন। সেখানে বাংলা ১২৯৩ সাল ও ইং ১৮৮৬ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার দেহান্ত হয়।

যে বৎসর ১৮৫২ সালে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়াতে প্রেরিত হইলেন, সেই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের স্থাপন, বেথুন কলেজের বিকাশ, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতির অভ্যুদয় ও ব্রাহ্মসমাজের মত-বিবাদ, দেবসমাজ, এই সকলই যে বঙ্গসমাজকে আন্দোলিত করিতেছিল তাহা নহে, অপর একটি বিশেষ কারণে তখন কলিকাতা সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ও যে শক্তিশালী পুরুষ তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনেরও কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

হীরা বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাতা সহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরা সহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছিল। অনুমান করি ১৮৫২ সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে হীরা আপনার একটি পুত্রকে, (নিজ গর্ভজাত কি পালিত তাহা জানি না,) তদানীন্তন হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দুসন্তান বলিয়া কালেজে ভর্ত্তি করা হইবে কি না, এই বিচার উঠে। এরূপ শুনিতে পাই, তাহাকে ভর্ত্তি করা হইবে কি না এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও

হিন্দুকালেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মতভেদ ঘটে। সেই মতভেদ সত্ত্বেও বালকটিকে ভর্ত্তি করাতে সমগ্র দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত-পরিবারের সুবিখ্যাত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারম্ভে, হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ নামে এক কালেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরীয়াপটীর সুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে এই কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেথুন সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে ঐ কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

কাপ্তেন সাহেব বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগের কর্ণেল ডি. টি. রিচার্ডসনের পুত্র। তিনি ১৮১৯ সালে বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮২২ সালে তিনি একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন এবং কবিত্বখ্যাতি লাভ করেন। ১৮২৪ সালে স্বাস্থ্যের জন্য ইংলণ্ডে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৎপর বৎসর আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন; তাহাতে দেশে বিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি বাহির হয়। ১৮২৯ সালে বিলাতে থাকিয়া তিনি মাসিক পত্রিকাদি সম্পাদন দ্বারা আরও খ্যাতিলাভ করেন। তৎপরে এদেশে আগমন করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি হিন্দুকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। [illegible] ভারতীয় [illegible] পাঠোপযোগী [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] তাঁহারা [illegible] ভুলিতে [illegible] কাপ্তেন [illegible] [illegible] লইয়া [illegible] একটি [illegible] ছিল, তিনি বড় বাবু ছিলেন, [illegible] [illegible] ছিলেন। ইহার ফল স্বরূপ [illegible] হইয়া [illegible] ছিলেন। [illegible] কারণে এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি [illegible] বেথুনের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। বেথুন তাঁহাকে [illegible] হইতে পদচ্যুত করেন, কাপ্তেন সাহেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

যাহা হউক কাপ্তেন সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া মহা সমারোহে হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজের কার্য্যারম্ভ হয়। এই কালেজ কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল; কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালে ইহা কলিকাতাস্থ হিন্দুসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি পরবর্ত্তী সময়ে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহার ছাত্রদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে রাজেন্দ্র দত্ত বা কলিকাতাবাসীর সুপরিচিত "রাজা বাবু" এই কার্য্যের প্রধান সারথি ছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

রাজেন্দ্র দত্ত

রাজেন্দ্র দত্ত সুপ্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের পরিবারে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ইঁহার পিতা পার্ব্বতীচরণ দত্তের পরলোক হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাচরণ দত্ত তাঁহার অভিভাবক হন। দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয় তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে ড্রমণ্ড সাহেবের স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ একাডেমিতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সেখানে কিছুদিন পড়িয়া তিনি হিন্দুকালেজে যান। সেখানে গিয়া রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সমাধ্যায়ী ডিরোজিও শিষ্যদলের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন মেডিকেল কালেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে সেখানকার উপদেশাদি শ্রবণ করেন। সেই সময় হইতেই ইঁহার চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়; এবং বোধ হয় মনে মনে এই সংকল্পও জন্মে যে, চিকিৎসার দ্বারা লোকের দুঃখহরণরূপ পরোপকারব্রতে আপনাকে অর্পণ করিবেন। বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদিন সওদাগর আফিসে বেনীয়ানের কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট কর্ত্তব্যপথ হইতে কিছুতেই ইঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এই সময়ে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সমবেত হইয়া স্বীয় ভবনে একটি এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া দীন দরিদ্রের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করেন। সে সময়ের লোকেরা বলেন এই কার্য্য দ্বারা তিনি সহরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বহুলপ্রচার করিয়াছিলেন।

এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে কয়েকজন সুবিখ্যাত ইউরোপীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এদেশে আসিলেন। তন্মধ্যে Dr. Tonnere অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজা বাবু Dr. Tonnere কে সহরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানাধীনে একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্থাপন করিয়া বিধিমতে হোমিওপ্যাথির প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই হাসপাতালটি বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু রাজা বাবু তাহাতে ভগ্নোদ্যম হন নাই। শুনিতে পাই তাঁহারই চেষ্টাতে ও তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরালের সহায়তায় Dr. Tonnere কলিকাতা সহরের প্রথম হেলথ্ অফিসার নিযুক্ত হন।

হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করিতে গিয়া তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে, এই চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা তিনি দরিদ্রজনের বিশেষ উপকার করিতে পারিবেন। এই সংস্কার চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তিনি সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন।

যে কারণে ও যেরূপে তিনি মেট্রপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রসর

হইয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বর্ণনা করিয়াছি। বলা বাহুল্য সেজন্য তাঁহাকে অনেক অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই, গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, হিন্দুকালেজের স্কুল বিভাগে হিন্দুসন্তান ভিন্ন অন্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু কালেজবিভাগের দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তদনন্তর হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজের স্বতন্ত্র সত্তার কারণ চলিয়া যায় এবং তাহা কয়েক বৎসর মধ্যেই বিলুপ্ত হয়।

রাজা বাবু শেষ দশায় Dr. Berigny-র সহায় হইয়া হোমিওপ্যাথির প্রচারে ও পরোপকারে প্রাণ-মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। দিনে নিশীথে রোগশয্যার পার্শ্বে যাইবার জন্য কেহ ডাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইতেন, এবং দিনের পর দিন বিনা ভিজিটে, অনেক সময় নিজ ব্যয়ে দিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেক বার তাঁহার গাড়িতে, তাঁহার সঙ্গে রোগী দেখিতে গিয়াছি ও তিনি যেরূপ একাগ্রতার সহিত চিকিৎসা করিতেন তাহা দেখিয়াছি। রোগীকে বাঁচাইবার জন্য সে ব্যগ্রতা, পরিবার পরিজনের সঙ্গে সেই সমদুঃখসুখতা আর দেখিব না। এইরূপ পরোপকার ব্রতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৮৯ সালের জুন মাসে তিনি দেহধাম পরিত্যাগ করেন।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের অবসান হয়। সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারদিগের ১৮৫৪ সালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পত্র। উক্ত সালে ইংলণ্ড হইতে এদেশে এক আদেশ পত্র আসে; এরূপ শোনা যায় ঐ আদেশ পত্র রচনা বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হস্ত ছিল। এ পত্রে ডাইরেক্টারগণ ভারতের গবর্ণর জেনারেলকে তাঁহাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দেশ করেন, এবং এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। (১) শিক্ষা বিভাগ নামে রাজকার্য্যের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংগঠন, (২) কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, (৩) স্থানে স্থানে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন, (৪) ইংরাজী গবর্ণমেণ্ট-স্থাপিত স্কুল ও কালেজগুলির সংখ্যা ও উৎকর্ষ বর্দ্ধন, (৫) মডেল নামে এক নূতন শ্রেণীর স্কুল স্থাপন, (৬) বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও বাঙ্গালা শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, (৭) প্রজাদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহায্য-দান প্রথা প্রবর্ত্তন। ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ মহারাণীর হস্তে আসিলে যখন ষ্টেট সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল তখন ডিরেক্টারগণের অবলম্বিত পূর্ব্বোক্ত প্রণালীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই উভয় পত্রকে এদেশীয় শিক্ষাকার্য্যের সুদৃঢ় ভিত্তি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

১৮৫৫ সাল হইতেই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রণালীর ফল দৃষ্ট হইতে লাগিল।

১২

১৮৫৫-৫৬ সালে একজন ডিরেক্টারের অধীনে শিক্ষা বিভাগ নামে রাজকার্য্যের এক বিভাগ সংগঠন করা হইল, স্কুল সকল পরিদর্শনের জন্য একদল ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন, স্থানে স্থানে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইল, গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য পাইয়া নানাস্থানে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল সকল দেখা দিতে লাগিল, এবং গ্রামে গ্রামে মিডল স্কুল ও বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল।

এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুলে একাগ্রতার সহিত স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। সে সময়ে যাহারা তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তাহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার পড়াইবার রীতি বড় চমৎকার ছিল। তিনি বৎসরের মধ্যে পাঠ্যগ্রন্থের সমগ্র পড়াইয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু যেটুক পড়াইতেন, সেটুকুতে ছাত্রগণকে এরূপ ব্যুৎপন্ন করিয়া দিতেন যে, তাহার গুণে পরীক্ষাকালে ছাত্রগণ সন্তোষজনক ফল লাভ করিত। ফলতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় যোগান অপেক্ষা জ্ঞান-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করার দিকে তাঁহার অধিক যত্ন ছিল। বিশেষতঃ যখন ধর্ম্ম বা নীতি বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবার অবসর আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। নীতির উপদেশটি ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার পশ্চাতে তাঁহার প্রেম ও উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার জ্বলন্ত সত্যনিষ্ঠা-পূর্ণ জীবন থাকিত, সুতরাং তাঁহার উপদেশ আগুনের গোলার ন্যায় ছাত্রগণের হৃদয়ে পড়িয়া সুমহৎ আকাঙ্ক্ষার উদয় করিত। এই সময়ে যাহারা তাঁহার নিকটে পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেদিনের কথা কখনই ভুলিতে পারেন নাই।

লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাঁহার লীলাবতী ও ইন্দুমতী নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ১৮৫৪ সালে লীলাবতী ভূমিষ্ঠা হয়, ১৮৫৬ সালে ইন্দুমতীর জন্ম হয়। এখানে যে অল্পকাল ছিলেন তন্মধ্যে তিনি ছাত্রগণের কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ঐ স্কুলে তাঁহার স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য তাঁহার অনুরক্ত ছাত্রগণ বহুবৎসর পরে উক্ত স্কুলগৃহে যে প্রস্তরফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"THIS TABLET TO THE MEMORY OF

BABU RAMTONOO LAHIRI

is put up by his surviving Utterpara School pupils
as a token of the love, gratitude, and veneration
that he inspired in them, while head master of the
Utterpara school from 1852 to 1856, by his loving
care for them, by his sound method of instruction,
which aimed less at the mere impartation of knowledge
than at that supreme end of all education,
the healthy stimulation of the intellect, the emotions,
and the will of the pupil, and, above all
by the example of the noble life that he led."

Born December 1813 ; Died, August 1898

লাহিড়ী মহাশয়ের শিক্ষকতা কিরূপ ফলদায়ক হইয়াছিল উক্ত প্রস্তর-ফলকই তাহার প্রমাণ।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর যুগ

এক্ষণে আমরা বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তের যে যুগে প্রবেশ করিতেছি, তাহার প্রধান পুরুষ পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এককালে রামমোহন রায় যেমন শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী আদর্শপুরুষরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাহার পদভরে বঙ্গসমাজ কাঁপিয়া গিয়াছিল, এই যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্দ্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক

সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটীজুতাশুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে। সেই চরিত্রবীর পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দিয়া এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতেছি, কারণ একদিকে লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত অকপট মিত্রতা সূত্রে তিনি বদ্ধ ছিলেন, অপরদিকে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরী। ইতিবৃত্ত গঠন বিষয়ে তিনি এই যুগের সর্বপ্রধান পুরুষ ছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২২৭ সালে, মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মিলেন, তাঁহারা গুণগৌরবে ও তেজস্বিতার জন্য সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোনও পারিবারিক বিবাদে উত্যক্ত হইয়া স্বীয় পত্নী দুর্গাদেবীকে পরিত্যাগ পূর্বক কিছুকালের জন্য দেশান্তরী হইয়া গিয়াছিলেন। দুর্গাদেবী নিরাশ্রয় হইয়া বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস সেই সময় হইতে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ১৫ বৎসর হইবে তখন জননীর দুঃখনিবারণার্থ অর্থোপার্জনের উদ্দেশে কলিকাতাতে আগমন করেন। এই অবস্থাতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত যে ঘোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার হৃদয়বিদারক বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক দিনের পর, অনেক ক্লেশ ভুগিয়া, অবশেষে একটি ৮৲ টাকা বেতনের কর্ম পাইয়াছিলেন। এই অবস্থাতে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাদের প্রথম সন্তান।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে কিয়ৎকাল গ্রাম্যপাঠশালাতে পড়িয়া পিতার সহিত কলিকাতাতে আসেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার পিতার মনিব বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতাপুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন যাইত। এই সময়ে ভাগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমণি তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনও দিন সে উপকার বিস্মৃত হয় নাই। বৃদ্ধবয়সেও রাইমণির কথা বলিতে দর দর ধারে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত।

কলিকাতাতে আসিয়া কয়েক মাস পাঠশালে পড়িবার পর বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও ছাত্র সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের জুন মাসে তিনি ভর্ত্তি হইলেন, ছয় মাসের মধ্যেই মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালেজের সমুদয় উচ্চবৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে মফস্বলের ইংরাজ জজদিগের আদালতে এক একজন জজ-পণ্ডিত থাকিতেন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা দেওয়া তাঁহাদের কার্য্য ছিল। সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ঐ কাজ প্রাপ্ত হইতেন। তাহা একটা প্রলোভনের বিষয় ছিল। কিন্তু উক্ত কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে ল কমিটী নামক একটি কমিটীর নিকট পরীক্ষা দিয়া কর্ম্ম লইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখন ল কমিটীর পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিপুরার জজ-পণ্ডিতের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস এত দূরে যাইতে দিলেন না।

১৮৪১ সালে তিনি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তিনি ইংরাজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন তাহা অনেকে জানেন না, এমন কি তাঁহার হাতের ইংরাজী লেখাটিও এমন সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজীওয়ালাদের হাতের লেখাও তেমন সুন্দর নয়। এ সমুদয় তিনি নিজ চেষ্টা যত্নে করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা এরূপ প্রবল ছিল যে, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে ঐ ইচ্ছা সংক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে প্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার কেরাণীর কর্ম্মটি খালি হইলে, তাঁহারই চেষ্টাতে তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে কর্ম্মটি প্রাপ্ত হন। দুর্গাচরণ বাবু ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ঐ কর্ম্মে থাকিয়া, মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইয়া চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহাই দুর্গাচরণ বাবুর সকল ভাবী উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার কারণ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। এই সময়ে আর এক বন্ধুর দ্বারা আর এক কার্য্যের সূত্রপাত হয়। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করিলেন যে, তাঁহারা নিজে যে প্রণালীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন সে প্রণালীতে ইঁহাকে শিখাইলে

চলিবে না, অনর্থক অনেক সময় যাইবে। সুতরাং নিজে চিন্তা করিয়া এক নূতন প্রণালীতে তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার উত্তরকালে রচিত উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতির সূত্রপাত হইল।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কালেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদ পাইলেন। কিন্তু উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে দুই এক বৎসরের মধ্যে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারম্ভে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কেরাণীগিরি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শেল সাহেবের অনুরোধে, মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পদে তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। ঐ সালেই তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের কর্ম্ম পাইয়া চলিয়া যাওয়াতে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেথুনের পরামর্শে ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতে ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নানা প্রকার সংস্কার কার্য্যে হস্তার্পণ করেন। প্রথমত, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ, (২য়) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতির ছাত্রগণের জন্য কালেজের দ্বার উদ্ঘাটন, (৩য়) ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তন, (৪র্থ) উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, (৫ম) ২ মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রথা প্রবর্ত্তন, (৬ষ্ঠ) সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন। সংস্কৃত কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই সকল পরিবর্ত্তন সংগঠন করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা এখন কল্পনা করিতে পারি না। সে কালের লোকের মুখে তাঁহার শ্রমের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ইহার পর দিন দিন তাঁহার পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৪৭ সালে তাঁহার "বেতাল পঞ্চবিংশতি" মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। "বেতাল" বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল। তৎপরে ১৮৪৮ সালে "বাঙ্গালার ইতিহাস", ১৮৫০ সালে "জীবনচরিত" ১৮৫১ সালে "বোধোদয়" ও "উপক্রমণিকা", ১৮৫১ সালে "শকুন্তলা" ও "বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল।

শিক্ষাবিভাগে ইন্‌স্পেক্টারের পদ সৃষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত

কালেজের অধ্যক্ষের পদের উপরে, নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। এক দিকে যখন তাঁহার পদ ও শ্রম বাড়িল, তখন অপর দিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই সালেই বিধবাবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সমাজসংস্কারে এই তাঁহার প্রথম হস্তক্ষেপ নয়। ১৮৪৯ সালে যে মাসে বেথুন সাহেব যখন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন কার্য্যে আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন।

৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল। বৎসরে তাঁহার কার্য্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল। এক দিকে বিধবাবিবাহের প্রতিপক্ষগণের আপত্তিখণ্ডনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, বিধবাবিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা, কার্য্যতঃ বিধবাবিবাহ দিবার আয়োজন, এই সকলে তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইল, অপরদিকে এই সময়েই শিক্ষাবিভাগের নব-নিযুক্ত ডিরেক্টার মিষ্টার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন লইয়া ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলার স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহার যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ও সুবিধা উপস্থিত। তিনি উৎসাহের সহিত তাহার সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইয়ং সাহেব, বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর করিলেন না। এই সংকটে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের শরণাপন্ন হইলেন। সে যাত্রা তাঁহার মুখ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ডিরেক্টার তাঁহার প্রতি হাড়ে চটিয়া রহিলেন। কথায় কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগিল। এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্ত এই বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত ছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টাসত্ত্বেও এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তাঁহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়।

এদিকে ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল,

তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। রাজবিধিপ্রণয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্য্যতঃ বিধবাবিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে, মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা, "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল।

এই সকল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে যে কতিপয় বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসাহ ও হৃদয়ের অনুরাগ দানে সবল করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় একজন। তিনি ১৮৫৭ সালে উত্তরপাড়া স্কুল হইতে বদলী হইয়া বারাসত স্কুলে গমন করেন। সেখানে প্রায় দেড় বৎসরকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বারাসত কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নয়, সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় সেখান হইতে আসিয়া সর্ব্বদাই সহরে বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা সূত্রে স্বল্পকালের জন্যও যেখানে বাস করিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। সে সময়ে বারাসত স্কুলে যাঁহারা তাঁহার নিকটে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ভক্তিতে গদ গদ হইয়া তাঁহার দৈনিক জীবনের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্রে তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ দেখিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্য্যে এরূপ দেহ মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কেহ কখনও দেখে নাই, ঘড়ির কাঁটাটির ন্যায় যথাসময়ে তাঁহাকে নিজ কর্ম্মস্থানে দেখা যাইত, তৎপরে যে সময়ের যে কাজটি, তাহার প্রতি মুহূর্ত্তকালের অমনোযোগ হইত না। ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য, তাহাদের চরিত্র ও নীতি উন্নত করিবার জন্য এবং সকল সাধু বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য, তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ দৃষ্ট হইত। যেমন তিনি একদিকে ছাত্রগণের মানসিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে নিজে মানসিক উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলেন। অবসরকালে দেখা যাইত হয় তিনি বাগানে বৃক্ষগণের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত, না হয় পাঠে গভীররূপে নিমগ্ন। এই সময়ে উদ্ভিদ-বিদ্যা ও উদ্যান-রচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ছাত্রের সহিত স্কুলগৃহের নিকটস্থ ভূমিখণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। নিজে কিয়ৎ-পরিমাণ ভূমি লইয়া ছাত্রদিগের একজনকে এক একখণ্ড ভূমি দিয়াছিলেন। নিজে আপনার নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে শ্রমশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেন।

লাহিড়ী মহাশয় যখন বারাসতে প্রতিষ্ঠিত তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, সৈন্যবিভাগে এক প্রকার নতুন বন্দুক প্রচলিত করিবেন। ঐ বন্দুকের গুলীপূর্ণ টোটার উপরকার কাগজ দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পূরিতে হইত। সেই সকল টোটা দমদমের কারখানাতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। দমদম হইতে এই কথা উঠিল যে, দুই প্রকার টোটা প্রস্তুত হইতেছে, এক প্রকার টোটার উপরকার কাগজ গো-বসার দ্বারা, অপর প্রকার টোটার কাগজ শূকর-বসার দ্বারা লিপ্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে, গো-বসা-লিপ্ত টোটা হিন্দুদিগকে ও শূকর-বসা-নির্মিত টোটা মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে। প্রজাগণকে স্বধর্মচ্যুত করা ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য। এই জনরবের কিছুমাত্র মূল ছিল না, এবং নূতন টোটা তখনও হয় নাই। অথচ এই জনরবে সিপাহীদিগের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সিপাহীদিগের মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসী অনেক ছিল। তাহাদের মন লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের পদচ্যুতি নিবন্ধন অগ্রেই উত্তেজিত ছিল। লর্ড ডালহৌসি যে ভাবে অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎপ্রদেশীয় প্রজাকুল জবরদস্তী ও বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। অযোধ্যা প্রদেশবাসী সৈন্যদলের মনে সেই অসন্তোষ প্রধূমিত বহ্নির ন্যায় রহিয়াছিল। তাহার উপরে টোটা কাটার জনরব বাতাসের ন্যায় আসিল। ১৮৫৭ ফেব্রুয়ারি মাসে বারাকপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অসন্তোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, কিন্তু সে অসন্তোষের গভীরতা কত কর্তৃপক্ষ তখন তাহা ধরিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরে বারাকপুর হইতে একদল সৈন্য কোনও বিশেষ কারণে বহরমপুরে প্রেরিত হয়। তখন বহরমপুরে একদল সিপাহী সৈন্য ছিল। বারাকপুর হইতে নবাগত সিপাহীগণ তাহাদের কানে কানে নূতন টোটার কি বিবরণ বলিল তাহাতে সিপাহীরা একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেখানে একদিন ইংরাজ-সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সহিত সিপাহীদিগের মারামারি হইল। এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে লর্ড ক্যানিং ঐ সকল সিপাহীকে বারাকপুরে আনিয়া সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহাদিগকে বারাকপুরে আনিয়া সমুদয় সিপাহী সৈন্যদলের সমক্ষে তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সৈন্যদল হইতে বিদায় দেওয়া হইল। অন্য সময় হইলে এই শাস্তি দ্বারা অনিষ্টকর ফল না ফলিয়া ইষ্ট ফলই হইত। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল। কর্ম্মচ্যুত সিপাহীদিগের মধ্যে অনেকে অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের লোক ছিল। তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে ফিরিবার সময় নূতন টোটার কথা লইয়া গেল। বিশেষতঃ তৎতৎস্থানের সিপাহীদিগের কর্ণে সেই কথা তুলিল; এবং কিরূপে

তাহারা স্বধর্ম রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং সেজন্য নিগৃহীত হইয়াছে তাহাও গৌরব ও স্পর্দ্ধার সহিত প্রচার করিয়া দিল। চারিদিকে প্রধূমিত অগ্নির ন্যায় অসন্তোষ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

অবশেষে সেই প্রধূমিত অসন্তোষ ১০ই মে দিবসে মিরাট নগরে বিদ্রোহাগ্নির আকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেখানে ৬ই মে দিবসে ১৫ জন দেশীয় সৈনিক কুচকাওয়াজের সময় টোটা লইতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহাদিগকে কোর্টমার্শালের বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে অপরাপর সিপাহীগণ তাহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত বলিয়া, সদলে বিদ্রোহী হইয়া, ১০ই মে দিবসে জেলের কয়েদিগণকে ছাড়িয়া দেয়; রাজকোষ লুণ্ঠন করে, অস্ত্রাগার হস্তগত করে, অনেক ইংরাজকে হত্যা করে, এবং অবশেষে দিল্লীর নাম-মাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর সাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার মানসে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। তাহারা ১১ই মে দিল্লী অধিকার করে। এই সংবাদ দেশে প্রচার হইলে, যে যে স্থানে দেশীয় সিপাহী সৈন্য ছিল, সর্ব্বত্রই বিশেষ উত্তেজনা দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাজপুরুষগণ সতর্ক হইয়া বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, ভয় ও মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় কিছুই করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। যেমন গ্রীষ্মের দিনে ঘরে আগুন লাগিলে দেখিতে দেখিতে এক ঘর হইতে অপর এক ঘরে লাগিয়া যায়, সেই প্রকার দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহাগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এই সুযোগ পাইয়া যাঁহাদের কোন না কোনও কারণে পূর্ব্বাবধি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, এমন কতকগুলি লোক এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের সারথ্যকার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে ফৈজাবাদের মৌলবী, বিঠূরের নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী ও নানার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ফৈজাবাদের মৌলবী একজন মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্য, লক্ষ্ণৌয়ের নবাবকে পদচ্যুত করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। নবাবের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার আলাপ ও আত্মীয়তা ছিল। তাহাদের অবনতিকে তিনি নিজধর্ম্মের অধঃকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহীদলের একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অযোধ্যার সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

নানাসাহেব মহারাষ্ট্রীয় প্রসিদ্ধ বাজীরাওর পোষ্যপুত্র। তিনি পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার বন্দীদশাতে কানপুরের সন্নিকটবর্ত্তী বিঠূর নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কোন কোনও

প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও এই সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহের অপর একজন সারথি হইলেন।

ঝান্সীর রাণীও ঐ প্রকার কোনও কারণে ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা ও বীরত্ব দেখিয়া ইংরাজগণও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কোন্ স্থানে কবে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিল তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্রোহাগ্নি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন কি বক্সার, আরা প্রভৃতির ন্যায় বেহারের অন্তর্গত স্থান সকলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে কানপুরেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। নানাসাহেবের প্ররোচনাতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ উৎসাহিত হইয়া সেখানকার ইংরাজগণকে কয়েক দিন একটা বাড়ীতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তৎপরে তাহাদিগকে নৌকাযোগে অন্য স্থানে প্রেরণ করিবার আশা ও অভয় দিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া, নৌকাতে আরোহণ করাইয়া, তাহাদের অধিকাংশকে গুলী করিয়া হত্যা করে। অবশেষে যে সকল ইংরাজ রমণী ও বালক বালিকা থাকে তাহাদিগকে কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখা হয়, কিন্তু প্রতিশোধের দিন নিকটে আসিতেছে দেখিয়া তাহাদিগকেও সদলে হত্যা করিয়া একটা কূপের মধ্যে তাহাদের মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। এতদ্ব্যতীত ১২৬ জন ইংরাজ (যাহাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ছিল) ফতেগড় হইতে নৌকাযোগে পলাইয়া আসিতেছিল, নানার আদেশে তাহাদিগকে নৌকা হইতে নামাইয়া হত্যা করা হয়। এই নিদারুণ হত্যা বিবরণ নানাসাহেবের নামের উপর অবিনশ্বর কলঙ্কের রেখার ন্যায় চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। কারণ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার হত্যা সকল দেশের সামরিক নীতির বিরুদ্ধ-কার্য্য।

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন, দেশীয় বিভাগের লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খ্রীষ্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গভর্ণর জেনেরাল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—কালাদের অস্ত্র শস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি, ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরেজরা তাঁহার নাম Clemency Canning "দয়াময়ী ক্যানিং" রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের

ধাবে যায় তাহাকেই গুলী করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিষের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না, লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, "হুকুমদার" অর্থাৎ (Who comes there ?) তাহা হইলেই বলিতে হইত, "রাইয়ত হ্যায়" অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।

যাহা হউক ইংরাজগণ সত্বর বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পুনরায় তাঁহাদের হস্তগত হইল। প্রতিশোধের দিন যখন আসিল তখন তাঁহারাও নৃশংসতাচরণ করিতে ত্রুটী করিলেন না। ইংরাজসৈন্যগণ যতদূর অগ্রসর হইত, তাহাদের গমনপথের উভয় পার্শ্বে দোষী নির্দ্দোষী, হতাহত দেশীয় প্রজার মৃতদেহ আকীর্ণ হইতে লাগিল! এক এলাহাবাদে ৮০০ শত দেশীয় প্রজাকে ফাঁসি দেওয়া হইল!

ক্রমে সমগ্র দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৮ সালে মহারাণী প্রজাদিগকে অভয়দান করিয়া ভারত সাম্রাজ্য নিজ হস্তে লইলেন, ষ্টেট-সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল; কলিকাতা সহর আলোকমালাতে মণ্ডিত হইল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল, এক নবশক্তির সূচনা হইল, এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল। সে জন্য ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দিলাম।

বিদ্রোহজনিত উত্তেজনাকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল। পেট্রিয়ট সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ কেবল কুসংস্কারাপন্ন সিপাহীগণের কার্য্য মাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে। পেট্রিয়টের চেষ্টাতে লর্ড ক্যানিং-এর মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, সেজন্য এদেশীয়দিগের প্রতি কঠিন শাসন বিস্তার করিবার জন্য ইংরাজগণ যে কিছু পরামর্শ দিতে লাগিলেন, ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই কারণে তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার Clemency Canning বা "দয়াময়ী ক্যানিং" নাম দিল। এমন কি তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্য ইংলণ্ডের প্রভুদিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেণ্টেও সে কথা

উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্যানিং-এর বন্ধুগণ পেট্রিয়টের উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, এদেশবাসীগণ ক্যানিং-এর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ। পেট্রিয়ট এই সময়ে এদেশীয়দিগের অদ্বিতীয় মুখপাত্র হইয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র একদিকে যেমন গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার বৈধ শাসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজগণের সর্ব্বপ্রকার অবৈধ আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সকলে উত্তেজনাতে পড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হারাইয়াছিল, কেবল পেট্রিয়ট হারায় নাই, এজন্য রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরূপ শুনিয়াছি পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিং-এর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট আফিসে বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত। হিন্দু পেট্রিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নবাবঙ্গের নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয়। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান নিরবচ্ছিন্ন আত্মচেষ্টা ও স্বাবলম্বন দ্বারা কতদূর উন্নতি করিতে পারে, হরিশ তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ১৮২৪ সালে, কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী ভবানীপুর নামক স্থানে, স্বীয় মাতামহের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় স্বজাতীয় কুলীনদিগের মধ্যে কুলমর্য্যাদাতে অগ্রগণ্য ছিলেন। কুলপ্রথা অনুসারে তিনি তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হরিশ সর্ব্বকনিষ্ঠা পত্নী রুক্মিণী দেবীর গর্ভজাত। হরিশের জ্যেষ্ঠ এক সহোদর ছিলেন তাঁহার নাম হারান চন্দ্র। শৈশবাবধি হরিশ ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতে অভ্যস্ত হন। কিছুকাল কোনও পাঠশালে পড়িবার পর তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে ইণ্ডিয়ান স্কুল নামক একটি স্কুলে প্রেরিত হন। এখানে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৪ কি ১৫ বৎসরের সময় দারিদ্র্যের তাড়নায় পাঠ সাঙ্গ করেন। সেই বয়সেই তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতে বিব্রত হইতে হয়। কর্ম্ম কি সহজে জোটে? বালক হরিশ উমেদারী করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দশ টাকা বেতনের একটি সামান্য চাকুরী জুটিল। কিছুদিন তাহা করিয়া বেতনবৃদ্ধির আশা না দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে আরও কিছুকাল দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করার পর, মিলিটারি অডিটার জেনেরালের আফিসে ২৫৲ টাকা মাসিক বেতনের এক কর্ম্ম পাইলেন। এই কর্ম্মটি তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল কারণ হইল। তিনি অন্নবস্ত্রের চিন্তা হইতে একটু নিষ্কৃতি

পাইয়াই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত আপনার জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। কিনিয়া ও ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলেই কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর চাঁদাদাতা সভ্য হইয়া, সেখানে গিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন আফিসের ছুটির পর লাইব্রেরীতে গিয়া বসিতেন ও সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ইংরাজী সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠ করিতেন, তদ্ভিন্ন রাশি রাশি গ্রন্থ বাড়ীতে আনিয়া রাত্রে পাঠ করিতেন। এইরূপ শোনা যায়, এই সময়ে পাঁচ মাস কালের মধ্যে ৫৭ খানি বান্ধাই এডিনবরা রিভিউ, দুই তিন বার পড়িয়া হৃদগত করিয়াছিলেন।

হরিশ একদিকে যেমন পড়িতেন, অপরদিকে তৎকাল প্রচলিত ইংরাজী সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। সে সময়ে হিন্দুকালেজের পূর্ব্বতন ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ Hindu Intelligencer নামে, এক ইংরাজী কাগজ সম্পাদন করিতেন, তাহাতে হরিশের লিখিত প্রবন্ধাদি সর্ব্বদা বাহির হইত। এই লেখার জন্য শিক্ষিত দলে তিনি সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ২৫৲ টাকার কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া তাঁহার বেতন ৪০০৲ চারিশত টাকা হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৫২ সালে হরিশের মান সম্ভ্রম এমন হইয়াছিল যে, অপরাপর সভ্যগণের আগ্রহে এই সালে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভাপদে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি আইন, আদালত, রাজনীতি প্রভৃতির মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য এমনি মনোনিবেশ করিলেন যে, ত্বরায় তিনি ঐ এসোসিয়েশনের পরামর্শদাতৃগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। একদিকে যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর বিষয়ে তিনি পরামর্শদাতা ও সহায় হইলেন, তেমনি অপরদিকে কতিপয় বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার বাসভূমি ভবানীপুরে একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। তিনি ঐ সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ও সম্পাদক ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে ইংরাজী বক্তৃতার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে।

এই সকল দেশহিতকর কার্য্যের মধ্যে অনুমান ১৮৫৩ সালে মধুসূদন রায় নামক একজন স্বদেশ-হিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া একখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনিই "হিন্দু পেট্রিয়ট" বাহির করিয়া কিছুদিন অপরের দ্বারা চালাইয়া পরে হরিশ চন্দ্রকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। হরিশ মনের মত একটা কাজ পাইয়া ঐ পত্রিকা সম্পাদনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। কিন্তু তখন ইংরাজী সংবাদ পত্র পড়িবার লোক অল্পই ছিল; সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও হিন্দু পেট্রিয়টের

গ্রাহক এক শতের অধিক হইল না। এই অবস্থাতে কিছুদিন পেট্রিয়ট চালাইয়া মধুসূদন রায় নিজ প্রেস অপরকে বিক্রয় করিয়া "পেট্রিয়ট" হরিশ চন্দ্রকে দিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিলেন।

হরিশ কাগজ ভবানীপুরে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার ভ্রাতা হারাণ চন্দ্রকে নামতঃ প্রেস ও কাগজের সত্বাধিকারী করিয়া উৎসাহসহকারে কাগজ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে পেট্রিয়ট কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে পেট্রিযটের শক্তি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল।

হরিশের যে লেখনী লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি উদ্গিরণ করিয়াছিল, তাহাই মিউটিনীর সময়ে ক্যানিং-এর পৃষ্ঠপোষক হইয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ হরিশের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কার্য্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ সামর্থ্য সকলি নিয়োগ করিযাছিলেন। নীলকর হাঙ্গামার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই :—

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি নানা জেলাতে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। ইংরাজগণ কোম্পানি করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন। অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং তাঁহারা তাহার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দাদন দেওয়া একটি প্রধান। দাদনের অর্থ কৃষকদিগকে অগ্রিম অর্থ দেওয়া। দরিদ্র কৃষকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আরও অনেক কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়া দাদন লইত, এবং ভাল ভাল জমিতে নীল বুনিবে এবং অপরাপর প্রকারে নীলকরদিগের সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকিত। তৎপরে তাহারা নীলকরদিগের দাসরূপে পরিণত হইত। নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া লইতেন, বলপূর্ব্বক তাহাদিগের গোলাঙ্গলাদি ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন, এবং অনেক স্থলে জমিদার হইয়া বসিয়া অবাধ্য প্রজাদিগকে একেবারে ধনে প্রাণে সারা করিতেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, গভর্ণমেণ্ট উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশে নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিবাদ আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে অনুমান ১৮৫৮ কি ৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল যে, নীলের দাদন লইবে না বা নীলের চাষ করিবে না। তখন নীলকর ইংরাজগণ তাঁহাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। যশোহর,

নদীয়া প্রভৃতি জেলার জমিদারগণের ও প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নীলকরদিগের স্বজাতীয়, সুতরাং প্রজারা প্রায়ই সুবিচার লাভ করিত না। কিন্তু তাহারা ইহাতেও দমিত না, অনেকে ধনে প্রাণে সারা হইয়া যাইত, তবু নিরস্ত হইত না। এই সময়ে হরিশচন্দ্র অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। অবশেষে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টাতে গভর্ণমেণ্ট এই ১৮৬০ সালেই "ইণ্ডিগো কমিশন" নিযুক্ত করিলেন। তাহার সভ্যগণ জেলায় জেলায় ঘুরিয়া নীলের অত্যাচার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হরিশ কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। চারিদিক হইতে নীলকরদিগের উপরে ছি ছি রব উঠিল। নীলকরগণ জাতক্রোধ হইয়া আর্কিবল্ড হিল্স নামক একজন নীলকরকে খাড়া করিয়া পেট্রিয়টের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। ভবানীপুর সুপ্রিম কোর্টের এলাকাভুক্ত নয় বলিয়া সে মোকদ্দমা উঠিয়া গেল। কিন্তু এই সকল গোলমাল হরিশের ভগ্ন শরীরে আর সহিল না। ১৮৬১ সালের জুন মাসে ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মানুষের দেহে আর কত সয়! সে সময়ে যাঁহারা হরিশের জ্বলন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, রাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে "পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদকতা কাজ, সেজন্য তাঁহাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, তদুপরি দিবারাত্রি নীলকরপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাঁহার ভবন সর্ব্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে, বিশ্রাম নাই। অনেক দিন আফিস হইতে ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আর অফিসের পোষাক বদলাইবার সময় পাইতেন না। আফিসের কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধরিয়া বসিয়া যাইতেন। তাঁহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়া টিক্ টিক করিতেন। বলিতেন, "ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে বাবা পড়ার, ওরে কলম রাখ।" তদুত্তরে তিনি বলিতেন - "মা, তোমার সব কথা শুনবো, কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্যে যা করছি তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা হলো, এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পারবো না।" কিন্তু এই অতিরিক্ত শ্রমের ফল এই হইত যে, যে পেট্রিয়টের কাজ সপ্তাহ ধরিয়া করিলে অপেক্ষাকৃত লঘু হইত, তাহা দুই দিনে সারিতে হইত, সুতরাং সে দুই দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। এই গুরুতর শ্রমে দেহ মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তখন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তদানীন্তন প্রথানুসারে

সুরা-বিষ পান করিয়া আপনার অবসন্ন দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

এরূপ শুনিয়াছি যে, ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। সেই শোকের অবস্থাতে তাঁহার নবপরিচিত ধনী বন্ধুগণ তাঁহাকে সুরাপান ও অন্যান্য নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাহা হইতেই তাঁহার সর্ব্বজনপ্রশংসিত চরিত্রে কালিব রেখা পড়ে, তাহা হইতেই তাঁহার পানাসক্তি প্রবল হয়। এই বিবরণ যখন শুনি, তখন চক্ষে জল আসে, আর বলি—হায়! স্কচ কবি বরন্‌স্ লাঙ্গল ফেলিয়া যদি এডিনবরা নগরে না আসিতেন তাহা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদের দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হরিশের পদবৃদ্ধি যদি না হইত, তিনি যদি কলিকাতায় ধনীদের আদুরে ছেলে হইয়া না দাঁড়াইতেন, তবে বুঝি ভাল হইত। ধনীরা কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নাচিয়া গেলেন, দিয়া গেলেন মদেব বোতল ও দারুণ পীড়া। ক্ষতি যাহা হইবার হরিশেব পরিবাববর্গেব হইল, এবং সর্ব্বোপরি হতভাগিনী বঙ্গভূমিব হইল। আমাব দৃঢ় বিশ্বাস হরিশচন্দ্রের ন্যায় এমন বিমল হৃদয়ে, দেহ মন প্রাণ দিয়া, স্বদেশের সেবা অতি অল্প লোকেই করিয়াছে।

না জানি নীলকবগণ কি জাতক্রোধই হইয়াছিলেন! হরিশের মৃত্যুব পরেও তাঁহাদের ক্রোধ থামিল না। যে আর্কিবল্ড হিল্‌স্ তাঁহার নামে প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনিই তদনন্তব তাঁহার বিধবা পত্নীকে প্রতিবাদীশ্রেণীগণ্য কবিযা আলিপুব কোর্টে দশ হাজাব টাকাব দাবী করিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইতে অগ্রসর হইলেন। হিল্‌সেব পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। এদেশীয়দিগের মধ্যে সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে হরিশের বিধবাকে আপসে মিটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি বাদীব খরচার হিসাবে এক হাজার টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইল। এই এক হাজার টাকা অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া বিধবার বসতবাটী-খানি ক্রোক হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক এক দিকে যখন ইণ্ডিগো কমিশন ও পেট্রিয়টের সহিত বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপব দিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। "নীলদর্পণ" কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না; কিন্তু বাসাতে বাসাতে "ময়রাণী লো সই নীল গেঁজেছ কই"? ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল। যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পাদরী জেম্‌স্ লং সাহেব তাহা নিজের নামে

প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল গ্রন্থকারকে না পাইয়া ইংলিসমান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া ১৮৬১ সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

এরূপ মোকদ্দমা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। লং বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, তিনি বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোনও কার্য্য করেন নাই। তিনি বহুবর্ষ হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির ভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া আসিতেছিলেন। নীলদর্পণের অনুবাদ সেই কার্য্যেরই অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু তদানীন্তন ইংরাজ-পক্ষপাতী জজ সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স্‌ সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার বিচারে লং-এর এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। তখন নীলকর বিদ্বেষ এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে, জরিমানার হুকুম হইবামাত্র, মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা গুণিয়া দিলেন। এরূপ শুনিয়াছি যে, আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে জরিমানার টাকা দিবার জন্য টাকা লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তি সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।

নীলদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইয়াছিল, তাহার একটা কারণ এই ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গসমাজে নাট্যকাব্যের নব-অভ্যুদয় ও রঙ্গালয়ের আবির্ভাব নিবন্ধন লোকের মনে একপ্রকার উত্তেজনা চলিতেছিল। বঙ্গদেশে নাট্য কাব্যের অভ্যুদয় একটা বিশেষ ঘটনা। তৎপূর্ব্বে যাত্রা, কবি, হাপ-আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাপ-আকড়াই অভদ্র অশ্লীল বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যেমন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া সুরাপান ও হাস্য পরিহাস প্রভৃতি করাই তাঁহাদের একমাত্র সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজগণের স্থাপিত রঙ্গালয়ে গিয়া অভিনয় দর্শন করিতেন। সে সময়ে (১৮৫৬।৫৭ সালে) সহরে ইংরাজদের একটি প্রসিদ্ধ

রঙ্গালয় ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় দেখিতে যাইতেন। দেখিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই কেন বলিয়া ক্ষোভ করিতেন। তাঁহার ফলস্বরূপ সহরের দুই একজন বড়লোক উদ্যোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অভিনেতা করিয়া ইংরাজী নাটক অভিনয় করিয়া বন্ধুবান্ধবের চিত্ত বিনোদন করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। এ চেষ্টা তখন সম্পূর্ণ নূতন ছিল না। ইহার অনেক কাল পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় একবার নিজের শুঁড়োর বাগানে এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের অনুবাদিত উত্তররামচরিত অভিনয় করিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেখাইয়াছিলেন।

দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয়ের আদর দেখিয়া ১৮৫৪ সালে ইংরাজদিগের রঙ্গালয়ের লোকেরা উদ্যোগী হইয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ভবনে "ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার" নামে এক শাখা রঙ্গালয় স্থাপন পূর্ব্বক সেক্সপীয়রের নাটক সকলের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দেশীয় শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়া গেল। রঙ্গালয়ের অভিনয় একটা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইল। স্কুলের ছেলে ছোকরারা স্বীয় স্বীয় দলে ছোট ছোট রকমে ম্যাকবেথ প্রভৃতির অভিনয় আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্রমে ধনিগণ অনুভব করিলেন যে, ইংরাজী নাটক অভিনয় আরম্ভ করিলে সাধারণের প্রীতিকর হয় না। এই জন্য বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় কোনও ধনি-প্রদত্ত পারিতোষিক লাভের উদ্দেশ্যে "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" নামক এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের প্ররোচনায় ওরিয়েণ্টাল' থিয়েটারে একবার তাহার অভিনয় হয়। ইহাতেই দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। তৎপরে ১৮৫৭ সালে সিমুলীয়ার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) উদ্যোগী হইয়া শকুন্তলাকে বাঙ্গালা নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করাইলেন। তৎপরেই মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করাইলেন, এবং কিছু দিন পরে মহাসমারোহে তাঁহার নিজের অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয় হইল। দেখিতে দেখিতে সহরে বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল।

এই সকল অভিনয় দেখিয়া পাইকপাড়ার রাজপরিবারের দুই ভাই, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র এবং (মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মনে একটি দেশীয় রঙ্গালয় স্থাপনের সংকল্প জন্মিল। তাঁহারা তিনজনে পরামর্শ করিয়া বেলগাছিয়া নামক উদ্যানে এক নাট্যালয় স্থাপন করিলেন। এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায়-স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মাইকেল

মধুসূদন দত্ত, ১৮৫৬ সালে মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীন্তন কলিকাতার পুলিশ কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাঁহাকে চিনিত না। কেবল হিন্দুকালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাঁহাকে চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাঁহাদের মধ্যে একজন। গৌরদাস বাবু তাঁহাকে নূতন নাট্যালয়ের উদ্যোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিলেন। মধুসূদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দিলেন। সেই ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়াই মধুসূদনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি রাজাদের নিরতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিল। মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ পূর্ব্বক নূতন প্রণালীতে "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক রচনা করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়-গ্রাহী হইল। মধুসূদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্ব্বরাগে অনুরঞ্জিত করিল। তাঁহার পদ্মাবতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি অপরাপর নাটক ক্রমে প্রণীত ও অভিনীত হইতে লাগিল।

তাঁহার জীবনচরিতকার বলেন যে, এই বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের সম্পর্ক হইতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার সূত্রপাত। তিনি নিজের প্রণীত কোন কোনও নাটকে ইংরাজ কবিদিগের অনুকরণে নায়ক-নায়িকার উক্তি প্রত্যুক্তিমধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠ করেন। এই বিষয় লইয়া উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়। ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, ফরাসী ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকূল নহে। মধুসূদন প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার কন্যা, তাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়, বাঙ্গালাতে কেন হইবে না? আমি অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা করিয়া দেখাইব।" এই বলিয়া তিনি "তিলোত্তমা" রচনা করিতে বসেন; এবং অল্পকাল মধ্যেই তাহার কিয়দংশ লিখিয়া বন্ধুগণের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৬০ সালে "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্যের কিয়দংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তিন বৎসরের মধ্যেই মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে দেখিতে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় উঠিয়া যেন মাধ্যাহ্নিক রেখাকে অতিক্রম করিয়া গেল! তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও মেঘনাদবধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে তাঁহার কবিত্বখ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইল।

বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর

বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি এক স্থানে বলিতেছেন :—

যাত্যেকতোস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোর্কঃ।

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

বঙ্গ সাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল! ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনের গ্রন্থাবলী যখন প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গসমাজে মহা আলোচনা উপস্থিত হইল। বঙ্গীয় পাঠকগণ মধুসূদনের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল "প্রদানিয়া", "সান্ত্বনিয়া" প্রভৃতি পদকে বাঙ্গালা ভাষায় যথেচ্ছাচার বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন; এবং মধুসূদনের অনুসরণে কাব্য রচনা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ "ছুঁছুন্দরীবধ কাব্যের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চান, তাঁহারা পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক পক্ষ এক দিকে যখন এইরূপ বিরোধী, অপর পক্ষ অপরদিকে তেমনি গোঁড়া। স্কুল ও কালেজের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ বালক এই গোঁড়ার দলে প্রবেশ করিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিরূপে ছন্দ ও যতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে হইবে, তাহা সকলে বুঝিতে পারিত না;" দুই একজন অগ্রসর চালাক ছেলে মধুসূদনের নিজের মুখে শুনিয়া আসিয়াছে বলিয়া আসিয়া আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইত। এক জন পড়িত বিশ জনে শুনিত। আমরা ঐ চালাক ছেলেদিগকে খুব বাহাদুর মনে করিতাম। এইরূপে ইংরাজ কবি কাউপার যেমন পোপ ও ড্রাইডেনের ছন্দ-নিগড়ে দৃঢ় বদ্ধ ইংরাজী কাব্যে স্বাধীনতা ও ওজস্বিতা প্রবিষ্ট করিয়া নবজীবন আনয়ন পক্ষে উপায়স্বরূপ হইয়াছিলেন, তেমনি মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভা ভারতচন্দ্র ও গুপ্ত কবির রচিত ছন্দ-নিগড় হইতে বঙ্গীয় কাব্যকে উদ্ধার করিয়া তাহাতে ওজস্বিতা ঢালিয়া নবজীবনের সঞ্চার করিল! মধুসূদন প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিজ প্রতিভাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া একপ মনে করিতে হইবে না যে, মিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাতে তিনি কম নিপুণ ছিলেন। তাঁহার রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য তাহার প্রমাণ। ইহাতে তিনি মিত্রাক্ষরে সরস সুমিষ্ট কবিতাতে মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন।

অগ্রে যে কবিদ্বয়ের কথা বলা গেল তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লেখ করা যাইতেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সুখের বিষয় এত দিনের পর ইঁহার সমস্ত গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইঁহার বিশ্বাসযোগ্য জীবনচরিত পাওয়া যাইতেছে। ইনি কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যবংশীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি স্বীয় কুল ক্রমাগত চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী এক কুঠীতে ৮৲ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম করিতেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের আলয়। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। তাঁহার অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃবিযোগ হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি মাতামহের আলয়ে আসিয়া অধিকাংশ সময় থাকিতেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি তৎকালে পড়াশুনাতে বড় অনাবিষ্ট ছিলেন। পাঠশালে যাইতেন বটে, কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা খেলা ও দুষ্টামিতে বেশি মনোযোগী ছিলেন। বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না; বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি অচিরকালের মধ্যে বাঙ্গালার সুকবি ও সুলেখক রূপে পরিচিত হইলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। তাঁহাদেরই ভবনে তিনি অবসরকাল যাপন করিতেন। তাঁহাদেরই আশ্রয়ে, তাঁহাদেরই উৎসাহে, তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন; সখের কবির দলে গান বাঁধিতেন; বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কবিতা রচনা করিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিতেন। এই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্ররোচনাতে, তাঁহারই সাহায্যে, বাঙ্গালা ১২৩৭ সালে বা ইংরাজী ১৮৩০ সালে "সংবাদ-প্রভাকর" সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক প্রভাকর, প্রধানতঃ ইঁহার পদ্যময় প্রবন্ধ সকলের গুণে, সত্বর লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। দেখিতে দেখিতে ইহার গ্রাহক ও লেখক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের উৎসাহ-দাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয়বাবু ইংরাজী পত্রিকাদি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনী সভায় সভ্য হইতে প্ররোচনা

করেন; এবং তিনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। বলিতে গেলে উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দত্ত যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। কেবল তত্ত্ববোধিনী সভা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তৎকালের অনেক সভা সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিলেন, এবং বক্তৃতাদি করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

তৎপরে ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাল হওয়াতে "প্রভাকর" কিছুকালের জন্য উঠিয়া যায়। কিন্তু ঐ সালেই আন্দুলের জমীদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে "রত্নাবলী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামতঃ তাহার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু লিপিকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা না থাকাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কেই সম্পাদকতা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে হইত। কিন্তু এ কার্য্যে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্যের হানি নিবন্ধন সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া কটকে তাঁহার পিতৃব্য শ্যামামোহন রায় মহাশয়ের আবাসে গিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেখানে একজন দণ্ডীর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা বাঙ্গালা কবিতাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালা ১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তখন প্রভাকর সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ সালের আষাঢ় মাস হইতে তাহা দৈনিকরূপে পরিণত হয়। এইবারে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক পণ্ডিত ও সুলেখক ব্যক্তিকে স্বীয় কার্য্যের সহায়তার জন্য ব্রতী করিলেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাংড়িপোতা গ্রামনিবাসী হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি "সোমপ্রকাশের" জন্মদাতা খ্যাতনামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা ও আমার মাতামহ।

এখন হইতে "প্রভাকর" উদীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাঙ্গালা দেশের লোক পাগল হইয়া উঠিল। প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ঐ সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ বিক্রয় হইয়া যাইত! ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল দেখা দিল; এবং বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। এখন যেমন ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক যিনি কবিতা রচনা করেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে ঢালিয়া থাকেন, তখন কবিতা রচনার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাঁচে ঢালিতেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে শিষ্য-প্রশিষ্য-শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক কবি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই শিষ্যদলের মধ্যে সুধীরঞ্জন-প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসু পরবর্ত্তী সময়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পদ্মিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎপরিমাণে গুরুর পদবী অতিক্রম করিয়া কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতা এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। আমাদের যৌবনকালে যে সকল ব্যক্তির প্রতিভা আমাদিগকে কাব্যজগতে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড-পীড়ন" নামক এক পত্র বাহির করেন। "ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "রসরাজ" পত্রের সহিত কবিতাযুদ্ধ ও গালাগালি করা ঐ "পাষণ্ডপীড়নের" প্রধান কার্য্য হইয়া উঠে। তখন বঙ্গীয় আসরে প্রতিনিয়ত যে কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে অবতীর্ণ করা উক্ত পত্রদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল। সে অভদ্র, অশ্লীল, ব্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যজগতে এরূপ অশ্লীলতার স্রোত বহিয়াছিল, যাহার অনুরূপ নিকৃষ্ট রুচি আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না। প্রকাশ্য পত্রে যে সে সকল বিষয় কিরূপে প্রকাশিত হইত তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

সুখের বিষয় যে, বাঙ্গালা ১২৫৪ সালের মধ্যেই পাষণ্ড-পীড়ন উঠিয়া যায়। বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিই তাহার প্রধান কারণ হইয়া থাকিবে। কারণ ঐ ১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এখানিতে তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। এই পত্র বহুদিন জীবিত ছিল। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একখানি স্থূলকায় মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ। ১২৬৪ সালে 'প্রবোধপ্রভাকর' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি আর দুইটি কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথম, বঙ্গীয় কবিগণের জীবনচরিত ও কাব্য সংগ্রহ। দ্বিতীয়, শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা অনুবাদ। এই উভয় কার্য্যেই তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহান্ত হয়। ১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক 'প্রভাকর' প্রকাশ করিবার পরই তিনি কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন এবং সেই জ্বরেই ১০ই মাঘ দিবসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন মধুসূদন লোকচক্ষের অগোচরে থাকিয়া প্রতিভা-বলে উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য দুবন্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। মধুসূদন যশোর জেলাস্থ সাগরদাঁড়ী নামক গ্রামবাসী রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র। তাঁহার পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন; এবং তদুপলক্ষে কলিকাতাব উপনগববর্ত্তী খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইংবাজী ১৮২৪ সালে, ২৫শে জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জননী জাহ্নবী দাসী কাটিপাড়াব জমিদার গৌরীচরণ ঘোষেব কন্যা। জাহ্নবীর জীবদ্দশাতেই বিলাস-পবায়ণ বাজনাবায়ণ আর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। দুইটি সহোদব ভ্রাতাব অকালে মৃত্যু হওয়ায় মধুসূদন স্বীয় জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন; সুতবাং তিনি শৈশবাবধি মায়ের অঞ্চলের নিধি, আদুবে ছেলে ছিলেন। বাজনারাযণের অর্থের অভাব ছিল না; সুতরাং অর্থেব দ্বাবা সন্তানকে যতদূব আদর দেওয়া যায়, মধুসূদনের পিতামাতা পুত্রকে তাহা দিতে কখনই কৃপণতা করিতেন না। মধুসূদন প্রথমে সাগরদাঁড়ীতে জননীব নিকট থাকিয়া পাঠশালাতে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। ১২।১৩ বৎসব বযসে তাঁহাব পিতা তাঁহাকে নিজের খিদিরপুবের বাটীতে আনিয়া হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র মধুসূদনের আশ্চর্য্য ধীশক্তি সকলের গোচর হইল। তিনি ১৮৩৭ সালে কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত তথায় পাঠ কবিয়াছিলেন। এই অল্পকালেব মধ্যে সিনিয়াব স্কলারশিপের শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন, এবং সকল শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য বালকদিগের মধ্যে পবিগণিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে যাঁহাবা তাঁহার সমাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহাবা বলেন যে, তিনি গণিত বিদ্যায় একেবারে অবহেলা প্রকাশ কবিতেন এবং কাব্য ও ইতিহাস পাঠেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। আদুবে ছেলের চবিত্রে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা এ সময়ে তাঁহার চরিত্রে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। তিনি অমিতব্যয়ী, বিলাসী, আমোদ-প্রিয, কাব্যানুবাগী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি প্রীতিমান ছিলেন। ধূলিমুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্টি ব্যয় করিতেন। সে সময়ে সুরাপান ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেব মধ্যে একটা সৎসাহসের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল, মধুসূদনের সময়ে কালেজের অনেক ছাত্র সুরাপান করাকে বাহাদুরির কাজ মনে করিত। মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর অসমসাহসিক পাপ কার্য্যেও তিনি লিপ্ত হইতেন। পিতামাতা দেখিয়াও দেখিতেন না, বরং অর্থ যোগাইয়া প্রকারান্তরে উৎসাহ দান করিতেন। যাহা হউক, বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও মধুসূদন জ্ঞানানুশীলনে কখনই অমনোযোগী হইতেন না। কালেজে তিনি

কাপ্তেন রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী-সাহিত্য পাঠ করিতেন। সৎক্ষেত্রে পতিত কৃষির ন্যায় রিচার্ডসনের কাব্যানুরাগ মধুর হৃদয়ে পড়িয়া সুন্দর ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ইংরাজী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রতিভার শক্তি কোথায় যাইবে! সেই ইংরাজী কবিতাগুলিতে তাঁহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

কবিতারচনাতে ও পাঠ্যবিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া সকলেই অনুমান করিতেন যে, মধু কালে দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইবেন। মধুর পিতামাতাও বোধ হয় সেই আশা করিতেন। কিন্তু যে প্রতিভার গুণে মধু অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিতেন, সেই প্রতিভাই তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না। যৌবনের উন্মেষ হইতে না হইতে তাঁহার আভ্যন্তরীণ শক্তি তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। গতানুগতিকের চিরপ্রাপ্ত বীথিকা তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। দশজনে যাহা করিতেছে, দশজনে যাহাতে সন্তুষ্ট আছে, তাহা তাঁহার পক্ষে ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিল; তাঁহার প্রকৃতি নূতন ক্ষেত্র, নূতন কাজ, নূতন উত্তেজনার জন্য লালায়িত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে তাঁহার জনকজননী তাঁহার এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। একটি আট বৎসরের বালিকা, যাহাকে চিনি না জানি না, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই চিন্তা মধুকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়া তুলিল। তিনি পলায়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পলাইবেন কোথায়? একেবারে বিলাতে! তাহা না হইলে আর প্রতিভার খেয়াল কি! কার সঙ্গে যাইবেন, টাকা কে দিবে, সেখানে গিয়ে কি করিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই, যখন পলাইতে হইবেই, তখন দেশ ছাড়িয়া একেবারে বিলাতে পলায়নই ভাল! পরামর্শ স্থির আগে হইল, টাকার চিন্তা পরে আসিল। 'টাকা কোথায় পাই, বাবা জানিলে দিবেন না, মার নিকটেও পাইব না, আর ত কাহাকেও কোথাও দেখি না।' শেষে মনে হইল মিশনারিদিগের শরণাপন্ন হই, দেখি তাঁহারা কিছু করিতে পারেন কি না। গেলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে। তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মনে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ অপেক্ষা বিলাতে যাওয়ার বাতিকটাই বেশী। এইরূপে আরও কয়েক দ্বারে ফিরিলেন। শেষে কি হইল, কি দেখিলেন, কি শুনিলেন, কি ভাবিলেন, কি বুঝিলেন, তাঁহার বন্ধুরা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

১৮৪৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে বন্ধুগণের মধ্যে জনরব হইল যে, মধু খ্রীষ্টান হইবার জন্য মিশনারিদিগের নিকট গিয়াছে। অমনি সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হিন্দুকালেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকিল রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র খ্রীষ্টান হইতে যায়—এই সংবাদে

সকলের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টার অবধি রাখিলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উক্ত সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি তাঁহার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মনে কিরূপ আঘাত লাগিল। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মধু হিন্দুকালেজ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিধিমতে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য বিশপস্ কালেজে প্রবেশ করিলেন। এখানে তিনি ১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন, এবং এখানে অবস্থানকালে হিব্রু, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশপস্ কালেজেই বা কে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখে? তাঁহার বিলাত গমনের খেয়ালটার যে কি হইল তাহার প্রকাশ নাই; কিন্তু বঙ্গদেশ তাঁহার পক্ষে আবার অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার গতানুগতিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল, অবশেষে একদিন কাহাকেও সংবাদ না দিয়া একজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর সহিত মান্দ্রাজে পলাইয়া গেলেন।

মান্দ্রাজে গিয়া তিনি এক নূতন অভাবের মধ্যে পড়িলেন। অর্থের জন্য তাঁহাকে কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই। দেশে থাকিতে পিতামাতা তাঁহার সকল অভাব দূর করিতেন। সেখানে তাঁহাকে নিজের উদরান্ন নিজে উপার্জ্জন করিতে হইল। কিন্তু তিনি ইংরাজী রচনাতে যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার কাজের অভাব হইল না। তিনি মান্দ্রাজ সহরের ইংরাজ সম্পাদিত কতকগুলি সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। ১৮৪৯ সালে "Captive Lady" নামে একখানি ইংরাজী পদ্যগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। কিন্তু মহাত্মা বেথুনের ন্যায় ভাল ভাল ইংরাজগণ তাহা দেখিয়া বলিলেন যে, বিদেশীয়ের পক্ষে ইংরাজী কবিতা লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করা মহা ভ্রম, তদপেক্ষা এরূপ প্রতিভা স্বদেশীয় ভাষাতে নিয়োজিত হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারে।

তাঁহার প্রতিভা আবার তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সেখানে একজন ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটি ইংরাজমহিলাকে পত্নীভাবে লইয়া ১৮৫৬ সালে আবার দেশে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু হায় দেশে আসিয়া কি পরিবর্ত্তনই দেখিলেন! পিতা মাতা এ জগতে নাই; আত্মীয় স্বজন বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁহাকে মন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন; পৈতৃক সম্পত্তি অপরেরা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, বাল্যসুহৃদ ও সহাধ্যায়িগণ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন; এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন; নব্যবঙ্গের রঙ্গভূমিতে নূতন একদল নেতা আসিয়াছেন, তাঁহাদের

ভাব গতি অন্য প্রকার; এইরূপে মধুসূদন স্বদেশে আসিয়াও যেন বিদেশীয়দিগের মধ্যে পড়িলেন। এই অবস্থাতেই তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাকের সাহায্যে কলিকাতা পুলিস আদালতে ইণ্টারপ্রিটারি কর্ম্ম পাইয়া, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

কিরূপে তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বাবু তাঁহাকে পাইকপাড়ার রাজাদ্বয়ের ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, কিরূপে তাঁহারা সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় করান ও তৎসূত্রে উক্ত অনুবাদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কিরূপে মধুসূদন শিক্ষিতব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হন, তাহা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। বলিতে কি ঐ রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ মধুসূদনের প্রতিভা বিকাশের হেতুভূত হইল। তিনি সংস্কৃত নাটক রচনার রীতির দোষগুণ ভাল করিয়া অনুভব করিলেন; এবং নবপ্রণালীতে বাঙ্গালা নাটক রচনার বাসনা তাঁহার অন্তরে উদিত হইল। তিনি তদনুসারে ১৮৫৮ সালে "শর্ম্মিষ্ঠা" নামক নাটক রচনা করিয়া মুদ্রিত করিলেন। মহা সমারোহে তাহা বেলগাছিয়া বঙ্গালয়ে অভিনীত হইল। তৎপরেই মধুসূদন প্রাচীন গ্রীসদেশীয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া "পদ্মাবতী" নামে আর একখানি নাটক রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থে তিনি যশোলাভে কৃতকার্য্য হইয়া বাঙ্গালা ভাষাতে গ্রন্থ রচনা বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরেই তিনি "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামে দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। তৎপরে ১৮৬০ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক পত্রে তাঁহার নব অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; এবং অল্পকাল পরেই পুস্তাকাকারে মুদ্রিত হয়। তিলোত্তমা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন পথ আবিষ্কার করিল। বঙ্গীয় পাঠকগণ নূতন ছন্দ, নূতন ভাব নূতন ওজস্বিতা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মধুসূদনের নাম ও কীর্ত্তি সর্ব্বসাধারণের আলোচনার বিষয় হইল।

ইহার পরে তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্য রচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইহাই বঙ্গসাহিত্য সিংহাসনে তাঁহার আসন, চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিতকার সত্য কথাই বলিয়াছেন এবং আমাদেরও ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় যে, তাঁহার লেখনী যখন "মেঘনাদের" বীররস চিত্রণে নিযুক্ত ছিল, তখন সেই লেখনীই অপরদিকে "ব্রজাঙ্গনার" সুললিত মধুর রস চিত্রণে ব্যাপৃত ছিল। এই ঘটনা তাঁহার প্রতিভাকে কি অপূর্ব্ববেশে আমাদের নিকট আনিতেছে! একই চিত্রকর একই সময়ে কিরূপে এরূপ দুইটি চিত্র চিত্রিত করিতে পারে! দেখিয়া মনে হয়, মধুসূদনের নিজ প্রকৃতিকে দ্বিভাগ করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাহার জন্যই বোধ হয়

এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে, এত ঘনঘোর বিষাদের মধ্যে, এত জীবনব্যাপী অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যে বসিয়া তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেন!

যাহা হউক তিনি কলিকাতাতে আসিয়া একদিকে যেমন কাব্য-জগতে নবযুগ আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে নিজ প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন ও যাহা কিছু নিজে উপার্জ্জন করিতেন, হিসাব করিয়া চলিতে পারিলে তাহাতেই একপ্রকার দিন চলিবার কথা ছিল। কিন্তু পিতামাতার যে আদুরে ছেলে জীবনে একদিনের জন্য আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, সে আজ তাহা করিবে কিরূপে? কিছুতেই মধুর দুঃখ ঘুচিত না। প্রবৃত্তিকে যে কিরূপে শাসনে রাখিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিতেন প্রবৃত্তি চরিতার্থতাই সুখ। রাবণ তাঁহার আদর্শ, "ভিখারী রাঘব" নহে; সুতরাং হস্তে অর্থ আসিলেই তাহা প্রবৃত্তির অনলে আহুতির ন্যায় যাইত! সুখের জোয়ার দুইদিনের মধ্যে ফুরাইয়া, মধু ভাঁটার কাটখানার মত, যে চড়ার উপরে সেই চড়ার উপরে পড়িয়া থাকিতেন! কেহ কি মনে করিতেছেন ঘৃণার ভাবে এই সকল কথা বলিতেছি? তা নয়। এই সরস্বতীর বরপুত্রের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারি না; অথচ এই কাব্যকাননের কলকণ্ঠ কোকিলকে ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পারি না। অন্ততঃ তাঁহাতে একটা ছিল না; প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল না। কপটতা বা ভণ্ডামির বিন্দুমাত্র ছিল না। এই জন্য মধুকে ভালবাসি। আর একটা কথা, এমন প্রাণের তাজা ভালবাসা মানুষকে অতি অল্পলোকেই দেয়, এজন্যও মধুকে ভালবাসি।

মধুসূদনের প্রতিভা আবার তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইংরাজ কবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, 'কবিগণ পাগলের সামিল।' তাই বটে, ১৮৬১ সালে মধুসূদনের মাথায় একটা নূতন পাগলামি বুদ্ধি আসিল। সেটা এই যে, তিনি বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইবেন। লোকে বলিতে পারেন, এটা আবার পাগলামি কি? এ ত সদ্বুদ্ধি। যদি এ পৃথিবীতে বারিষ্টারি করিবার অনুপযুক্ত কোনও লোক জন্মিয়া থাকেন, তিনি মধুসূদন দত্ত। তাঁহার প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে বারিষ্টারির বিপরীত বস্তু ছিল; আইন আদালতের গতি লক্ষ্য করা, মক্কেলদিগের কাছে বাঁধা থাকা, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কাজ করা, তিনি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন না। ১৮৬২ সালের জুনমাসের প্রারম্ভে পত্নী ও শিশু কন্যা ও পুত্রকে রাখিয়া বারিষ্টার হইবার উদ্দেশে বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া ৫ বৎসর ছিলেন। এই পাঁচ বৎসর তাঁহার দারিদ্র্যের ও কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না। যাহাদের প্রতি নিজের বিষয় রক্ষা ও অর্থসংগ্রহের ভার দিয়া গিয়াছিলেন

এবং যাহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া স্ত্রী পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সে বিশ্বাসানুরূপ কার্য করিল না। হায়! দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে! তাঁহার স্ত্রী পুত্র কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮৬৩ সালে বিলাতে তাঁহার নিকট পলাইয়া গেল। তাহাতে তাঁহার ব্যয়বৃদ্ধি হইয়া দারিদ্র্য ক্লেশ বাড়িয়া গেল। তিনি ইংলণ্ডে প্রাণধারণ করা অসম্ভব দেখিয়া, ফরাসিদেশে পলাইয়া গেলেন। সেখানে ঋণদায় ও কয়েদের ভয়ে তাঁহাব দিন অতিকষ্টেই কাটিতে লাগিল। অনেক দিন সপরিবারে অনাহারে বাস করিতে হইত; প্রতিবেশিগণের মধ্যে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের সাহায্যে সে ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেন। এরূপ অবস্থাতেও তিনি কবিতা রচনাতে বিরত হন নাই। এই সময়েই তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচিত হয়। ইহাই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার শেষফল বলিলে হয়। ইহার পরেও তিনি কোন কোনও বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই।

বিদেশবাসের দুঃখ কষ্টের মধ্যে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দুঃখের কথা জানিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যথা সময়ে তাঁহার সাহায্য না পাইলে, আর তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসা হইত না। যাহা হউক তিনি উক্ত মহাত্মার সাহায্যে রক্ষা পাইয়া কোনও প্রকারে বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বারিষ্টারি কার্য্যে সুদক্ষ হইবার উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁর ছিল, ছিল না কেবল স্থিরচিত্ততা। তাঁহার মনের স্থিতি-স্থাপকতা শক্তি যেন অসীম ছিল। তিনি দুঃখের মধ্যে যখন পড়িতেন, তখন ভাবিতেন, আপনার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া চলিবেন, কিন্তু স্কন্ধের জোয়ালটা একটু নামাইলেই নিজ মূর্ত্তি ধরিতেন, আবার সুখের আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেন। দেশে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার নাম সম্ভ্রম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সাহায্য করিবার লোক আছে, যদি আপনাকে একটু সংযত করিয়া, নিজ কর্ত্তব্যে মন দিয়া বসিতেন, বারিষ্টারিতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু পাগলা কীটে তাঁহাকে সুস্থির বা সংযত হইতে দিল না। তিনি কয়েক বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য বিফল চেষ্টা করিলেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালের জুন মাসে নিতান্ত দৈন্যদশায় উপায়ান্তর না দেখিয়া কলিকাতা আলিপুরের জেনারেল হস্পিটাল নামক হাসপাতালে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা তখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ানা! মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে হেনরিয়েটার মৃত্যু হইল। মৃত্যুশয্যাতে সমগ্র জীবনের ছবি মধুসূদনের স্মৃতিতে উদিত হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়াছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট খ্রীষ্টধর্মে অবিচলিত বিশ্বাস স্বীকার পূর্ব্বক ও পরমেশ্বরের নিকট নিজ দুষ্কৃতির জন্য

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সাল, ২৯শে জুন রবিবার তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন।

যে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত কালকে বঙ্গসমাজের মাহেন্দ্রক্ষন বলিয়াছি, সেই কালের মধ্যে আর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যে যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেখা দিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব। এক্ষণে এই কালের অন্তর্গত দুই একটি ঘটনা আনুষঙ্গিকরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কালা আইন (Black Acts) এর আন্দোলনের উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। সে আন্দোলন একবার উঠিয়া থামিয়াছিল মাত্র। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে আবার সেই আন্দোলন উঠে। অনেক দিন হইতে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্টের জজগণ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, মফস্বলবাসী ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর ফৌজদারি আদালতের অধীন না করিলে, এদেশীয় গরীব প্রজাদিগের উপরে তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারা যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা কর্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের কর্ণগোচর হওয়াতে সেই মনের ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তদনুসারে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে, কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস্ সুপ্রসিদ্ধ সার বার্ণেস পীকক্ গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রিসভাতে কোম্পানির মফস্বলস্থ ফৌজদারি আদালতের এলাকা বর্দ্ধিত করিবার ও ইংরাজগণকে তদধীন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিল উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাজগণের মধ্যে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু এবারে তাঁহারা কোম্পানীর আদালতের অধীন হইব না, এই রবটি না তুলিয়া, এদেশীয় বিচারকদিগের বিচারাধীন হইব না এবং ইংরাজ জুরির সহায়তা ভিন্ন তাঁহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন। ইহা কতকটা ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের ন্যায়। ইংরাজদিগের চেম্বার অব কমার্স, ট্রেড্‌স এসোসিয়েশন, ইণ্ডিগো প্লাণ্টার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি সমুদয় সভা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন। রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান সভ্যগণ এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকিলেন না। তাঁহারা হরিশের ও হিন্দু পেট্রিয়টের সাহায্যে দেশের লোককে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। দেশের মান্য গণ্য সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল মাসে টাউনহলে এক সভা করিলেন। ঐ সভাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টারদিগের নিকটে প্রেরণের জন্য এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদন পত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরেই মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবর্ত্তী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করা হয় নাই। এদেশীয়দিগের আবেদন পত্রের দশা যাহা হয়, ঐ আবেদন পত্রের দশাও তাহাই হইয়াছিল। রাজারা যাহা ভাল বুঝিলেন তাহাই

করিলেন। আবেদনকারীদিগের ফেউ ফেউ করা সার হইল। এপ্রেল মাসে টাউনহলে যে সভা হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে সুবিখ্যাত বাগ্মী জর্জ্জ টম্‌সন্ সাহেবের উপস্থিতি একটি বিশেষ ঘটনা। তিনি ঐ সালে আবার একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎপরে বোধ হয় মিউটিনীর গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে নিজ কার্য্যসাধনের সুযোগ না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কালের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পশ্চাতে রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবঙ্গের তদানীন্তন নেতা ও ডিরোজিও শিষ্যদলের অগ্রণী ব্যক্তিগণ উৎসাহদাতারূপে ছিলেন। কাহার কাহারও মুখে এইরূপ ক্ষোভের কথা শুনিতে পাই যে, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হরিশকে সুরাপানে লিপ্ত করিয়াছিলেন। এ অপবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না, তবে তাঁহারা যে হরিশের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে, লাহিড়ী মহাশয়ও এই উৎসাহদাতা বন্ধুদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার সময়ে আমরা তাঁহাকে বারাসতে রাখিয়া আসিয়াছি। বারাসত হইতে তিনি ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয়বার কৃষ্ণনগর কালেজে যান।

কৃষ্ণনগর হইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী রসাপাগলা নামক স্থানে টিপু সুলতানের বংশীয়দিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। টিপু সুলতান নিহত হইলে ইংরাজগণ যখন তাঁহার বংশীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনেন, তখন তাঁহাদিগকে অযোধ্যার নবাবের ন্যায় কলিকাতার উপকণ্ঠেই রাখা স্থির করেন। তদনুসারে রসাপাগলা নামক স্থানে তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। ইহাদিগকে রসাতে স্থাপন করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বংশধরগণের শিক্ষার উপায় বিধানার্থ অগ্রসর হন। মহা সমারোহে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় সেখানে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে গমন করেন, তখন মিঃ স্কট্ নামে একজন ইংরাজ হেডমাষ্টার ছিলেন। সে সময়ে যাঁহারা রসাপাগলা স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবার ভার তাঁহার প্রতি ছিল; সেই সকল বিষয় তিনি এমন সুন্দররূপে পড়াইতেন যে, ছাত্রগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় থাকিত। তাঁহার ভূগোল পাঠনার রীতির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছাত্রেরা বুঝুক, না বুঝুক, ভালবাসুক, না বাসুক, তাহাদের মস্তিষ্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেই হইবে, এ রীতিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি যে বিষয় ছাত্রদিগকে শিখাইতে যাইতেন, সে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতূহল

জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। তৎপ্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া সমগ্র বিষয়টি তাহাদের মনের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন; তৎপরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসু দেখিয়া সেই জ্ঞাতব্য বিষয়টি তাহাদের নিকট উপস্থিত করিতেন। একবার তাহা উত্তম রূপে বিবৃত করিয়া তৎপরেই আবার প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রদিগের মুখ হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে বিষয়টি জন্মের মত ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। ইহার ভিতরে যদি ছাত্রদিগের অন্তরে কোনও মহৎ সত্য বা উদার ভাব মুদ্রিত করিবার অবসর আসিত তাহা হইলে তিনি উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তখন আর পাঠ্য বিষয়ে মন থাকিত না। এই সকল কারণে পাঠ্যগ্রন্থে পাঠের উন্নতি আশানুরূপ হইত না। সেজন্য তিনি কখন কখনও কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয়ে অধিক উন্নতি করিত না বটে, কিন্তু যেটুকু পড়িত তাহাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিত, এবং তদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া সুশিক্ষিত হইত। কেবল তাহা নহে, হৃদয় মন চরিত্রে এমন কিছু পাইত যাহা চিরদিনের মত জীবনপথের সম্বল হইয়া থাকিত। রসাপাগ্‌লাতে লাহিড়ী মহাশয় যে অল্পকাল ছিলেন, তাহার মধ্যেও অনেক যুবককে প্রকৃত সাধুতার পথ দেখাইয়া যান।

রসাপাগ্‌লাতে অবস্থান কালে তিনি কলিকাতার অতি সন্নিকটেই থাকিতেন। সুতরাং সর্ব্বদাই কলিকাতার বন্ধুদিগের সহিত গিয়া মিশিতেন। রামগোপাল ঘোষের ভবন তাঁহার নিজের বাড়ীর মত ছিল। অবসর পাইলেই সেখানে গিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। সেই সূত্রে তৎকালপ্রসিদ্ধ প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ ও আত্মীয়তা হইয়াছিল। অবশ্য তিনি সুরাপানের গোষ্ঠীতে থাকিতেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইত যে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অপর সকলকে সংযত হইয়া চলিতে হইত। কেহই অভদ্র আচরণ করিতে সাহস করিত না। আমি লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, এই সময়ে তিনি একটি বিশেষ কারণে বহুদিনের জন্য সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সম্পর্কীয় একটি যুবক অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া অতি অভদ্র আচরণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার অতিশয় লজ্জা বোধ হইল। তিনি রামগোপাল ঘোষকে বলিলেন—"দেখ রামগোপাল, আমাদের সুরাপান দেখিয়া বাড়ীর ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে। আজ তোমার * * * এর অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি। এস আমরা সুরাপান পরিত্যাগ করি।" রামগোপাল বাবু বোধ হয় সে উপদেশ গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু তদবধি লাহিড়ী মহাশয় বহুকাল সুরাপান করেন নাই। পুরাতন বন্ধুদিগকে ভালবাসিতেন; সুরা-গোষ্ঠীতে থাকিতেন; কিন্তু সুরাপান করিতেন না। এ নিয়ম বহুবৎসর ছিল। পরে অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তারদিগের ও

বন্ধুগণের পরামর্শে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়। আমার বিশ্বাস তাহাতে তাঁহার দেহ মনেব মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল।

রসাপাগলা হইতে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬০ সালের প্রারম্ভে বরিশাল জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া গমন করেন। সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন। কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে ছাত্রগণেব মনে অবিনশ্বর স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট পাঠ কবিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন প্রাচীন। তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, মধুবিন্দুর চাবিদিকে যেমন পিপীলিকাশ্রেণী জোটে, তেমনি সন্ধ্যার সময় বালকগণ লাহিড়ী মহাশয়ের চারিদিকে জুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে তাহাদেব মধ্যে সমাসীন হইয়া বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন, এবং কথোপকথনচ্ছলে নানা তত্ত্ব তাহাদের গোচব করিতেন। ইহার আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুরুজনের নিকট তিরস্কার সহ্য করিয়াও সেখানে আসিতে ছাড়িত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিরজীবনের মত সাধুভাব দিকে গতি পাইয়াছে। তাঁহারা এক একজন এখন কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। সকলেই লাহিড়ী মহাশয়কে চিরদিন গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা কবিয়া আসিয়াছেন, এবং এখনও তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন।

বরিশাল হইতে ১৮৬১ সালেব এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় আবার কৃষ্ণনগর কালেজে আসিলেন। এই কৃষ্ণনগর কালেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের নবেম্বর মাসে পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। তিনি যখন পেন্সনের জন্য আবেদন করেন তখন মিঃ অল্‌ফ্রেড স্মিথ কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টাবের নিকট প্রেরণ করিবার সময় স্মিথ্‌ সাহেব লিখিয়াছিলেন :—

"In parting with Baboo Ram Tanoo Lahiri I may be allowed to say that Government will lose the services of an educational officer, than whom no officer has discharged his public duties with greater fidelity, zeal and devotion, or has laboured more assiduously and successfully for the moral elevation of his pupils."

অর্থ—বাবু রামতনু লাহিড়ীকে বিদায় দিবার সময় বলিতে চাই যে, ইনি চলিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট এমন একজন শিক্ষক হারাইবেন, যাঁহার অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্ততা, উৎসাহ ও তৎপরতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করেন নাই অথবা ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির জন্য অধিক শ্রম করেন নাই বা সে বিষয়ে অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করেন নাই।"

কালেজের অধ্যক্ষ তাঁহার পত্রে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা শত শত হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বাণীব পুনরুক্তি মাত্র। যদি কোনও মানুষের সম্বন্ধে এ কথা সত্য হয়—"তিনি শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছিলেন," তাহা লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে। তিনি যে শিক্ষকতা কার্য্যে অসাধারণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা এই বুঝিয়াছি যে, তিনি নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। কোনও নূতন বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার যে ব্যগ্রতা ও জানিলে যে আনন্দ দেখিয়াছি, অন্য কোনও মানুষে সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ দেখি নাই। উত্তরকালে যখন তিনি অশীতিপর স্থবির, তখনও কাহারও মুখে কোনও ভাল কথা শুনিলে, আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "বসো, রসো, কথাটা লিখেনি" এই বলিয়া স্মারক-লিপির পুস্তকখানি বাহির করিতেন। শিক্ষকাবস্থাতে ছাত্রগণকে যখন শিক্ষা দিতেন, তখন কোনও বালক যদি কখনও তাঁহার কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত বা তাঁহার কৃত কোনও ব্যাখ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা দিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি শিশুর ন্যায় বিনীতভাবে শুনিতেন, এবং ব্যাখ্যাটি উৎকৃষ্ট হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

এই কৃষ্ণনগর কালেজে শেষ অবস্থানকালের কয়েকটি গল্প শুনিয়াছি। একবার লাহিড়ী মহাশয় পাঠ্য বিষয়ের কোনও এক অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটি বালক বলিল, "মহাশয়, ওটার মানে ত ওরকম নয়।" তিনি অমনি তন্মনস্ক, "সে কি? তুমি কি আর কোনও অর্থ জান নাকি?" তখন বালকটি আর এক প্রকার ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্যাখ্যা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন, "এ মানে তুমি কোথায় পেলে?" অনুসন্ধানে জানিলেন, তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীয় বলিয়া দিয়াছেন। তখন প্রীত হইয়া বলিলেন—"এমন শিক্ষিত উপযুক্ত লোক যার ঘরে তার ভাবনা কি?" আর একটি গল্প ইহা অপেক্ষা সুন্দর। একবার একটি বালক তাঁহার প্রদত্ত কোন ব্যাখ্যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিল। তখন তিনি আর এক বার অধিকতর বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন অন্যতম শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন;—"তুমি আমার ক্লাসের ছেলেদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেও।" তখন ছাত্রমহলে, ছাত্রমহলে কেন দেশের শিক্ষিতদলে, সুপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া মহা খ্যাতি ছিল। তিনি আসিয়া যখন বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—"দেখিলে আমি ঠিক ব্যাখ্যাই দিয়াছিলাম, তবে ওঁর মত আমার ইংরাজীতে বিদ্যা নাই, তাই অমন সুন্দর করে বুঝাতে পারি নাই। ওঁর মত কয়টা মানুষ বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী জানে?" বাস্তবিক ইংরাজী বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্তের

প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বার্দ্ধক্যে ইংরাজী ভাষার কোনও বিষয় লইয়া আমাদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে নজীরের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "উমেশের চেয়ে তোমরা ইংরাজী জান কিনা!"

তাঁহার এই সময়ের শিক্ষকতা সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনিয়াছি, তাহা বোধ হয় শিক্ষকতা কার্য্যের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার চরিত্রে ছিল। অনেক শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদিগের সমক্ষে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন। নিজে যা জানেন না, সেটাও জানেন এইরূপ দেখান এবং কোনও রূপে জোড়াতাড়া দিয়া, গোঁজা মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস পান। বলা বাহুল্যমাত্র যে, লাহিড়ী মহাশয় এরূপ আচরণকে অতি নিন্দনীয় মনে করিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন করিলে, যদি তাহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন মনে করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন—"দেখ এটা আমার জানা নাই, জানিয়া কাল তোমাকে বলিব।" তৎপরে গৃহে গিয়া সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন বা বিশ্রামগৃহে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট জানিয়া লইতেন। পরে আসিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে জানাইয়া দিতেন।

যতদূর জানা যায়, বরিশালে থাকিবার সময়েই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং কৃষ্ণনগরে আসিয়াই তাঁহাকে কিছু দীর্ঘকালের জন্য ছুটী লইতে হয়। ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতার সন্নিকটে বালী উত্তরপাড়াতে ছিলেন। সেখান হইতে কৃষ্ণনগরেই গমন করেন এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ সালে পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। ১৮৫৭ সালের চৈত্রমাসে বৃদ্ধ পিতা রামকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করেন। লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করার পর তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এবং শেষ দশাতে কেবল ইষ্টদেবতার নাম করিয়াই দিন যাপন করিতেন। তাঁহার অবসান কাল সেইরূপ সাধুর প্রস্থানের উপযুক্তই হইয়াছিল। অপর দুই ঘটনা তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম। দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারের ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা ভাদ্র দিবসে কলিকাতা সহরে জন্ম হয়। ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরে তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান

১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত

এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে যে যে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দ্দেশ

করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব, মধুসূদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে নব আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক বৎসর আপনার কাজ করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। এই কালের মধ্যে নববঙ্গের কয়েকজন নূতন নেতা দেখা দিয়াছিলেন এবং বঙ্গবাসীর চিত্ত ও চিন্তাকে নূতন পথে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে। আপাততঃ তাঁহাদের কার্য্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায় বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজও সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় মানব-চক্ষুর গোচর হইল। ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ধ্যান ধারণাতে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাপন করিবার আশয়ে সহর ত্যাগ করিয়া হিমালয় শিখরে গমন করেন। ১৮৫৮ সালের শেষভাগে তিনি সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি কেশবকে আপনার প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। উভয়ের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের ন্যায় হইল। উভয়ে মিলিত হইয়া নব নব কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন।

১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার দেখা গেল। এক দিকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাঁহার চিরস্মরণীয় উপদেশগুলির মধ্যে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখনও শোনে নাই। সুতরাং সহরে ত্বরায় এই জনরব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়া ব্রাহ্মসমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণীর লোক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিনে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। একদিনের উপদেশ শুনিয়া আমরা সাতদিন মন স্থির রাখিতে পারিতাম না। হৃদয়ে কি নব ভাব জাগিত! চক্ষে কি নূতন জগৎ আসিত! এই সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদের আদর না হউক একদিন হইবেই হইবে। এমন সুন্দর ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। কিছু না হইলে ভাষার দিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য।

অপরদিকে যুবক কেশবচন্দ্রের উৎসাহাগ্নি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একাকী ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার পদবীর অনুসরণ

করিয়া তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। ইঁহাদের প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ব্রাহ্ম-সমাজে একপ্রকার নবশক্তির সঞ্চার হইল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মিলিত হইয়া এই সময়ে কয়েক প্রকার কার্য্যের আয়োজন করিলেন। প্রথম যুবকগণের ধর্ম্ম শিক্ষার্থ ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার প্রাতে ঐ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত; তাহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন। ঐ সকল উপদেশ দ্বারা অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ ব্রহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় যাঁহাবা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে লাাগিলেন এবং তদগ্রেই যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুসরণ কবিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কেশব এক সুহৃদ্গোষ্ঠী স্থাপন করিলেন; সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের জন্য বসিতেন। সেখানে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদিগের সুহৃদ্গোষ্ঠীর সঙ্গত সভা নাম দেখিয়া ইহার নাম সঙ্গত সভা রাখিলেন। এই সঙ্গত সভা ব্রাহ্মসমাজের নবশক্তির অদ্ভুত উৎসস্বরূপ হইল। যুবকসভ্যগণ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আত্মোন্নতি প্রার্থী হইয়া সঙ্গতের আলোচনাতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ কবিতেন এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত, তাহা সর্ব্বতোভাবে আচরণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাঁহাদের জ্ঞান থাকিত না, রাত্রি ৯টার সময়ে বসিয়া হয়ত ২টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত; কোথা দিয়া যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত না। এরূপ আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, এরূপ কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যানুসরণে চিত্তের একাগ্রতা, এরূপ হৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর সচরাচর দেখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেষ্টন করিয়া এক ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী সৃষ্ট হইল। ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলে ইঁহাদের অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চিরদারিদ্র্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং এখনও ইঁহাদের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

সঙ্গত সভার সভ্যগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে, হৃদয়ের বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। এই ভাব অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয়া

কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে দিলেন। এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলে অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

নবীন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদেব কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ও দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরাব" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল, কলিকাতা কালেজ নামে এক উচ্চশ্রেণীব বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, তাহা নবীন ব্রাহ্মদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল; এবং সর্ব্ববিধ সদালোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলেই নারীজাতির উন্নতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। সংগতের অবলম্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে নারীজাতিব উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটি প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তদনুসারে নবীন ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্নী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিব শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সাযংকালে স্বীয় স্বীয় পত্নী বা ভগিনীর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটি স্ত্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেব নানা উপায় অবলম্বন কবেন, এবং তাঁহাদেব কয়েকজনে মিলিত হইয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহিব করিতে আরম্ভ করেন। সে পত্রিকা অদ্যাপি রহিয়াছে। প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ এখনও তাহাকে রক্ষা কবিতেছেন।

১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকা-সমাজ নামে নারীগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচার্য্যের কার্য্য করিতে থাকেন। ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখা দিলেন; তাঁহারা নারীজাতির উন্নতির জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না; কিন্তু আপনাপন পত্নীকে নববেশে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ্যস্থানে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা লইয়া চারিদিকে মহা সমালোচনা আরম্ভ হইল। এই কালের শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্নীকে লইয়া গবর্ণর জেনেরালের বাড়ীতে বন্ধু-সম্মিলনে যান, তাহাতেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধ্যে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল।

যাহাহউক প্রাচীন দলের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, ইঁহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কার্য্যের একতা বহুদিন রহিল না।

নবীন ব্রাহ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্য্যতঃ উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র করিলেন; "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল।

১৮৮৬ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মদল মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা ভারতে নানা প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিন্তার ও চর্চ্চার অনেক অংশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান দ্বারা বঙ্গসমাজে যখন আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখা গেল। ইহার কিছু পূর্বে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি হিন্দুপেট্রিয়ট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে হাঙ্গামার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্লাধিক পরিমাণে উত্তেজিত, তখন ১৮৬০ সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছু জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; ঘটনা সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না, নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল, মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অস্ত্র অস্ত্র না পাইলে যেত দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। এই নীলদর্পণকে অবলম্বন করিয়া লং-এর কারাগার প্রভৃতি বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁহার নাটক সকলে চিরন্তন রীতি ত্যাগ করিয়া যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর হইলেন। এই নূতন রীতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব স্পৃহণীয় হইল। পর পরিচ্ছেদে মিত্র মহাশয়ের জীবন-চরিতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, তিনি কর্ম্মসূত্রে নানা দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর কেহ তাঁহার স্থায় নানা স্থানে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার এই ভূয়োদর্শন তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র সকল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পরে দীনবন্ধু আরও যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহার বিবরণ তাঁহার জীবন-চরিতে দেওয়া গেল।

দীনবন্ধু যেমন তাঁহার নাটকগুলির দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যে নবভাব ও বাঙ্গালির মনে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন, তেমনি এইকালের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখা দিলেন,—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন যেমন চিরাগত রীতি-পাশ ছিন্ন করতঃ বঙ্গীয় পদ্য সাহিত্যকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব আকাঙ্ক্ষা ও নব শক্তির অবতারণা করিলেন, গদ্য সাহিত্যে সেই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। তৎপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃত-বহুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারী হইয়া ধনীগৃহের রমণীগণের ন্যায় অলঙ্কারভারে প্রপীড়িতা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও একদল ইংরাজী শিক্ষিত কাব্যানুরাগী লোক এই সংস্কৃত ভাষাভারে পীড়িতা বঙ্গভাষাকে কিরূপে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং কিরূপে তাঁহারা আলালী ভাষা নামে একপ্রকার তাজা তাজা বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার যে এই নব ভাষার জন্মদাতা ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রকাশিত "মাসিক পত্রিকা" যে এই ভাষার ভেরীনিনাদ ছিল, তাহাও অগ্রে নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু ঐ "আলালী" ভাষা গ্রাম্যতা দোষে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথা "টক্ টক্ পটাস্ পটাস্ মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে টিট্‌কারি দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিয়া লেজ মুচ্‌ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।" ইত্যাদি ভাষা যে গ্রন্থে বা পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যতা দোষ ঘটে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং এই আলালী ভাষা বঙ্গীয় পাঠক বৃন্দের সম্পূর্ণ ভাল লাগিত না।

ইহার পরে হুতোমের নক্সা প্রকাশিত হয়। তাহাও প্রায় এই আলালী ভাষাতে লিখিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নক্সা লিখিয়া অমর

হইয়াছেন। তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও গ্রাম্যতা দোষের উপরে উঠিতে পারে নাই।

সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্যরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচনা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি। তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে "সোমপ্রকাশের" অভ্যুদয়। ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কিরূপে সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইয়া, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাহাদের দর্পণ নামক পত্রের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু "দর্পণ" ইংরাজদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভাষা ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হইত। প্রকৃত পক্ষে রাজা রামমোহন রায় এ দেশীয় দ্বারা লিখিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শক। তিনিই ১৮২১ সালে "সংবাদ কৌমুদী" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঐ "কৌমুদীতে" জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোক-শিক্ষার একটি প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ নিবারণ লইয়া হিন্দু সমাজের সহিত যখন রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষগণ "চন্দ্রিকা" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষাতে ও সংস্কারার্থীদিগের সহিত বাক্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৌমুদী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চন্দ্রিকা তৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকার আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে; এবং তদ্দ্বারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাই তাহার মুখ্য কার্য ছিল। দৈনিক সংবাদ যোগাইবার ভার

"প্রভাকর", "ভাস্কর" প্রভৃতি পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। 'ভাস্কর' গুড গুড়ে ভট্টাচার্য্য বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। এতদ্ব্যতীত সেই সময়ে আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত এক তালিকা হইতে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়;—যথা, মহাজন দর্পণ, চন্দ্রোদয়, রসরাজ, জ্ঞান দর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরঞ্জন, জ্ঞানসঞ্চারিণী, রসসাগর, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, রসমুদ্গর, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ও দুর্জ্জন দমন মহানবমী।

ইহাদের অধিকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। প্রভাকরে ও ভাস্করে এরূপ অভদ্র কটূক্তি চলিত যে তাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়। প্রভাকর ও ভাস্করের পদবীর অনুসরণ করিয়া "রসরাজ" ও "যেমন কর্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আরম্ভ করিল যে, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সুখের বিষয় অচির কালের মধ্যে দেশের লোকের নিন্দার বাণী উত্থিত হইল। চারিদিকে ছি ছি রব উঠিয়া গেল। কবির লড়াইও থামিয়া গেল।

বোধ হয় এই ছি ছি রবটা হৃদয়ে থাকাতেই একসময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়িতে বা বাঙ্গালা লিখিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তাহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি ইংরাজীতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজী পত্রের মধ্যে হরিশের Hindoo Patriot, রামগোপাল ঘোষের Bengal Spectator, কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intelligencer কিশোরীচাঁদ মিত্রের Indian Field সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের সময়েও এই ছি ছি রবটা প্রবল ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রবটা নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের জন্মের অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে এই ছি ছি রব নিবারণের আরও চেষ্টা হইয়াছিল। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও তৎপরে পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত "রহস্য-সন্দর্ভ" বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তাহা যদিও ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না বটে, তথাপি মিত্রজ মহাশয় উক্ত পত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামূল্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতাম। সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে।

সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কালেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত বটে, কিন্তু তাহা "আলালী ভাষাতে" লিখিত হইত, ইহা আগেই বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। সে দিনের কথা

আমাদের বেশ স্মরণ আছে। এ কাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে বাহির করিল, বলিয়া একটা রব উঠিয়া গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয়ের গাম্ভীর্য্য। সংবাদ পত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল। বিদ্যাভূষণ জানিতেন তাঁহার উক্তির মূল্য কত। কাগজ সাপ্তাহিক হইল, কিন্তু মূল্য হইল বার্ষিক দশ টাকা, তাহাও অগ্রিম দেয়। ইহাতেও সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব মাধ্যন্দিন রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল। সেই কারণেই এই কালের মধ্যে তাহার উল্লেখ করিলাম।

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ভাষার চটক ও রচনায় নিপুণতা আরও বাড়িয়াছে; রাজনীতির চর্চ্চা বহুগুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু তদানীন্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে পারেন নাই। ভিতরকার কথাটা এই, লিখিবার শক্তির উপর সংবাদ পত্রের প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে যে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে অধিকাংশতঃ নির্ভর করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। সেই তেজস্বিতা, সেই মনুষ্যত্ব, সেই ঐকান্তিকতা, সেই কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সেই সত্যনিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই সোমপ্রকাশের প্রভাব দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য সামাজিক ঘটনা হোমিওপ্যাথি রাজ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন। কলিকাতা সহরে হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব ও তৎসম্বন্ধে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ রাজাবাবুর কার্য্য বিষয়ে অগ্রেই কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছি। ডাক্তার বেরিণি সাহেবকে অবলম্বন করিয়া রাজাবাবু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তাঁহারই সংশ্রবে আসিয়া অনেকগুলি যুবক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতেছিলেন। ইঁহাদের অনেকে পরে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশ বিদেশে হোমিওপ্যাথির বার্ত্তা লইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সর্বজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন করিল। তাহা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালী অবলম্বন। এলোপ্যাথির সহিত তুলনায় হোমিওপ্যাথি উৎকৃষ্টতর লোকের এ সংস্কার যে জন্মিল তাহা নহে, কিন্তু মত পরিবর্ত্তনের সময় ডাক্তার সরকারের যে তেজ, যে সত্যনিষ্ঠা, যে মনুষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল; এবং বঙ্গবাসীর মনে এক নব ভাব আনিয়া দিয়াছিল। এই সাহসী, সত্যপ্রিয় ও ধর্মানুরাগী পুরুষের জীবন চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম. ডি. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া সহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। ঐ সালেই প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডীভ চক্রবর্তীর প্রযত্নে, ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখা নামে একটি শাখা সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির নিন্দা করেন। ঐ নিন্দাবাদ রাজা বাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি মহেন্দ্রলালের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক কাগজের জন্য মহেন্দ্রলালকে (Morgan) মর্গান সাহেবের লিখিত হোমিওপ্যাথি বিষয় গ্রন্থের সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করেন। সমালোচনার্থ ঐ গন্থ পাঠ করিতে গিয়াই মহেন্দ্রলালের মনে হয় যে, কাযতঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহা না দেখিয়া সমালোচনা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজাবাবুর সহিত তাঁহার কতকগুলি রোগীর চিকিৎসা দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এবং চিকিৎসা দেখিতে দেখিতে সরকার মহাশয়ের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীই উৎকৃষ্টতর প্রণালী বলিয়া মনে হইল। ১৮৬৬ সালের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন তিনি মত পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট কারণ পাইলেন তখন সহরের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদলে তাহার বার্ত্তা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিলেন না। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তাহাতে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর অনির্দ্দিষ্টতা দোষ প্রদর্শন করিয়া হানিম্যান প্রদর্শিত প্রণালী উৎকৃষ্টতর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আর কোথায় যায়! সাপের লেজে যেন পা পড়িল! ডাক্তার ওয়ালার্ নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, "ডাক্তার সরকার থাম থাম, আর একটি কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে বাহির করে দেব।" তৎপরে সহরের এলোপ্যাথি দল ডাক্তার সরকারকে একঘরে করিল; তিনি চিকিৎসক সভা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। কলিকাতা তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গভূমি যেন এই বীরের পদভরে কাঁপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও মনুষ্যত্ব তখন আমাদের মনকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর, বাঙ্গালি যে ভারতের সকল প্রদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে, তাহা এই সকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্ বীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের গুণে।

মহেন্দ্রলাল সরকার স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপ্যাথিকে কিরূপ উঁচু করিয়া উঠাইলেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটি কথাতেই প্রকাশ। তিনি যখন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার হোমিওপ্যাথি বন্ধুগণ তাঁহার

অভ্যর্থনার জন্য এক সভা করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতে ডাক্তার বেরিণি, অপরাপর কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্য যখন উদিত হয় তখন চন্দ্রের অস্তগমনই শোভা পায়। মহেন্দ্র বঙ্গাকাশে উদিত হইয়াছেন, এখন আমার অস্তগমনের সময়"! অতএব অপরাপর নেতাদিগের ন্যায় মহেন্দ্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাতাবাসীর ও সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা "ন্যাসনাল পেপার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা, কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।

নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিদেশীয় রাজাদিগের প্রসাদ লাভের দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় স্বাবলম্বনের দিকে আনা কর্ত্তব্য। লোকে কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হয়, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। এজন্য তিনি নিজ প্রচারিত সংবাদ পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, বন্ধু বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ করিতেন, এবং কি উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। এই চিন্তার ফলস্বরূপ ১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সংগীতাদির চর্চ্চা, স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশ প্রভৃতির উৎসাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি মেলা খোলা স্থির হইল। দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি এইজন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব উদ্যোগকর্ত্তৃগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ত্রুটী করেন নাই।

১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই দিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত "গাও ভারতের জয়" সুগায়কদিগের দ্বারা গীত হয়, আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন, এবং স্বজাতি-প্রেমিক সাহিত্যজগতে সুপরিচিত মনোমোহন বসু মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণন করেন—"ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্য্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? * * * অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয় এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। ইহার পরে মনমোহন বসু প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন, আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম, বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন, এবং আগ্রার আনন্দচন্দ্র রায়, সঙ্গীত রচনা করিয়া দুঃখ করিলেন :—

কত কাল পরে বল ভারত রে।
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে, ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়।

এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা সমাজ নানা তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে পূর্ব্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিওর শিষ্যদলের অভ্যুদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীনবিদ্বেষী শিক্ষিত যুবককে আবির্ভূত করিয়াছিল সেইরূপ ঢাকাতেও শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার্থী দল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতাতে যেমন প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটি আনিতে ও খাইতে পারে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে, কে মুসলমানের

রুটী খাইতে পারে বা কে চর্ম্মপাদুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া খাইতে পারে।

ক্রমে ঢাকা কালেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষিতদলের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ সকল যতই পূর্ব্ববঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, ততই ঢাকা সহরে নব নব কার্য্যের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, বিধবা বিবাহের আন্দোলন প্রভৃতি সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দিল।

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন, ভগবানচন্দ্র বসু, অভয়াচরণ দাস, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, অভয়াকুমার দত্ত, স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর দীননাথ সেন ও পরবর্ত্তী সময়ের কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা একাগ্রতা দেখাইয়াছিলেন, দুই ব্যক্তি। প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা ব্রজসুন্দর মিত্র, দ্বিতীয় কৌলীন্য প্রথার সংস্কার প্রয়াসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় ১৮৪৭ সালে নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নিজ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, এবং অপরেরা অগ্রসর হইয়া তাহার ভার আপনাদের হস্তে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত নিজেই তাহার ভার বহন করেন। এই কালের মধ্যে ঢাকাতেও ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান ও তৎসঙ্গে সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতি বিষয়ক বিষয়ের আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল; এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজই সে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত দেওয়া যাইতেছে :—

ব্রজসুন্দর মিত্র

এই সাধু পুরুষ বাঙ্গালা ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হইয়া তাঁহাকে বাল্যকাল পরাশ্রয়ে ও পরগৃহে যাপন করিতে হয়। তৎপরে ইংরাজী শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আসিয়া ঘোর দারিদ্র্যে ও কঠোর সংগ্রামে কালযাপন করেন। শিক্ষা সাঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই সামান্য বেতনে কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাতে এরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মভীরুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা ছিল যে অচিরকালের মধ্যে উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়া তিনি উচ্চপদে আরোহণ করেন। পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উন্নতির বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইতে থাকে। তাঁহার দৃষ্টি প্রথম ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১২৫৩ বা ১৮৪৭ সালে, তিনি কতিপয় বন্ধুকে উৎসাহিত

করিয়া-ঢাকা নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন ; এবং আত্মীয় স্বজনের নিবারণ ও ভয় প্রদর্শনের মধ্যে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার পরে মিত্রজ মহাশয় সার্ভে ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইয়া কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাহাতে কিছু দিনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অবসাদ উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ বাসের জন্য ঢাকাতে একটি বাড়ী ক্রয় করেন এবং তাহার একাংশ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য রাখেন। সেই সময়ে তাঁহারই উৎসাহে এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি স্কুল স্থাপিত হয়, এবং কলিকাতা সমাজ হইতে প্রচারক অঘোরনাথ গুপ্ত ঐ স্কুলের একজন শিক্ষক রূপে এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সহকারী রূপে প্রেরিত হন। ইহা বোধ হয় ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে ঘটিয়া থাকিবে। এই প্রচারক দ্বয়ের আবির্ভাব পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদলে নবভাবের উদ্দীপনা করিল। তাহারা দলে দলে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই আন্দোলন দেখিয়া প্রাচীনদলের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের কার্য্যে নিরুৎসাহ হইলেন, কিন্তু ব্রজসুন্দর বাবু পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি সমান ভাবে যোগ দিয়া রহিলেন। কলিকাতাতে বিধবাবিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক সকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ এই কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিতদলের মধ্যে একটি বিধবাবিবাহের দল দেখা দেয়। তাঁহারা কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া এই সংস্কার-কার্য্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি যেখানে গিয়াছেন, এই সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন।

১৮৬২ সালে ব্রজসুন্দর বাবু স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য সকল আয়োজন করেন, কেবল তাঁহার জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতেই সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরকালে জননী পরলোকগতা হইলে তিনি স্বীয় কন্যাগণকে সুশিক্ষিতা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন।

বোধ হয় এই সময়েই ব্রজসুন্দর বাবুর উৎসাহে ও তাঁহার বন্ধুগণের সাহায্যে ঢাকাতে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যাহা পরে ১৮৭৫ সাল হইতে 'ইডেন ফিমেল স্কুল' নামে পরিচিত হইয়াছে। ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কিরূপ আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত "নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নারীজাতির উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময়ে প্রভূত ফল লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৪

সালে ব্রজসুন্দর বাবু স্বীয় গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন ; এবং অপরাপর প্রকারে কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকেন। এই রূপে নানা সৎকার্য্যে রত থাকিতে থাকিতে তিনি ১২৮২ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকাতে যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিলেন তাহা আর থামিল না। কলিকাতার অনুকরণে ঢাকাতেও যুবকদলের জন্য একটি সঙ্গত সভা স্থাপিত হইল ; এবং সেই সঙ্গতে বসিয়া যুবকগণ নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ১৮৬৫ সালে তিনি ঢাকাতে পদার্পণ করিলেন। যে উন্মাদিনী বক্তৃতাশক্তি কলিকাতার যুবকদলকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল তাহা ঢাকা ও ময়মনসিংহের যুবকগণকে মাতাইয়া তুলিল। দলে দলে যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে ধাবিত হইল। ইহার মধ্যে একটি মুসলমান যুবককে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ঢাকা সঙ্গতের অগ্রসর সভ্যগণ তাঁহাকে লইয়া পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা লইয়া ঘরে ঘরে বিবাদ বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মদের ধোপা নাপিত বন্ধ হইল। এমন কি মাঝি মাল্লারাও অনেক স্থলে তাহাদিগকে নৌকাতে তুলিতে ভয় পাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারিল না। এই সকল আন্দোলনের মধ্যে ঢাকায় নূতন উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং ১৮৬৯ সালের শেষভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় গিয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে ঢাকাতে যেমন এক দিকে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়া ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইল, তেমনি সর্ব্ববিধ সমাজ-সংস্কার কার্য্যে উৎসাহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কলিকাতার সোমপ্রকাশের ন্যায় "ঢাকা প্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দপ্রসাদ রায় নামক একজন উদারচেতা ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইল। তিনি উন্নতি-শীল দলের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া ইহাতে সর্ব্ববিধ অগ্রসরমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত, ব্রাহ্ম যুবকদিগের সাহসিকতা, এই সকলে প্রাচীন হিন্দুসমাজকে জাগাইয়া তুলিল। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য হিন্দু রক্ষিণী সভা ও "হিন্দু হিতৈষিণী" নামক সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইল। একদিকে "ঢাকা প্রকাশ" অপর দিকে "হিন্দু হিতৈষিণী" এই উভয় পত্রে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে সজাগ করিয়া তুলিল।

এই কালের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পূর্ব্ব-বঙ্গসমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি কৌলীন্য ও বহুবিবাহপ্রথার উন্মূলনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া মহা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

১২৩২ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাশা গ্রামে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয়া স্বীয় পিতৃব্যের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হন। বিদ্যা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত না হওয়াতে ইংরাজী শিক্ষা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা শিক্ষাও ভাল হয় নাই। ইঁহার পিতৃব্যও বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন না; তিনি দারিদ্র্যের তাড়নায়, স্বীয় কৌলীন্যের সাহায্যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৮টি কুলীন কন্যার সহিত পরিণীত করেন। কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ ঋণভার মস্তকে লইয়া রাসবিহারীকে স্বীয় পিতৃব্য হইতে পৃথক হইতে হয়। এই অবস্থাতে ঘোর দারিদ্র্যে পড়িয়া রাসবিহারী আরও ছয়টি কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং অর্থোপার্জ্জনের আশয়ে ময়মনসিংহের কোনও জমিদারের অধীনে তহসিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

ঐ কাজ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় মনের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা রচনা করিবার ও গান বাঁধিবার বাতিক ছিল। তাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতে এবং কবিতাদি প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। উপর্য্যুপরি কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং তাহার কয়েকখানি শিক্ষাবিভাগেও আদৃত হয়। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় নারীজাতির দুঃখে কাঁদিয়া উঠে; এবং শুনিতে পাওয়া যায় তিনি তাহার সারাংশ বাঙ্গালা কবিতাতে গ্রথিত করেন। এই সময় হইতে কুলীন কন্যাদিগের দুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি তাহাদের দুঃখ বর্ণনা করিয়া সংগীত রচনা পূর্ব্বক গ্রামে গ্রামে, কুলীনদিগের প্রধান প্রধান স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন।

১২৭৫ বঙ্গাব্দে তিনি আপনার হৃদগত ভাব "বল্লালী-সংশোধিনী" নামে একটি বক্তৃতাতে প্রকাশ করিয়া তাহা মুদ্রিত করিলেন। চারিদিকে আন্দোলন উঠিয়া গেল। এই নেশা তাঁহাকে দিন দিন এতই ঘিরিয়া লইতে লাগিল যে, তিনি আপনার তহসিলদারী কর্ম্ম আর রাখিতে পারিলেন না; সামান্য গ্রন্থাদির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বারে সভা সমিতিতে ঐ একই কথা বলিয়া ফিরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি সর্ব্বত্রই নির্য্যাতন ভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিণামে তাঁহার বিশুদ্ধচিত্ততা ও চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। "ঢাকাপ্রকাশ" "হিন্দুহিতৈষণী" প্রভৃতি এবং কলিকাতা হইতে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও "সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা" প্রভৃতি তাঁহার সপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে ও সাহায্যে বহুবিবাহ নিষেধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন প্রেরিত হয়, দুঃখের বিষয় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল মুখে সমাজ সংস্কারের উপদেশ দিয়া নিরস্ত হন নাই। ১২৮২ সালে কুলের পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তৎপরে ১২৮৪ সালে আবার মেল ভঙ্গ করিয়া স্বীয় পুত্র ও কন্যার বিবাহ দেন। সদৃষ্টান্ত বৃথা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় ইহার অল্প পরেই ১২ জন নৈকষ্য কুলীন ও ৮ জন শ্রোত্রীয় তাঁহার পদবীর অনুসরণ করেন। এই সকল সংস্কার কার্য্যে ব্রতী থাকিতে থাকিতে ১৩০১ সালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ভয় হয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সংস্কার কার্য্য বা বিলীন হইয়া গেল। এ সকল ঘটনা পরবর্ত্তী সময়ে ঘটিলেও এখানে উল্লেখ করিলাম।

এই কালের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের অপরাপর স্থানেও ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে বরিশাল সর্ব্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাস মহাশয় এই সময়ে বরিশালে ওকালতি করিতেন। তিনি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের অনুরাগী লোক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি আধা আধি কোনও কাজ করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা প্রাণ দিয়া করিতেন, ক্ষতিলাভ গণনা করিতেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যখন তাঁহার অনুরাগ জন্মিল তখন তিনি বরিশালে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। স্বীয় ব্যয়ে কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মপ্রচারককে সপরিবারে বরিশালে লইয়া গেলেন; এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মপরিবারের নারীগণের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবব্রাহ্মপ্রচারকদিগের সমাগমে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বরিশালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অগ্রসর সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রীজাতিকে সামাজিক স্বাধীনতা দান, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। অনেক বিধবার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল; তন্মধ্যে দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্ব্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। নিজে উদ্যোগী হইয়া বিমাতার বিবাহ দেওয়া ইহার পূর্ব্বে ঘটে নাই, হয় ত পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই কার্য্যে শুধু বরিশাল কেন সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে লাখুটিয়ার জমিদার পরিবারের একজন যুবক স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে লইয়া জেলার কমিশনর সাহেবের বাড়ীতে আহার করিতে গেলেন। তাহা লইয়াও সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন চলিল! বলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, এখনও সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এই সমুদয় চেষ্টা ও আন্দোলন প্রধানতঃ ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত, এই কালের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

এই কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর বিভাগে যে জাতীয় জীবনের সঞ্চার দেখা গিয়াছিল তাহাও বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে,

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতাতে বসিবার পূর্ব্বে রঙ্গপুরকেই নিজ কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তখন রঙ্গপুর মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মধ্যে কেন যে রঙ্গপুর কিছুদিন পশ্চাতে পড়িয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক রঙ্গপুর বিভাগে জাতীয় উন্নতির চেষ্টা কখনই বিরত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক বাহাদুর রঙ্গপুরে গমন করেন। সেই সুযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ন্যাথানিয়েল জমিদারগণকে উৎসাহিত করিয়া "রঙ্গপুর জমিদারদিগের স্কুল" নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ জমিদারস্কুলের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হওয়াতে, এই কালের প্রথম ভাগে, গবর্ণমেণ্ট নিজে ঐ স্কুলের ভার লইয়া তাহাকে রঙ্গপুর জেলা স্কুলে পরিণত করে। তৎপরে পরবর্ত্তী সময়ে ঐ স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করা হইয়াছিল, পরে কালেজ ক্লাস আবার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রঙ্গপুরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দিকেও উন্নতির স্পৃহা দৃষ্ট হইতে থাকে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সন্তঃপুষ্করিণীর জমিদার রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পরে কাকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে যায় এবং তিনি ইহাকে "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। যে কালের আলোচনা করিতেছি সে সময়ে কাকিনাই রঙ্গপুরের মধ্যে জ্ঞানালোচনা ও সদনুষ্ঠানাদির জন্য প্রধান স্থান হইয়া উঠে। প্রথমে শম্ভুচন্দ্র, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজা মহিমারঞ্জন, ঐ সুখ্যাতি অর্জ্জনের প্রধান কারণ হইয়া উঠেন। শম্ভুচন্দ্রের সমুদয় কীর্ত্তির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালা ১২৭০ সালে মহিমারঞ্জন কাকিনাতে এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দে কাকিনা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ রঙ্গপুরেও ব্যাপ্ত হইয়া ইহাকে উজ্জীবিত করে। ক্রমে রঙ্গপুর সহরেও একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত এবং ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হয়। মধ্যে রঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের কিঞ্চিৎ ম্লানতা হইয়াছিল। আবার রঙ্গপুর মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লাহিড়ী মহাশয় যখন রসাপাগলা হইতে বরিশাল ও বরিশাল হইতে কৃষ্ণনগরে বদলী হইয়া শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ শিক্ষকতা কার্য্য হইতে

অবসর গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই কালের মধ্যে বঙ্গসমাজে পাঁচটি প্রবল শক্তি দেখা দিল। ইহার আভাস পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয়; দ্বিতীয় শক্তি দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকাব্যের অভ্যুদয়; তৃতীয় শক্তি বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব; চতুর্থ শক্তি সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়; পঞ্চম শক্তি চিকিৎসা-জগতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অভ্যুদয়। পাঁচটি মানুষ, কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও মহেন্দ্রলাল সরকার এই কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিত্তকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরিচ্ছেদে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দেওয়া যাইতেছে;—

কেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্র সেন হুগলী জেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌরীভা-নিবাসী ও কলিকাতার কলুটোলা-প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ দিবসে কলুটোলাস্থ ভবনে ইঁহার জন্ম হয়। যাঁহারা প্যারীমোহন সেনকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ও পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, শান্ত, শিষ্ট, প্রসন্নমূর্ত্তি। কেশবচন্দ্র পিতার ভক্তির-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার জননীদেবীও সদাশয়তা ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র এই পিতা মাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি শান্ত, শিষ্ট, সাধুতানুরাগী, ধীমান বালক ছিলেন। ইঁহার বয়ঃক্রম যখন অনুমান ছয় বৎসর তখন ইঁহার পিতামহের মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা প্যারীমোহন সেনও ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন একাদশ বৎসর মাত্র ছিল। পিতৃবিয়োগের পর, জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন ইঁহাদের অভিভাবক হন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানের অধীনে কেশবচন্দ্র বর্দ্ধিত হন।

১৮৪৫ সালে সাত বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৫২ সালে হিন্দুকালেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে বিবাদের ফলস্বরূপ খ্যাতনামা রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৫৩ সালে মেট্রপলিটান কালেজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয় এই বিবাদে "রাজা বাবুর" পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; সুতরাং তিনি কেশবচন্দ্রকে হিন্দুকালেজ হইতে তুলিয়া লইয়া উক্ত কালেজে দিলেন। ১৮৫৪ সালে মেট্রপলিটান কালেজ উঠিয়া গেলে কেশবচন্দ্র আবার হিন্দুকালেজে আসিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে একবার বার্ষিক পরীক্ষার সময় কোনও অপরাধে লিপ্ত হওয়াতে তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। শান্ত, সুধীর, সর্ব্বজন-প্রিয়

কেশবচন্দ্রের মনে ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে। চিরদিন তাঁহার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান অতিশয় প্রবল ছিল। সুতরাং এই অপমান তাঁহার প্রাণে শেল-সম বাজিল; তিনি সমবয়স্কদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; ঘোর বিষাদের মধ্যে পতিত হইলেন; এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আত্মোন্নতির জন্য ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুমান করি ইহাই তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১৮৫৬ সালে তিনি আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারি ড্যাল সাহেব ও সুবিখ্যাত পাদরী লং সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপন করেন। ঐ সভার অপরাপর কার্য্যের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাস ভবনে বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যার্থ একটি সায়ংকালীন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র কতিপয় বয়স্যের সহিত সেখানে প্রতিদিন বালকদিগকে পড়াইতেন। আমার সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী কেহ কেহ এই ১৮৫৬ সালে ঐ স্কুলে সন্ধ্যার সময় পড়া করিতে যাইত। আমি তাহাদের মুখে তখনি কেশবচন্দ্রের প্রশংসা শুনিতাম।

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামের কুলীন বৈদ্যপরিবারস্থ চন্দ্রকুমার মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৫৭ সাল হইতে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মভাব ও কর্ম্মোৎসাহ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঐ সালে তিনি পূর্ব্বোক্ত যৌবন-সুহৃদগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনার ভবনে Good Will Fraternity নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। ঐ সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্ম্মাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেন; এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতেন বা মৌখিক বক্তৃতা দিতেন। এই সভাতে তাঁহার ভাবী বাগ্মিতার সূত্রপাত হইল এবং এখান হইতে একদল যুবক তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই সভার সম্বন্ধ-সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমাধ্যায়ী ও বন্ধু ছিলেন। সত্যেন্দ্র বাবুর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন এবং যুবক কেশবের ধর্ম্মানুরাগ ও অসাধারণ বাগ্মিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হন।

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন একান্তে ধ্যানধারণাতে যাপন করিবার উদ্দেশে সিমলা পাহাড়ে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই সংবাদে পুলকিত হইলেন; এবং তাঁহার যৌবন-সুহৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্রকে সাদরে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

একদিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা—এই উভয়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক নব শক্তির সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজ নব নব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র ঐ সকল কার্য্যের উদ্ভাবনকর্ত্তা ও দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষক হইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ সালে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র কালেজের ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন।

এই সময়ে মহাসমারোহে সিন্দুরিয়া পটীর গোপাল মল্লিকের বাটীতে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত "বিধবা বিবাহ" নাটকের অভিনয় হয়। কেশবচন্দ্র তাহার প্রধান উদ্যোগী ও কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন। এই অভিনয়ের বাতিকটা তাঁর বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি বাল্যকালে বয়স্যদিগকে লইয়া নানা বিষয়ে অভিনয় করিতেন।

অনুমান ১৮৫৯ সালে সঙ্গতসভা নামে ধর্ম্মালোচনা সভা স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বয়স্যগণ এই সভাতে সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনের অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বিশ্রম্ভালাপে কিয়ৎক্ষণ যাপন করিতেন। তাঁহার নিজের ভবনে এই সভার অধিবেশন

১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া সিংহল যাত্রা করেন; এবং নানাস্থান পরিদর্শনে কয়েক মাস যাপন করিয়া আসেন। এই বিদেশযাত্রা ও একত্র বাস দুই নেতাকে সুদৃঢ় প্রীতি-সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিল।

কেশবচন্দ্র দেশে ফিরিলে তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি ৩০ টাকার চাকরী লইয়া কর্ম্ম কাজে বসিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে রত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। তখন তাঁহার প্রাণে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাঁহার জীবনের কাজ তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে! কেশবচন্দ্র বিষয় কর্ম্মে বসিলেন বটে কিন্তু অবসর কাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। **Young Bengal, this is for you,** নামক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা সকল ইহার পর বৎসরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ইহার পর বৎসর তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়া উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে Indian Mirror নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল; এবং "কলিকাতা কালেজ" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেই স্কুলগৃহ এই যুবকমণ্ডলীর একটি প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিলেন। ঐ সালেই ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। ঐ সালের শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারীর নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। বোধ হয় ইহার কিছুকাল পরে দেবেন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধও ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। এই সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান যুবকদলের মধ্যে এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিল। কলিকাতার বাহিরে ও অনেক স্থানে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি ও তন্নিবন্ধন যুবকদিগের প্রতি নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইল।

স্বরায সঙ্গত-সভার সভ্যদিগের মধ্যে এক নব ভাবের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার সত্যসকলকে মুখে রাখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; এবং তন্নিবন্ধন গৃহতাড়িত হইয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে ব্রাহ্মযুবকগণ পৌত্তলিকতার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হওয়াতে আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল।

১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ দিবসে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক কলিকাতা সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন; এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত দিবস তিনি স্বীয় পত্নীকে ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া যান। তাঁহার অভিভাবকগণ এ কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে যে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পত্নীকে দিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, অপরের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না। তিনি আপনার অভিষ্ট সাধন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইল। এই অবস্থাতে তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে অনেক দিন দেবেন্দ্রনাথের ভবনে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মধ্যে বাস করিতে হইল। তাহাতে উভয়ের প্রীতিবন্ধন আরও দৃঢ় হইল। তৎপরে স্বীয় অভিভাবকদিগের হস্ত হইতে আপনার প্রাপ্য সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও পৈতৃকভবনে পুনঃ-প্রবেশাধিকার লাভ করিতে কয়েক মাস গেল।

নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভের পরেই তাঁহার পরিবারে প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্রের নামকরণ নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল।

ইহার পরে তিনি উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে গিয়া তিনি যে বক্তৃতাদি করেন, তাহাতেই তত্রত্য পাদরী ডাইসন্ সাহেবের সহিত বিবাদ বাঁধিয়াছিল। সে বিবাদ আর মেটে নাই। খ্রীষ্টীয় সংবাদপত্র

ও সভাসমিতিতে ব্রাহ্মদিগের প্রতি গালাগালি চলিতেছিল। ১৮৬৩ সালের প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পাদিত এক পত্রিকাতে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অনেক উপহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পায়। তদুত্তরে কেশবচন্দ্র Brahmo Samaj Vindicated ("ব্রাহ্মসমাজের পক্ষসমর্থন") বলিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতাতে তাঁহার যে বাগ্মিতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া যান। সুপ্রসিদ্ধ পাদরী ডফ সাহেব উক্ত বক্তৃতাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে বলেন ব্রাহ্মসমাজ যে শক্তি লইয়া উঠিতেছে তাহা সামান্য শক্তি নহে। বলিতে গেলে এই বক্তৃতা হইতেই কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বঙ্গসমাজে স্থাপিত হইয়া যায়।

এই বৎসরে তিনি "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার সভ্যগণ উৎসাহের সহিত নানা হিতকর বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন।

১৮৬৩ সালে কেশবচন্দ্র একজন বয়স্য সহ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচারার্থ গমন করেন। তদবধি সে সকল প্রদেশে ব্রহ্মধর্মের বীজ উপ্ত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে একটি প্রধান সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন। তৎপূর্বে উপবীতধারী উপচার্য্যগণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আসীন হইয়া উপাসনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি তাঁহাদিগকে কর্মচ্যুত করিয়া দুইজন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যকে সেই পদে নিযোগ করিলেন। এতদ্দ্বারা সমাজের প্রাচীন সভ্যগণের মনে বিরাগ জন্মিল। তাঁহারা মহর্ষির নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ওদিকে যুবকদল আরও একটি অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অসমবর্ণের দুই ব্যক্তিকে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতি হাজার অনুরক্ত হইলেও, নিজে তৎপুর্বে উপবীত পরিত্যাগ করিলেও এবং যুবকদলকে বিধিমতে উৎসাহদানে ইচ্ছুক থাকিলেও, এরূপ সমাজবিপ্লবসূচক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তখন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা যুবকদলের হস্তে ছিল। তাহাতে এই বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া ভীত হইলেন; এবং যুবকদলকে সমাজ-সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ কর্ত্তৃত্ব হইতে অন্তরিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কেশবচন্দ্র দেখিলেন ঘোর ঝটিকা আসিতেছে, তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা সমাজের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার হস্তের বাহিরে যায় দেখিয়া, তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া নিজ হস্তে রাখিবার জন্য "ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা" নামে এক সভা গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ "ধর্মতত্ত্ব" নামক এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন; এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া যে কতিপয় যুবা

বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া মহোৎসাহে প্রচার বিভাগ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই গোলমালের মধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিল। ১৮৬৪ সালের সুপ্রসিদ্ধ ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হইল। তখন কিছুদিনের জন্য সমাজের উপাসনা দেবেন্দ্রনাথের গৃহে উঠিয়া গেল। সেখানে যে দিন প্রথম উপাসনা আরম্ভ হইল, সে দিন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য্যদ্বয় গিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বকার উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ উপাসনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা যুবক ব্রাহ্মদলের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তাঁহাদের অনেকে সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া উপাসনা করিলেন। বলিতে গেলে এই সময় হইতেই প্রকাশ্য গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ইহার পর কেশবচন্দ্র অনেক দিন কোনও প্রকারে সম্মিলিত ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চরমে শান্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভাবিত হইল।

ত্বরায় তিনি কলিকাতা সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই পদে দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিযুক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষতা হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রতিনিধিসভাকে প্রধান যন্ত্ররূপে আশ্রয় করিলেন। তাহার সাহায্যে একটি ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যুবকদলের অভিসন্ধির প্রতি সন্দিহান হইয়া পশ্চাদপদ হইলেন। কিন্তু সর্ব্ববিধ উন্নতিকর প্রস্তাবে সহায়তা করিতে বিরত হইলেন না। যুবকদল আত্মোন্নতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ দিতেন ও বিধিমতে সাহায্য করিতেন। এমন কি যুবকদলের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে একবার তিনি "ব্রহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, সমাজের বেদীতে উপবীতধারী উপাচার্য্যগণকে বসিতে না দেওয়া হয়; এবং যদি এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া হয়। উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, যাঁহারা বহুকাল সমাজের সহিত যোগ দিয়া অনুরাগের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে এক্ষণে স্বাধিকার-চ্যুত করা তিনি পক্ষপাতের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। তৎপরে সমাজের একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়া ভাল মনে করিলেন না। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথ এ সময়ে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কর্ত্তব্য বোধে এবং তাঁহার অবলম্বিত

আদর্শ রক্ষার জন্য। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা তাঁহার চিরদিনের আদর্শ। তিনি মনে করিতেন রামমোহন রায় তাঁহাকে সেই ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ব্যাঘাতের আশঙ্কাতেই তিনি কেশবচন্দ্রের দলের হস্ত হইতে কার্য্যভার লইলেন। তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে ও সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। সকল ভাল বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহদাতা রহিলেন।

১৮৬৫ সালের কার্ত্তিক মাসে কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই দুই প্রচারক সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে বহির্গত হন। তদুপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কেশবচন্দ্র যুবকদলের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে আপনাকে নিয়োগ করিলেন। বোধ হয় ১৮৬৪ সালেই স্বীয় বয়স্যগণের পত্নীদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য "ব্রাহ্মিকা-সমাজ" নামে এক নারীসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় পরিবারস্থ নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৬৬ সালের জানুয়ারীর শেষে যে মাঘোৎসব হইল, তাহাতে কেশবের ব্রাহ্মিকা-সমাজের মহিলাসভ্যগণ উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা সমাজে বেদীর পূর্ব্বপার্শ্বে পরদার আড়ালে মহিলাদিগের বসিবার আসন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথমে নারীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে পুরুষদিগের সহিত বসিলেন। মহিলাদিগের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে লইয়া ডাক্তার রবসন নামক খ্রীষ্টান পাদরীর ভবনে প্রকাশ্য সান্ধ্য-সম্মিতিতে গেলেন। সহরে খুব আলোচনা উঠিল।

ইহার পরে কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঐ সালের এপ্রেল বা মে মাসে কেশবচন্দ্র Jesus Christ, Asia and Europe নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতাতে যেমন একদিকে অসাধারণ বাগ্মিতা, অপরদিকে তেমনি আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের উদারতা প্রকাশ পাইল। তাঁহার নাম সুবক্তা ও বঙ্গসমাজের নেতাদিগের শীর্ষস্থানে উঠিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে যীশুখ্রীষ্টের প্রতি যে প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে দুইদিকে দুই প্রকার চর্চ্চা উঠিল। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড লরেন্স হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কেটেকিষ্ট পর্য্যন্ত খ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্র ত্বরায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়া বগল বাজাইতে লাগিলেন। অপরদিকে দেশীয় স্বধর্ম্মানুরাগিগণ কেশবচন্দ্রকে ও নবোদিত ব্রাহ্মদলকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এই আন্দোলনে

যোগ দিলেন। এত অতিরিক্ত খ্রীষ্টভক্তি তাঁহাদের চক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকার বলিয়া প্রতীতি হইল। ব্রাহ্মদিগের সেই যে খ্রীষ্টীয়ান অপবাদ উঠিয়াছে, তাহা আজও যায় নাই। যদিও তৎপরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র Great Men নামক আর একটি বক্তৃতা করিয়া নিজের খ্রীষ্টীয়ান অপবাদ কতকটা দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন বটে, তথাপি সে অপবাদ সম্পূর্ণ গেল না। এ অপবাদের আর একটু কারণ আছে। এই ১৮৬৬ সাল হইতে চৈতন্যের প্রভাবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত, কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত ব্রাহ্মগণ যীশুখ্রীষ্টকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিযাছিলেন। বড়াদনের দিন যীশুর ধ্যানে দিনযাপন করা, যীশুর নামে সঙ্গীত রচনা করা, উঠিতে বসিতে যীশু কীর্ত্তন করা, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অধিক অনুশীলন করা প্রভৃতি চলিয়াছিল। সুতরাং লোকের ও-প্রকার সংস্কার স্বাভাবিক।

এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রচারকগণ তখন উৎসাহের সহিত মফঃস্বলের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সকল সমাজকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা প্রযোজন হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই সালের ১১ই নবেম্বর দিবসে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের এক সভাতে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাসূচক এক অভিনন্দন পত্র দিয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ রাখা হইল।

১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। অনেকে কল্যকার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাদুকাবিহীন পদে কলিকাতা সহরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারোৎসাহের ফলস্বরূপ দেশের নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ব্রাহ্মবিবাহের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

এই সাল হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের ভবনে তাঁহার বয়স্যদিগকে লইয়া দৈনিক উপাসনা আরম্ভ হইল। এই দৈনিক উপাসনা হইতে নবব্যাকুলতা ও নবভক্তির সঞ্চার হইল। তাহার ফলস্বরূপ ইঁহারা মহাত্মা চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং আপনাদের মধ্যে খোল করতাল সহ সংকীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। অমনি সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মেরা নেড়ানেড়ীর দল হইল বলিয়া চর্চ্চা উঠিল।

১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণের

জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। তদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্ত্তন করিয়া ভিত্তিস্থাপন করিতে গেলেন। এই ব্রাহ্মদিগের প্রথম নগর-কীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তনের মধ্যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ জগতের নিকট এই ঘোষণা করিলেন ;—

"নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

ইহাই অদ্যাপি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মূলমন্ত্রস্বরূপ রহিয়াছে।

এই ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। নবভক্তির আবির্ভাবে ব্রাহ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাদের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন। তাহা ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য কেশবচন্দ্র সপরিবারে মুঙ্গের সহরে বাস করিতেছিলেন। সেখানেই ঐ ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রধানরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে তাঁহার দলের দুইজন প্রচারক ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নরপূজার আবির্ভাব বলিয়া প্রকাশ্য পত্রে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দোলনে অনেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন।

অল্পদিনের মধ্যে এই আন্দোলন নিরস্ত হইলে, ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন।

১৮৭০ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ; এবং প্রায় ছয় সাত মাস কাল সেখানে বাস করিয়া নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে সামান্য ধর্ম্মাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি দেশের সর্ব্ববিধ সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত হন ; এবং "ভারত সংস্কার সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে সুলভ-সাহিত্য, নৈশবিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্যের সূত্রপাত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সভা ও ইহার অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্য উঠিয়া গিয়াছে। এখন এলবার্ট কালেজ ভিন্ন অন্য কোনও স্মৃতি-চিহ্ন নাই।

১৮৭১ সালে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আন্দোলন প্রবলরূপে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মদিগের নামে বিবাহ সম্বন্ধীয় কোনও রাজবিধি প্রণীত হয়, আদিসমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, ব্রাহ্মবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করিয়া, ১৮৭২ সালের তিন আইন নাম দিয়া একটি সিবিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়। তদবধি তদনুসারেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিবাহাদি হইয়া আসিতেছে।

এই সময়েই কেশবচন্দ্র কতকগুলি ব্রাহ্মপরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়া,

দৈনিক উপাসনা, পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম প্রভৃতির নিয়ম শিক্ষা দিয়া, ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশে "ভারতাশ্রম" নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রচারকদিগের অনেকে এবং অপর ব্রাহ্মদিগেরও কেহ কেহ সপরিবারে সেই আশ্রমে বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র প্রতিদিন উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিতেন; এবং সকলে নিজ নিজ ব্যয় দিয়া, একত্র আহারাদি করিয়া, এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন।

আশ্রম ভবনেই বয়স্থা মহিলাদের একটি বিদ্যালয় ছিল। সেখানে আমরা কয়েকজন শিক্ষকতা করিতাম; এবং আশ্রমবাসীদের ও বাহিরের ব্রাহ্মদিগের পত্নী, ভগিনী ও কন্যাগণ পাঠ করিতেন।

১৮৭২ সালে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। এ আন্দোলন কালে থামিল বটে, কিন্তু ত্বরায় আর এক প্রতিবাদের রোল উঠিল। আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত আশ্রমবাসী কোনও ব্রাহ্মের বিবাদ উপস্থিত হইয়া, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি বাহিরের সংবাদ পত্রে বাহির হইয়া, তাহা হইতে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উঠিল। কেশবচন্দ্র স্বয়ং বাদী হইয়া ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদিগণ ক্ষমা প্রার্থনা করাতে মোকদ্দমা উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহা হইতে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণের মধ্যে আর এক আন্দোলন উঠিল। উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যে উপাসকগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল এবং কেশবচন্দ্রের অবলম্বিত কতকগুলি মত লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিল। এই বিরোধিদল "সমদর্শী" নামে এক মাসিকপত্র বাহির করিলেন; এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ওদিকে কেশবচন্দ্র তাঁহার অনুগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিশেষ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কলিকাতার অনতিদূরে একটি উদ্যান-বাটিকা ক্রয় করিয়া, তাহার "সাধন-কানন" নাম রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া প্রচারকদলের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিজে স্বপাকে আহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অনুকরণে তাঁহার প্রচারকগণের অনেকে স্বপাকে আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ও বাদানুবাদ আরম্ভ হয়।

১৮৭৭ সালের প্রারম্ভে সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের উদ্দেশে "সমদর্শী" দল একটি ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা গঠনের জন্য ব্যগ্র হন। কেশবচন্দ্র তাঁহাদের চেষ্টাতে বাধা দেন নাই; বরং সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে কুচবিহারের বিবাহ

আসিয়া পড়িল; এবং ঐ বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কতকগুলি নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়।

বিবাহান্তে কেশববাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ হইতে অবসৃত করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। কেশববাবু তাহা হইতে দিলেন না; সুতরাং ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র তাঁহার নিজের বিভাগীয় সমাজের "নববিধান" নাম দিয়া, তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইলেন।

ফলতঃ, এই বিবাদের পর ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে তিনি ভগ্নগৃহের পুনর্গঠনের জন্য যেরূপ গুরুতর শ্রম করিয়াছিলেন তৎপূর্ব্বে বিশ বৎসরে তাহা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সেই শ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। ১৮৮৩ হইতেই দারুণ বহুমূত্র রোগ ধরা পড়িল; এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি দিবসের প্রাতে প্রাণবায়ু তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

দীনবন্ধু মিত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে কেবল মাত্র গুপ্ত কবি কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত মিত্রাক্ষর নিগড় হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা নহে; "নাটুকে" রামনারায়ণের অবলম্বিত নাট্যকাব্যের রীতি হইতেও বঙ্গীয় নাট্যকাব্যকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি। তাঁহার প্রণীত শর্ম্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাব্যের নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া যায়। এই নূতন পথে অগ্রসর হইয়া অনেকে নাটক রচনা করিবার জন্য প্রয়াসী হন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত নাটক সকল সে সময়ে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে প্রচুর সমাদর পাইয়াছিল। আমাদের সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রদিগের মধ্যে ইনিও একজন। যে সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গালি জাতির নব শক্তি ও নব আকাঙ্ক্ষার উন্মেষের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও "বঙ্গদর্শন" আমাদের চিন্তার এতটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দীনবন্ধু আর এক দিক দিয়া সেই উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য এ কালের প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে তাঁহারও জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতে অগ্রসর হইতেছি।

দীনবন্ধু বাংলা ১২৩৬ বা ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। কালাচাঁদ মিত্র সামান্য বিষয় কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, নিজ পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন; সুতরাং তিনি বাল্যে দীনবন্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে সামান্যরূপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়া অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ কর্ম্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিজ আয়ের অনেক সাহায্য হইত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই কাজ করিয়া দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না। তাঁহার মন অধিক জ্ঞান লাভের জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা আপনাকে অসুখী বোধ করিত।

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কর্ম্ম ছাড়িয়া স্বীয় পিতাকে কিছু না বলিয়া গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, এবং একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া অপরের বাসাতে থাকিতে হইত। কিন্তু কোনও ক্লেশই তাঁহাকে স্বীয় অভীষ্ট পথ হইতে বিরত করিতে পারিত না

দীনবন্ধুর কলিকাতায় আসা ও বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা বিষয়ে একটি কৌতুকজনক ঘটনা আছে। শৈশবে তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "গন্ধর্ব্ব নারায়ণ', লোকের মুখে এই নাম দাঁড়াইল "গন্ধ', সমবয়স্ক বালকদিকের মুখে হইয়া পড়িল "থু থু গন্ধ, গন্ধ"! এই রূপে পিতৃদত্ত নামটি বালকের অশান্তির একটা কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও তাহার জননী বিদ্রূপকারী বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "তোরা একদিন দেখবি ওর গন্ধে দেশ আমোদিত হবে" তথাপি সমবয়স্কদিগের বিদ্রূপে শিশু গন্ধর্ব্ব নারায়ণ নিশ্চয় উত্যক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাতাতে আসিয়া নিজে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। যাঁহার দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় হইতে 'নীলদর্পণ' বাহির হইয়াছিল, তিনি যে নিজে দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, এটা একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। যাহা হউক তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া এরূপ আগ্রহের সহিত আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংসা ও নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর হইয়াই গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন, প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি "মানব-চরিত্র" নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তাঁহার কবিত্ব খ্যাতি তদানীন্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয়। প্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে

বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু তিনিও চরমে বঙ্কিমের ন্যায় পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনাকে আপনার প্রতিভা বিকাশের উপায়রূপে অবলম্বন করেন।

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহির হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডাক বিভাগে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এতৎ সূত্রে তিনি উড়িষ্যা, নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড় প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি রাজকার্য্য বিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাব জন্যই প্রধান প্রধান কাজের ভাব তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই যুদ্ধ বধিলে, ডাকের বন্দোবস্ত করিবাব ভার তাঁহাব উপবেই অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সমুচিত রূপে নির্ব্বাহ করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রায় বাহাদুব' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যোপলক্ষে যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ ও নানা শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা কবিতে পাবিয়াছিলেন, তাহাই তাহার নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহাযা কবিয়াছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ মানব-চবিত্র দর্শন ও এরূপ বিবিধ-সামাজিক অবস্থার জ্ঞান আব কাহারও হয় নাই। তাঁহার রচিত নাটক সকলে আমরা এই সকলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

১৮৫৯ সালে যখন নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগের ধর্ম্মঘট চলিতেছিল, তখন দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন। তিনি তৎপূর্ব্বে নিজে অনেক নীল-প্রপীড়িত স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের দুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ওজস্বিনী ভাষাতে প্রজাদেব দুঃখের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের পরীক্ষিত ছিল। সুতরাং প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে যে আগুন তখন জ্বলিয়াছিল, তাহা তাঁহাবও হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি "নীল-দর্পণ" লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, ১৮৬০ সালেব শেষভাগে ঢাকা হইতে নীল-দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীদের অনুমতিক্রমেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং রেভারেণ্ড জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নামে মুদ্রিত করেন। তাহা লইয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং সদাশয় লং সাহেবের যে এক হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ঐ এক হাজার টাকা জরিমানা নিজে প্রদান করেন।

প্রতিহিংসোন্মত্ত নীলকরগণ তখন দীনবন্ধুকে ধরিতে না পারিয়া লংকে

কারাগারে দিয়া এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সারা করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু স্বীয় নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর হইলেন। "নবীন তপস্বিনী", "বিয়ে পাগলা বুড়ো," "সধবার একাদশী," "লীলাবতী," "জামাইবারিক" প্রভৃতি অদ্ভুত হাস্য-রসাত্মক নাটক সকল পরে পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

শেষদশায় তিনি "সুরধুনী-কাব্য" ও "দ্বাদশ কবিতা" নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি দুবারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহার চরম ফল দারুণ বিস্ফোটকে তাঁহাকে শয্যাস্থ করে। সেই রোগেই ১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে গতাসু হন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ান, তখন তাঁহার শেষ গ্রন্থ, "কমলে কামিনী" নাটক যন্ত্রস্থ। এই তাঁর শেষ সাহিত্য রচনা। তিনি সর্বজন-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার চিরদিনের বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধে বা সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কার্য্যের সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে এড়াইতে পারিতেন না, কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমন কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই।"

বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে তিনি যত স্থানে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরে অনেক কাল বাস করেন। এখানে তিনি স্থায়ীরূপে থাকিবার মানসে একটি বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণনগরে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী কাব্য" হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষির মত
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।"

"একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন, দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।" এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কি অকৃত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে! সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি তন্মধ্যে একটি প্রধান এই যে, "তিনিই সাধু যাঁর সঙ্গে বসিলে হৃদয়ের অসাধু ভাব সকল লজ্জা পায় ও সাধু ভাব সকল

জাগিয়া উঠে"। প্রকৃত সাধুর নিকটে বসিয়া উঠিয়া আসিবার সময় অনুভব করিতে হয়, যেরূপ মানুষটি গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষ হইয়া ফিরিতেছি! দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের এরূপ সাধুতা ছিল যে, তাঁহার সহবাসে একদিন যাপন করিয়া আসিলে দশদিন হৃদয় মনের উন্নত অবস্থা থাকিত। এটি স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটীর সন্নিহিত কাঁঠালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী-কালেজে পাঠ করেন। সেখানে পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাদুর্ভাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যজগতে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। গুপ্ত কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগতে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে "প্রভাকরে" লিখিয়া কাব্যরচনার অভ্যাস আরম্ভ করেন। তখন প্রভাকরে উত্তর প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাক্‌যুদ্ধ "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে প্রথিত হইয়াছে। এরূপ শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে "ললিতা-মানস" নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কালেজে গমন করেন এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বি. এ. উপাধি সর্ব্বপ্রথমে প্রাপ্ত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

১৮৬৩ সালে তাঁহার প্রণীত "দুর্গেশ-নন্দিনী" নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে "বিজয় বসন্ত" "কামিনী কুমার" প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত "হংসরূপী রাজপুত্র", "চকমকির বাক্স" প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প এবং "আরব্য উপন্যাস" প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। "আলালের ঘরের দুলাল" তাহা

মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

অল্পদিন পরে "কপালকুণ্ডলা" দেখে দিল। যে তুলিকা দুর্গেশ-নন্দিনীর নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুণ্ডলার গাম্ভীর্য্য-রস-পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিল! লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় উপন্যাসিকদিগের শীর্ষ স্থানে স্থাপন করিল।

বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপরদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শব-পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে, যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে, কেহই "শবপোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে "শব পোড়া মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চানা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি যেন চিত্তাকর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোক চক্ষুর সমক্ষে উঠিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন তিনি কম্‌তের সাম্যভাবের পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য নীতি এরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু

দুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল. এবং ক্রমে তিরোভাব হইল।

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও চিত্রণশক্তির সেই পূর্ব্বকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাঁহার দৃষ্টি ও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল।

শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত "সাম্য" নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার শেষ প্রচারিত এই নবধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্য এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আদর্শ পুরুষ। এই নবভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত ও ধর্ম-তত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

এদিকে তিনি গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধ্যে সর্ব-প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রসাদের চিহ্ন স্বরূপ "রায় বাহাদুর" ও "সি. আই. ই." উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সরকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না, কিন্তু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ঘরে পরে এইরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে ভবধাম পরিত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

এইকালের মধ্যে উপন্যাস ও নাটক রচনা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে "সোমপ্রকাশের" অভ্যুদয়।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকনাথের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল বৈশাখ মাস, ১৮২০ সাল। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম

উল্লেখ যোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধেই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন।

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথানুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন পাঠ করিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারম্ভে তাঁহার পিতা তাঁহাকে টোল চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়া সংস্কৃত কালেজে যাপন করেন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনের উন্নতি হইয়া ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কর্ম হইতে অবসৃত হন। ইহার পর তিনি ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। দারুণ বহুমূত্র রোগে ধরে। শ্রম করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, বসিয়া থাকাকে ঘৃণা করিতেন, সুতরাং ১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় মধ্য প্রদেশের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন। সেই খানেই ঐ সালের ২২ আগষ্ট তাঁহার দেহান্ত হইল।

সোমপ্রকাশই ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি, সোমপ্রকাশই ইঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে; সুতরাং সোমপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতেছি।

১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বীয় পুত্র দ্বারকনাথকে সহায় করিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং অল্প কালের মধ্যেই গতাসু হন। ঐ যন্ত্র হইতে দ্বারকনাথের লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ হয় প্রথম। যাহা হউক এই দুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা তদানীন্তন বঙ্গীয় পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, এবং দ্বারকানাথের নাম বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে পরিচিত হয়। তৎপরে তাঁহার রচিত বালক-পাঠ্য "নীতিসার," প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের প্রভাব সে সমুদয়কে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদা প্রসাদ নামে তাঁহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাজ যোগান তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল। দ্বারকনাথ সম্পাদকতা ভার ও তাঁহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন। কার্য্যকালে সারদা প্রসাদ আসিলেন না, অপরাপর লেখকগণও অদর্শন হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়া গেল। তিনি অধ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসরকাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে, অধ্যাপকতা কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা ভিন্ন তাহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য রাশীকৃত দেশী ও বিলাতী সংবাদ-পত্র, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইত তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন, রাত্রি ৪টার সময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না।

দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি, তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন দশ টাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।

সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি

১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসীগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা পদার্পণ করিতেন, এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।

পরে ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে মাতলার রেলওয়ে খোলে। মাতলা বা পোর্ট ক্যানিং একটা প্রধান বন্দর হইবে গবর্ণমেণ্টের মনে এই আশা ছিল। গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়া বড় বড় জাহাজ কলিকাতাতে আসা দুঃসাধ্য হওয়াতে, মাতলাতে একটা বন্দর করিবার কথা চলিতেছিল এবং পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানী করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল। শেষে মাতলাকে অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করা হইল। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে খোলাই সার হইল।

মাতলা রেলওয়ে খুলিলেই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাঁহার বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে লইয়া যান এবং সেখান হইতে উহা প্রকাশ করিতে থাকেন। সোমপ্রকাশ সে বিভাগের একটা প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সাহায্যে অনেক সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে, অনেক অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, দেশে গিয়াই বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ বাসগ্রামের নানাপ্রকার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে একটি উচ্চশ্রেণী ইংরাজী স্কুল স্থাপন। ঐ স্কুলটি তিনি নিজের ব্যয়ে ও নিজের চেষ্টাতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কয়েক বৎসরে তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তাঁহাকে কতই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ হইতে বেতনটি পাইয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া সে বেতনের অধিকাংশ তথাকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দিয়া সামান্য অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

পাপের প্রতি তাঁহার এমন ঘৃণা ছিল যে, গ্রামের পাপাচারী লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁপিত। একবার একজন দুশ্চরিত্র পুরুষ একটি গোপজাতীয়া বিধবাকে বিপথে লইয়া গেল; এবং কিছুদিন পরে তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতে তাড়াইয়া দিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে সেই রমণীর দ্বারা আদালতে নালিস উপস্থিত করাইয়া সেই দুশ্চরিত্র পুরুষের নিকট হইতে ঐ নারীর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া প্রতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার

প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করেন। একদিন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ লিখিতেছিলেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, ঐ ধনী লোকটি সদলে সেই বিধবার বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে যাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়া স্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে সেই ধনীর গ্রীবা ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম বশতঃ তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে গ্রামে তিনি দুর্ব্বলের রক্ষক ও সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

বার্দ্ধক্যে একটি বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের শাসন ও ধর্ম্মের উপদেশ রহিত হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেন। তাঁহার একটি পুত্র এই সময়ে, জপ, তপ, পূজা প্রভৃতিতে কিছু অধিক মাত্রায় মাতিয়া গেল। এমন কি সেজন্য তাঁর জ্ঞান চর্চা, সংসারের কাজ-কর্ম্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন—'ও শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ত, ও যাহা আত্মার কল্যাণকর ভাবিয়াছে তাহা করুক, দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্যদিকে মতি না দিয়ে ধর্ম্মসাধনে মাতিয়া আছে তাহ, ভাল।' সাধারণ মানুষের ধর্ম্মোপদেশের সুবিধার জন্য তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে কাশীতে গিয়া বাস করেন। তীর্থস্থানের দুরবস্থা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। কাশীতে গিয়া কাশীবাসী অনেকের বিশেষতঃ পাণ্ডাগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড আঘাত লাগে। তিনি হৃদয়ের সেই ভাব ব্যক্ত করিয়া "বিশ্বেশ্বর-বিলাপ" নামে একখানি কাব্যপুস্তক রচনা করেন। তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য করিতে পারিতেন না।

ইহার উপরে ভার্নেকিউলার প্রেস আক্ট (Vernacular Press Act) নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা যখন ইংরাজী কাগজে পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। এই সময়ে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে নিজ ভবনে ডাকাইয়া, সোমপ্রকাশ তুলিয়া না দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরে ঐ গর্হিত আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হইল বটে

কিন্তু পূর্ব্বপ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার পরে তিনি "কল্পদ্রুম" নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অসুস্থতা বশতঃ অধিক কাল রহিল না। চরমে তিনি পীড়িত হইয়া রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে গতাসু হন।

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অল্পদিনের জন্য, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুরুভক্তি ও সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে, সেই অল্পদিনের সম্বন্ধ তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। চিরদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম স্মৃতিতে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্ব-সম্পর্কীয় লোকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রচুর পরিমাণে ছিল। সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে দেখিবামাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র বলিয়া প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে লইয়াছিলেন।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

বঙ্গদেশকে যত লোক লোকচক্ষে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিমল সত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙ্গালীই দেখাইতে পারিয়াছেন, এরূপ জ্ঞানানুরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া এ জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার নাম নব্যবঙ্গের শিক্ষাগুরুদিগের মধ্যে গণনীয়, সুতরাং আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

কলিকাতার অদূরবর্ত্তী হাবড়া বিভাগের পাইকপাড়া নামক গ্রামে, ১৮৩৩ সালের ২রা নবেম্বর দিবসে মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটি পুত্র কোলে লইয়া ইঁহাকে কলিকাতা নেবুতলাতে ইঁহার মাতামহালয়ে আগমন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই ৩৩ বৎসর বয়সে পাইকপাড়া গ্রামে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন ইঁহার মাতুলদ্বয়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের উপরে ইঁহার রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার পড়ে। এই পারিবারিক দুর্ঘটনার চারি বৎসর পরেই তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তখন পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি উক্ত মাতুলদ্বয়ের স্নেহ যত্নে প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

তাঁহার মাতুলেরা প্রথমে বাঙ্গালা শিখিবার জন্য তাঁহাকে গুরুমহাশয়ের

পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দেন ; এবং কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখাইবার জন্ত ঠাকুর দাস দে নামক একজন ভদ্রলোককে নিযুক্ত করেন। উত্তরকালে এই ঠাকুর দাস দে যতদিন জীবিত ছিলেন ডাক্তার সরকার তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন ; এবং নিজ কার্য্যের সহায়রূপে রাখিয়াছেন।

সরকার মহাশয়ের মাতুলদিগের অবস্থা ভাল ছিল না। ইঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল ট্রাভ্‌লিং প্রিণ্টারের কাজ করিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল এরূপ মনে হয় না।

ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করার পর, তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল তাঁহাকে ফ্রী বালকরূপে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন, তাহার দেড় বৎসর পরে ১৮৪২ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পর্য্যন্ত হেয়ারের স্কুলে ছিলেন। ঐ সালে তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু কালেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইল, তিনি নানা জ্ঞানের বিষয়ে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। কালেজের পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থ সকলে তাঁর পরিতৃপ্তি হইত না। বিজ্ঞান পাঠের জন্য তাঁহার মন ব্যগ্র হইত। তখন হিন্দু কালেজে বিজ্ঞান পাঠনার রীতি ছিল না, তদনুরূপ আয়োজনও ছিল না। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইবার সংকল্প করিলেন ; এবং তাঁহার হিন্দু কালেজের অধ্যাপকদিগের অমতে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন।

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পরিণীত হইলেন ; এবং ১৮৬০ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার সরকার মেডিকেল কালেজে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৮৫৯/৬০ সালে এল. এম. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসকরূপে বাহির হন। মেডিকেল কালেজে অধ্যয়নকালে, তিনি তাঁহার অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সে সময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য যতগুলি পারিতোষিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অর্জ্জন করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল, এবং তাঁহার বহুদর্শিতা ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরকালের মধ্যে সহরের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন।

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্ব্বোচ্চ এম. ডি. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার মান সম্ভ্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় এম. ডি. বলিয়া তাঁহার নাম সকলের মুখে উঠিয়া গেল।

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে সহরে একটি

নূতন সভা স্থাপিত হয়। তাহা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশন নামক সভার বঙ্গীয় শাখা। কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণ মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাক্তার সরকার একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তন্নিযুক্ত সেক্রেটারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত সভার একজন সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হন।

যে কারণে ঐ সভার প্রতিষ্ঠাকার্যের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই;—ঐ দিনের বক্তৃতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর দোষ কীর্ত্তন করেন। সেই বাক্যগুলি সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ডাক্তার সরকারের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। তৎপরে উভয়ে সাক্ষাত হইবামাত্রই রাজাবাবু ঐ উক্তিগুলি অবলম্বন করিয়া ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই বিচার বহুদিন চলিতে থাকে। ক্রমে আর এক ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়। একজন বন্ধু (Morgan) মর্গান নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত Philosophy of Homeopathy নামক একখানি পুস্তকের সমালোচনা করিবার জন্য ডাক্তার সরকারকে অনুরোধ করেন। ঐ সমালোচনা 'Indian Field' নামক কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহির করিবার কথা থাকে। কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে গিয়া ডাক্তার সরকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনা মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যে, কার্য্যতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন না দেখিয়া মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল দেখিবার জন্য রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয়া গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থা ও চিকিৎসা বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিলেন। এই রোগীগুলির চিকিৎসা কার্য্য দেখিতে দেখিতে ডাক্তার সরকারের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হানিম্যানের অবলম্বিত প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে তাঁহারা ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন।

অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জ্জন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি হৃদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ বা প্রচার করিতে

কুণ্ঠিত হইতেন না; অথবা সত্যাবলম্বন বিষয়ে ক্ষতি, লাভ বা লোকের অনুরাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তাঁহার সেই প্রকৃতি অনুসারে, যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসকবন্ধুগণের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার সরকার "চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দ্দিষ্টতা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সত্য-প্রিয়তা, নির্ভীক-চিত্ততা সমুদয় একাধারে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর সর্ব্বজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্ত্তন করিয়া হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংরাজ ডাক্তারগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়া লাল হইয়া গেলেন; ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, 'ডাক্তার সরকার! ডাক্তার সরকার! আর একটা কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির করে দেব।" পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ডাক্তার সরকার উক্ত সভার সহকারী সভাপতি থাকা দূরে থাক, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন না। ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ঐরূপ মতে সায় দিলেন। সভামধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় সভ্যগণের ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল।

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, "আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব তাতে আর কি? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই হবে।" ওদিকে সংবাদপত্রের স্তম্ভ সকল এই বার্ত্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন তাঁহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন, এবং চিকিৎসকগণ এক বাক্যে তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্য মাটী হইয়া গেল। ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না। পর বৎসরেই তাঁহার Calcutta Journal of Medicine বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা দমে নাই; যাহাকে সত্য

বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—"I was sustained by my faith in the ultimate triumph of truth—অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি সবল ছিলাম।" তাঁহাব ভূতপূর্ব প্রোফেসারদিগেব অনেকে তাঁহাব প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অবাচ্য কুবাচ্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কি ভাবে সমুদয় কটূক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঐ ১৮৬৭ সালে মার্চ্চ মাসে মুদ্রিত তাঁহাব ঐ বক্তৃতাব ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন, —

Whatever may now have become the differences between my venerable preceptors of the Medical College and myself, I shall always look back with ecstacy and gratitude on those days when I used to be charmed by their eloquence, pregnant with the words of Science.

আবাব ঐ ভূমিকার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন :—

Persecution has already commenced. Professional combination is strong against me, and is likely to be stronger ; every one's arm seems to be raised against me ; but I cannot deprive myself of the satisfaction that mine has been, and shall be raised against none. It is probable "my bread will be affected," but I shall never forget the words of Jesus who certainly speaks as man never spake, that as beings, instinct with reason, and made in the image of our Creator, "we must not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God."

সকলে অনুভব করুন যখন তাঁহাব বিরোধিগণ কোলাহল করিতেছিলেন এবং তাঁহার প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এই মহামান্য ব্যক্তি কোন জগতে বাস করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে আমি তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতার এক পরিচয় পাই, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত বলিয়া লিখিয়া রাখিতেছি।

আমি তখন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল. এ. পরীক্ষা দিয়া উঠিয়াছি। সে সময় আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেছিলাম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণেব সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধুতা সূত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে

আনিয়া দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন তাহা নহে, ভ্রাতৃ-নির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই ভবনের স্থায়ী-চিকিৎসক ছিলেন। এল. এ. পরীক্ষা কালে গুরুতর শ্রম করাতে আমার একপ্রকার পীড়া জন্মে। বাসার লোকেরা আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন "আমাদের বাসাতে এই একটা বামুনের ছেলে আছে, এল. এ. পরীক্ষার জন্য গুরুতর শ্রম করে এর কি অসুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়াকরে এর চিকিৎসার ভার নিতে হবে।" ডাক্তার সরকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার ভার লইলেন। বলিলেন;—"তোমার পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখে আমার কাছে পাঠিও!" কিন্তু সে দিন আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার মনটা খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। আমরা যুবকদল তাঁহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু তাঁহার একটা স্বভাব এই ছিল যে, তিনি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধিৎসু হইতেন। সে দিন ডাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থা পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই কি ঔষধ দিলেন?" ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মেডিকেল কালেজে পড়েছেন?"

গিরিশবাবু—না।

ডাক্তার সরকার—তবে এমন আহাম্মুকি করেন কেন? আমি কি ঔষধ দিচ্ছি তাতে আপনার দরকার কি?

এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে, আমাদের সকলের প্রাণে বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণটি ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাঙ্গালাতে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহা তাঁহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্ব্বোক্ত কর্কশ ব্যবহারের জন্য তিরস্কারে পূর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না যে, নিজে ত গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে যাইতেছি, তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার! চিঠিখানি পাঠাইয়া চিন্তা হইল বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আসিবার কথা ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবনাথ ভট্টাচার্য্য তোমাদের বাড়ীতে কে?" তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন, "সেই যে মশাই পাগলা ছেলেটা।" শুনিলাম ডাক্তার সরকার গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ঈশ্বর করুন এমনি পাগলা ছেলে দেশে বেশী হয়। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়া

লইয়া গেল, "ওরে আয় আয় ডাক্তার সরকার তোকে ডাকচেন।" আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র ডাক্তার সরকার টেবিলের অপর পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন,—"তোমার ইংরাজী ষ্টেটমেণ্ট দেখে খুসি হয়েছি; আর তোমার বাংলা পত্রের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।" আমি ত অবাক, তারপর তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলিয়া তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরূপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয় নাই এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকল আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি কালেজের একটা গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। আমার তিরস্কারটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধুতারই পরিচয় পাইলাম! সেই তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। ততবধি আমার বা আমার পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সংবাদ দিবামাত্র বুক দিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন; এবং বিনা ভিজিটে দিনের পর দিন আসিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন। সে উপকারেব ঋণ আমার অপরিশোধনীয় বহিয়াছে।

এরূপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না কবিয়া থাকিতে পারে? অচিরকালের মধ্যে তাঁহার পসার আবার ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিও লোকচক্ষে উঠিয়া পড়িল।

১৮৭০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে তাঁহাকে আর্ট-ফ্যাকল্‌টীর প্রতিনিধি করিয়া সিণ্ডিকেটে লওয়া হয়। তৎপরে ১৮৭৮ সালে সেনেটের সভ্যগণ তাঁহাকে ফ্যাকল্‌টী অব মেডিসিনের প্রতিনিধিরূপে সিণ্ডিকেটে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ফ্যাকল্‌টী অব মেডিসিনের সভ্যগণের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত হয়। উক্ত ফ্যাকল্‌টীর ডাক্তারগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন সেই পুরাতন বিবাদ। ডাক্তার সরকারকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইখানি পত্র লিখিতে হয়, তাহাতে সেনেটের সভ্যগণের মনেব সকল সন্দেহ ভঞ্জন হয়; এবং তাঁহারা তাহাকে ফ্যাকল্‌টী অব মেডিসিনে বহাল বাখেন।

১৮৭৬ সালে তাঁহার প্রধান উদ্যোগে ও তাঁহারি চেষ্টায় 'সায়েন্স এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং অদ্যাপিও বর্তমান আছে।

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বৃত হন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ববৎসর পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য দক্ষতার সহিত করিয়া আসেন।

১৮৮৩ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মান সম্ভ্রমের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধি প্রদান করেন।

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন।

১৮৯৩ সালে চতুর্থ বার মনোনীত হওয়ার পর তিনি ঐ পদ নিজে পরিত্যাগ করেন।

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে বৃত হন।

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত চারি বৎসরের জন্য ফ্যাকল্‌টী অব আর্টের সভাপতির কার্য্য করেন।

বহুবৎসর এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন।

১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারি ডি. এল. উপাধি প্রদান করেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-সভার সভ্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন।

সায়েন্স এসোসিয়েশন স্থাপন ব্যতীত তিনি আর একটি সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। একবার স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে তিনি বৈদ্যনাথে বাস করিতেছিলেন। তখন তথাকার কুষ্ঠরোগীদের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার পর-দুঃখ-কাতর হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তিনি নিজে ৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কুষ্ঠীদিগের জন্য একটি আশ্রয়-বাটিকা নির্ম্মাণ করেন ; এবং তাঁহার পত্নী 'রাজকুমারীর' নামে তাহা উৎসর্গ করেন। ১৮৯২ সালে সার চার্লস ইলিয়ট তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন।

অবিশ্রান্ত কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্যে ডাক্তার সরকারের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না, মধ্যে মধ্যে হাঁপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন হইয়া পড়িতেন। তদুপরি চিকিৎসা-সূত্রে কোনও কোনও স্থানে যাওয়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিয়াছিল। তাহাতে শেষ দশায় তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ সালের শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মূত্রাধারে এক প্রকার পীড়ার সঞ্চার হইয়া বড়ই ক্লেশ দিতে লাগিল। ঐ রোগে ১৯০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রাতঃকালে প্রাণবায়ু তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। বঙ্গের একটি উজ্জ্বল তারা চিরদিনের জন্য অস্ত গেল।

আমরা তাঁহাতে যে কেবল সাহস ও সত্যপ্রিয়তাই দেখিয়াছিলাম তাহা নহে। এ রূপ জ্ঞানানুরাগী মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। চিকিৎসাবিদ্যা ও বিজ্ঞান তাঁহার নিজের সোপার্জ্জিত বিশেষ বিদ্যা ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি তৃপ্ত হন নাই ; তাঁহার জ্ঞানানুরাগ সর্ব্বতোমুখীন ছিল। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ে তাঁহার চিত্তের অভিনিবেশ দৃষ্ট হইত। সদ্‌গ্রন্থ সকল ক্রয় করা ও রক্ষা করা, তাঁর একটা বাতিকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা তাঁহার লাইব্রেরি দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভবনে যাইতাম। তিনি তাঁহার জ্ঞানসম্পত্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন। তাঁহার ভবনে জ্ঞানানুরাগী বন্ধুগণের একটি আড্ডা ছিল। সেখানে বসিলে অনেক জ্ঞানের

কথা শোনা যাইত। অনুমান করি তিনি যে লাইব্রেরি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে। ধনী ব্যক্তিরা বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যায়, এই স্বাবলম্বনশীল, আত্মোন্নতিপরায়ণ দরিদ্রের সন্তান স্বোপার্জ্জিত ধনের চিহ্ন স্বরূপ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের জ্ঞানসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বহুদিন সাধুমুখে শুনিয়া আসিতেছি, যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর আবির্ভূত থাকেন। মহেন্দ্রলাল জীবনের সকল পথে, সকল সঙ্কটে, সকল সংগ্রামের মধ্যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিতেন। যিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে রোগযন্ত্রণার মধ্যে নিম্নলিখিত সংগীত রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের বিষয় আর কি বলিব।

পাহাড়ী—কাওয়ালী

সয় না রোগের যাতনা আর সয় না,
কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণা
কৃপাদৃষ্টি থাক্‌লে তোমার, থাকে না ত (কোন) যাতনা।
দিয়ে এ বিশ্বাস, করো না নিরাশ, (একবার) স্নেহ-নয়নে চাও না।
কোপদৃষ্টি ফিরাইয়ে লও, আর বাঁচিব না, বাঁচিব না।
সকলি খাদ, অধিক পোড়ালে কিছুই থাক্‌বে না।
জানি প্রভু, যা কর তুমি, তা সবে হয় মঙ্গল সাধনা,
তবু কাতর হয়ে আমি করিয়াছি যে প্রার্থনা;
তাতে তব কাছে, যদি হয়ে থকি অপরাধী
নিজগুণে দয়াময় কবহে মার্জ্জনা।
কারে দুঃখ জানাই, প্রভু, তোমা বিনা,
তুমি ছাড়া কে আছে, বুঝিতে মনের বেদনা,
কে আছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাই না;
তাই কেঁদে ডাকি তোমায় ঘুচাতে জ্বালা যন্ত্রণা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সূচনা

১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত

১৮৭০ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন॥ আসিয়া নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন।

'ভারতসংস্কার' সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে পাঁচ প্রকার কার্য্যের আয়োজন করিলেন। (১ম) সুলভ সাহিত্য, (২য়) সুরাপান নিবারণ, (৩য়) শ্রমজীবী-বিদ্যালয়, (৪র্থ) স্ত্রীশিক্ষা, (৫ম) দাতব্য-বিতরণ। সুলভ সাহিত্য বিভাগে 'সুলভ সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইল, সুরাপান নিবারণ বিভাগে 'মদ না গরল' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল; শ্রমজীবী-বিদ্যালয় বিভাগে শ্রমজীবীদিগের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত এবং তাহার কার্য্যভার তাঁহার অনুগত কার্য্যদক্ষ এক প্রচারকের প্রতি অর্পিত হইল; স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে বয়স্থা মহিলাদিগের জন্য এক বিদ্যালয় খোলা হইল; তাহাতে আমাদের অনেকের স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি বয়স্থা মহিলাগণ পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং আমরা কয়েকজন তাহাব শিক্ষক হইলাম, দাতব্য বিভাগে এক মহাকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন বেহালা প্রভৃতি কলিকাতার উপনগরবর্ত্তী স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরেব বড প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার একজন অনুগত প্রচারক সপ্তাহের মধ্যে কয়দিন গিয়া ম্যালেরিয়া-পীডিত দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা ও তাহাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ কবিতে লাগিলেন। এই প্রচারক খ্যাতনামা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশের সন্তান। যৌবনেব প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে আপনাকে অর্পণ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই স্নান ও ঈশ্বরোপাসনা সারিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ পূর্ব্বক, ঔষধ ও পথ্যাদি লইয়া বেহালাতে গমন করিতেন, এবং সেখানে ১০।১১টা পর্য্যন্ত রোগী দেখিয়া এবং ঔষধ বিতরণ করিয়া ১২টার সময় সহরে ফিরিতেন, ফিরিয়া আহার করিয়াই বয়স্থাবিদ্যালয়ে গিয়া পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সে সময়ে তাঁহার যে পবিশ্রম দেখিয়াছি গবর্ণমেন্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারীকে তত পরিশ্রম করিতে কখন দেখি নাই। সেই শ্রমে তাঁর শরীর জন্মের মত ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি পবে এক প্রকার ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে হয়, কিন্তু আমাদেব সঙ্গে বাসকালে যে নিঃস্বার্থ পরসেবা, যে সদনুষ্ঠানে একাগ্রমতি, যে ধর্ম্মোৎসাহ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন আমাদের আদর্শস্বরূপ স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্ঠানের মধ্যে 'সুলভ সমাচাব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলভ সমাচার, এদেশে সুলভ সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন করিল। এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র যে বাহির হইতে পারে এবং বাহির হইলে যে তিষ্ঠিতে পারে, তাহা কেহ অগ্রে জানিত না। 'সুলভ' যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে আলোচনা পড়িয়া গেল। 'সুলভ' একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত সংবাদ দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপূর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা লোকচিত্তের সদ্ভাব

উদ্দীপন ও হাস্যরসোদ্দীপক গল্পাদি দ্বারা আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় 'সুলভ' কয়েক বৎসর পরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এই পাঁচ প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যতীত ভারতসংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আরও কয়েক প্রকার কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। হরনাথ বসু নামক ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্যের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল নিজহাতে লইয়া তাহার এলবার্ট স্কুল নাম দিয়া চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে কালেজ স্কোয়ারের উত্তরপার্শ্ববর্তী পুরাতন প্রেসিডেন্সি কালেজের ব্যবহৃত একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া, তাহাতে এলবার্ট স্কুল স্থাপন করিলেন, এবং তাহার উপরের তালার বড় হলটি ট্রষ্টিগণের হস্তে দিয়া, এলবার্ট হল নাম দিয়া, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখিলেন।

এতদ্ব্যতীত এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুষ্ঠিত আর একটি প্রধান কার্য্য ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড বাসকালে ইংরাজজাতির গার্হস্থ্যনীতি দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা বলিতেন ইংরাজের home বা গৃহ-পরিবারের ন্যায় জিনিসটি আর পৃথিবীতে নাই। বাস্তবিক ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের গৃহের ধর্মভাব, সুশৃঙ্খলা, সুনিয়ম, মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, কার্য্যবিভাগ, নরনারীর স্বাধীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রভৃতি সমুদয় অতীব প্রশংসনীয় এবং অনুকরণের যোগ্য। তিনি মনে করিলেন একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মপরিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবেন, এবং তাহাদিগকে কিছুকাল সুনিয়মে ও ধর্মসাধনে নিযুক্ত রাখিয়া পারিবারিক ধর্মজীবনে শিক্ষিত করিবেন। তৎপরে তাহারা সেই শিক্ষার ভাব লইয়া নানা স্থানে যাইবে, ক্রমে ব্রাহ্মপরিবার সকল ধর্মসাধন, শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম বিষয়ে আদর্শ পরিবার হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল। তাঁহার আহ্বানে আমরা অনেকে সপরিবারে ভারত আশ্রমে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। সেখানে একত্র উপাসনা, একত্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদ্দ্বারা আমরা আপনাদিগকে বিশেষ উপকৃত বোধ করি। দুঃখের বিষয় আশ্রমটি বহুদিন স্থায়ী হয় নাই, কয়েক বৎসর পরেই উঠিয়া যায়।

আর এক কারণে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কালটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ও তদ্দ্বারা বঙ্গসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও চর্চা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ভিতরে অনেক দিন হইতে ঐ চর্চা চলিতেছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ হইতে একজন দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, একাগ্রচিত্ত ও নারীহিতৈষী পুরুষ কলিকাতাতে আগমন করেন। তাঁহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আসিবার সময় তাঁহার প্রকাশিত "অবলাবান্ধব" নামক সাপ্তাহিক পত্র সঙ্গে করিয়া আসেন।

"অবলাবান্ধব" ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয় ; এবং নারীগণের শিক্ষা ও উন্নতির সম্বন্ধে অত্যগ্রসর দলের কাগজ বলিয়া পরিগণিত হয়। কলিকাতাতে আসিয়া নূতন নূতন লেখকদিগের সাহায্যে অবলাবান্ধবের শক্তি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাস মহাশয় ১৮৭০ সালে হাইকোর্টে ওকালতী করিবার জন্য বরিশাল হইতে কলিকাতায় অসিলেন। তিনি আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ব্রাহ্মদিগের উপাসনাস্থান যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির তাহাতে কেন মহিলাদিগের জন্য পর্দ্দার বাহিরে বসিবার স্থান থাকিবে না, অগ্রসর যুবকদলের মধ্যে এই আলোচনা কিছুদিন চলিল। অবশেষে তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পরিবারের মহিলাদিগকে লইয়া পর্দ্দার বাহিরে প্রকাশ্যভাবে বসিতে ইচ্ছুক, এ বিষয়ে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার উপসাসকমণ্ডলীর কতকগুলি লোক যেমন এই প্রার্থনা জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন অনেক সভ্য তদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চর্চ্চা যখন চলিতেছে এমন সময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণকে লইয়া আসিয়া পর্দ্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকগণের মধ্যে বসিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মহাবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ নিষেধ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বলিলেন—"তাঁহারাও উপাসকমণ্ডলীর সভ্য, মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহারাও সাহায্য করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা তাঁহাদের বসিবার অধিকার আছে।" কিন্তু সে আপত্তি শোনা হইল না। বারান্তরে তাঁহারা মহিলাগণের সহিত উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বসিতে নিষেধ করা হইল। তখন তাঁহারা বিরক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে আসা পত্যািগ করিলেন, এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে এবং তৎপরে অন্য স্থানে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সমাজের কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে কিছুদিন চলিয়াছিল, তৎপরে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে পর্দ্দার বাহিরে মহিলাদিগের জন্য বসিবার আসন করিয়া দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার ব্রহ্মমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বতন্ত্র সমাজটি উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ে প্রাচীন ও নবীন দুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্থা বিদ্যালয় স্থাপন

করিয়া নারীকুলের শিক্ষার যে আদর্শ অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাহা অগ্রসর দলের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারের কন্যাদিগকে সে বিদ্যালয়ে দিলেন না। প্রধানতঃ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে "হিন্দুমহিলা-বিদ্যালয়" নামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেখানে গাঙ্গুলি মহাশয় শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই বিবাদক্ষেত্রে অনুমান ১৮৭২ সালেব শেষে একজন শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারী এক্রয়েড। ইনি পরে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট বেভেরিজ সাহেবেব সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড ইংলণ্ডেব প্রসিদ্ধ গার্টন কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডেব নারীকুলেব মধ্যে সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। ভারতের নারীগণের শিক্ষার দুরবস্থার কথা শুনিয়া, এদেশে আসিয়া, নারীকুলের শিক্ষাবিধান বিষয়ে সাহায্য করিবার বাসনা তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি আসিয়া পূর্ব্ব আলাপসূত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠাতা হইলেন, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। ওদিকে আনন্দমোহন বসু মহাশয় বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিবিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি বন্ধুগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কুমারী এক্রয়েড পরিণীতা হইয়া সহর পরিত্যাগ করাতে হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় রূপান্তরিত হইযা "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" নাম ধাবণ করিল, এবং প্রধানতঃ আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাসেব অর্থ সাহায্যে চলিতে লাগিল। ইহাই বঙ্গনারীব উচ্চশিক্ষার প্রথম আয়োজন। কয়েক বৎসর পরে এই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেথুন কালেজের সহিত সম্মিলিত হয়; এবং আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি বেথুন স্কুল কমিটিতে স্থান প্রাপ্ত হন; এবং নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষা দিবার জন্য বেথুন স্কুলে কালেজ বিভাগ খোলা হয়।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আর এক প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেক যুবক সভ্য ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপের মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর বড় পক্ষ ছিলেন না। তিনি ইহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেন; সুতরাং একটা মতবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। সভাসমিতিতে ও প্রকাশ্য পত্রাদিতে আন্দোলন চলিল। অবশেষে নিয়মতন্ত্রপক্ষীয়গণ "সমদর্শী" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তদবধি তাঁহাদের নাম "সমদর্শী" দল হইল। স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষের অনেকে এ দলেও প্রবেশ করিলেন। এই আন্দোলনেব চরম ফলে অবশেষে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় গৃহবিচ্ছেদ ঘটে।

কিন্তু যেজন্য এই কাল বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহা অন্যপ্রকার। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত হইতে আসিয়া আর একটি কার্য্যে হস্তার্পণ করেন। যেজন্য ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এবং তৎসঙ্গে হিন্দুসমাজ মধ্যেও ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়; এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহিরের লোকের মনে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি হ্রাস হইয়া হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের তরঙ্গ উত্থিত হয়। তাহা এই—

ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক নব বিবাহ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুবিবাহ-প্রণালীর সাকারোপাসনা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন আর সকল বিষয়েই উহা প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল।

যতদিন এক জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছিল, ততদিন ঐ সংস্কৃত পদ্ধতিব বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু ১৮৬৪ সাল হইতে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রণীত পদ্ধতি পবিবর্ত্তিত কবিয়া আপনাদের বিশ্বাস ও রুচির অনুরূপ এক নূতন পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেন। তখন হইতে এই বিচাব উপস্থিত হইল ব্রাহ্মসমাজের নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অনুসাবে বৈধ কি না? কয়েক বৎসর এই বিচার চলার পর কেশবচন্দ্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত নির্দ্ধারণের জন্য, আদিসমাজের পদ্ধতি ও নিজেদের অবলম্বিত পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতি তদানীন্তন এডভোকেট জেনাবেলের হস্তে অর্পণ পরিলেন। তিনি উভয় পদ্ধতিকেই আইনের চক্ষে অবৈধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত উন্নতিশীল দলের ঘোর বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজ নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণেব মত সংগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈধ। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে, উভয় সমাজের পদ্ধতিই শাস্ত্রানুসারে অবৈধ।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই এই মতভেদ ও বিবাদ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মম্যারেজ বিল নামে যে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ঐ নাম পরিত্যাগ করিয়া "নেটিব ম্যারেজ বিল" নামে এক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের মুখপাত্র হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতির ও দেশের অপরাপর প্রদেশের পত্রিকাদির প্রতিবন্ধকতায় সে সংকল্পও পরিত্যাগ করিতে হইল।

ওদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনটিকে নামহীন রাখিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে যখন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন

দুইটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রথম, এই নূতন আইনে কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়স কত রাখা হইবে? দ্বিতীয়, এই আইন কাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইতেছে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতসংস্কার সভার সভাপতি রূপে দেশের নানা প্রদেশেব সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণেব মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশেব মতে এদেশীয় বালিকাদের বিবাহোপযুক্ত বয়স ষোড়শ বর্ষের উপরে নির্দ্দিষ্ট হইল। কেবল কলিকাতা মেডিকেল কালেজেব অন্যতম প্রোফেসার ডাক্তাব চার্লস প্রভৃতি কেহ কেহ লিখিলেন যে, চতুর্দ্দশ বর্ষকে সর্ব্বনিম্নতম বয়স মনে কবা যাইতে পাবে। তদনুসাবে, ১৮৭২ সালেব তিন আইন নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহাতে চতুর্দ্দশ বর্ষ বালিকাদিগের সর্ব্বনিম্ন বিবাহোপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটিব মীমাংসা গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কবিলেন যে, এই নূতন আইন তাহাদেরই জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহারা প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, য়িহুদী প্রভৃতি কোনও ধর্ম্মে বিশ্বাস কবে না এবং ঐ সকল ধর্ম্মেব নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসাবে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। বাহিরেব লোকেব মনে এই কথা দাঁড়াইল যে, ব্রাহ্মেবা বলিতেছে—"আমবা হিন্দু নই।" আদি সমাজ এই কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলও আপনাদের পক্ষসমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা সামাজিক ভাবে হিন্দু হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্ম উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বজনীন একেশ্বব-বাদ, সুতবাং তাহাকে ঠিক হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না।

এই আন্দোলন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের জাতীয় সভা এবং শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরেব প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা প্রধানরূপে বিবাদ ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। জাতীয় সভার উদ্যোগে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে এক বক্তৃতা দেওয়া হইল। আদিসমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সেই বক্তৃতা দিলেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতান্তে সভাপতির কার্য্য করিলেন। অচির কালের মধ্যে ঐ বক্তৃতাব ভূয়সী প্রশংসা এদেশের সর্ব্বত্র ও অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ এবং তাঁহাদের সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই বক্তৃতার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বসু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিলেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী খেলৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন হইত। এই সভা কয়েক বৎসব পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রীয় সাত্ত্বিক আচারের প্রতিষ্ঠা, হিন্দুভাবের পুনরুত্থান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভ্যর্থনা, প্রভৃতি কার্য্য লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছিল।

কিন্তু এই সময়েই ইহা একটি প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইল। ছি! ছি! ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে চায় না, এই রব যেমন দেশে উঠিয়া গেল, তেমনি এই সভার উদ্যোগে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল।

চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্ব্বের ন্যায় নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন না; এবং যুবকদলের তাঁহার দিকে আর সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই তাঁহার বিরোধী দল দেখা দিল; তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যুবক দলের নেতৃত্ব একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া, কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একান্তবাসী হইলেন, স্বপাকে আহার করিতে লাগিলেন; গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং বৈরাগ্য প্রচারে রত হইলেন। 'সমদর্শী' দল এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, যুবক দলের উপর হইতে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি চলিয়া গেল।

কিন্তু যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃহীন রহিল না। দুই জন প্রতিভাশালী নেতা আসিয়া এই সময়ে বঙ্গের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৭৪ সালে এক দিকে আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে ফিরিলেন, অপরদিকে সেই সময়েই বা কিঞ্চিৎ পরেই সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন। ইঁহারা উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হাজার হাজার যুবক ইঁহাদের কথা শুনিবার জন্য ছুটিতে লাগিল; এবং হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল, যুবকদল যেন ব্রাহ্মসমাজের দিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইল। মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজ স্থাপিত হইয়া সেই গতিকে কিয়ৎপরিমাণে নিয়মিত করিয়াছিল, কিন্তু আমার মনে হয়, যুবকদলের সেভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই।

যখন ছাত্রদল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইল। তাহা ভারতসভার স্থাপন। তাহার ইতিবৃত্ত এই :— বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মিলনের স্থান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইঁহাদের সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা হইত। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের উপযোগী কোনও সভা নাই। কথা বার্ত্তা হইতে হইতে অবশেষে একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে ভারতসভা স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে

সে একটা স্মরণীয় দিন। যত দূর স্মরণ হয়, সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহা সত্ত্বেও তিনি সভাস্থলে আসিয়া ভারতসভা স্থাপনে সহায়তা করিলেন। আমাদের অনেকের সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় ভারতসভাতে যোগ দিলেন; এবং পরে ইহার সহকারী সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারতসভা একটি মহৎকাজ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিযুক্ত করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা করাইতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকারী বক্তাগণ সর্বত্র ভারতসভার দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহার অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং রাজনীতির চর্চার অভ্যাস যাদের ছিল না, সেই চর্চাতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ও যত্নপর ছিলেন।

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ দুই ভাগে বিভক্ত হন, প্রতিবাদকারী দল ১৮৭৮ সালের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী সভ্যগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে সিটীস্কুল নামে একটি নূতন স্কুল স্থাপিত হয়। উহার অনুষ্ঠান-পত্র আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার নামে বাহির হয়। আনন্দমোহন বাবু তাহার পরামর্শ দাতা, সুরেন্দ্র বাবু একজন শিক্ষক ও আমি প্রথম সেক্রেটারী থাকি। এই সিটীস্কুলের স্থাপন সে সময়কার একটি বিশেষ ঘটনা বলিয়া এসকল বিষয় উল্লেখ করিতেছি। সে সময়ে ইহা সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদলের ও তাহাদের অভিভাবকদিগের এত প্রিয় পাত্র ছিলেন যে, স্কুল খুলিবামাত্র প্রথম মাসেই ছাত্র সংখ্যা এত হইল যে, ব্যয় বাদে অর্থ উদ্বৃত্ত হইল।

ঐ ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ছাত্রদিগের জন্য ছাত্রসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটীস্কুলের ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার অধিবেশন হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত শিক্ষা প্রণালী ধর্ম্ম শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা ঐ ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র এই সমাজে যোগ দিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় ও আমি প্রধানতঃ এই সমাজে উপদেশ দিতাম। ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, সাধারণ জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ হইত। মধ্যে মধ্যে আমরা ২০০/৩০০ ছাত্র লইয়া শিবপুরের কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে যাইতাম এবং নানাপ্রকার সদালোচনাতে-

সমস্ত দিন যাপন করিয়া আসিতাম। এই প্রকারে ছাত্র দলের মধ্যে কিছু দিনের জন্য নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। ছাত্রসমাজ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এক্ষণে এই কালের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে, কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বিলাত গমনের পূর্ব্বে ১৮৬৯ সালের শেষভাগে ঢাকার ব্রাহ্মমন্দিব স্থাপন করিবার জন্য ঢাকাতে গমন করেন। তৎপূর্ব্ব চৈত্র মাসে তিনি দ্বিতীয়বার ঐ সহরে গিয়াছিলেন; এবং একমাস কাল তথায় বাস করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৬৯ সালেব শেষ ভাগে যে আবার গমন করেন তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় একস্থানে এই ভাবে দিয়াছেন :—

"স্বনাম-ধন্য কেশবচন্দ্র তাঁহার কতিপয় শিষ্যসহ ঢাকায় আগমন করিলেন. কেশব ইংরাজীতে ও তৎপরে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ঢাকাব সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিস্মিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা ঢাকার নগর সঙ্কীর্ত্তনে প্রথম উত্তোলিত হইল। যাহারা কোন অংশে ব্রাহ্ম নহে, তাহারাও নগব সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত, ঋষিবেশে সুশোভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্দ্রকে ধর্ম্ম পুরুষ মনে করিয়া নমস্কার কবিল. এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা অতি আশ্চর্য ও অতি পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সম্মান করিতে শিখিল।"

"কিন্তু এই সময় হইতে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজের মূর্তি পরিবর্ত্তিত হইল। উহা এখন আর ব্রহ্মোপাসনার মন্দির মাত্র, এই ভাবে লোকের চক্ষে প্রতিভাত হইল না। ব্রাহ্মগণ সমাজ-বদ্ধ হইয়া যথারীতি দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজ ত্যাগ, দলাদলি আরম্ভ হইল, দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু ব্রাহ্মণ যুবা উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নবকান্ত, নিশিকান্ত ও তদনুজ শীতলাকান্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই ধনসম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র। তাঁহারা যখন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন আরও বহু যুবা তাঁহাদিগের পথ লইল, তখন ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল।"

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সুপ্রসিদ্ধ কে. জি. গুপ্তের পিতা কালীনারায় গুপ্ত স্বপুত্রে ও অপরাপর যুবক প্রভৃতি প্রায় ৪০ চল্লিশজন লোক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক দিকে এই দীক্ষার ফলস্বরূপ প্রাচীন সমাজে সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদ ঘটান হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে ব্রাহ্মসমা

নব প্রবিষ্ট যুবকগণ মহোৎসাহে নানা বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

কেবল তাহা নহে। ১৮৭০ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "শুভসাধিনী" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তাহা লোকের চিত্ত বিনোদন ও শিক্ষা উভয়ের প্রধান উপায় স্বরূপ হইল। তৎপরে ঘোষজ মহাশয় সমাজসংস্কারে উৎসাহদানার্থ "সমাজ-শোধিনী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এ গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

তৎপরে কলিকাতাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইলে, তাহার এক বৎসর পরে কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বান্ধব" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। "বান্ধব" বঙ্গ সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতি প্রতিপত্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ব্রাহ্মসমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণেব যে কার্য্যতৎপরতার উল্লেখ অগ্রে করিয়াছি, তাহা এই কালের মধ্যে ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত করে। এই সকল কার্য্যে পূর্ব্বোল্লিখিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় যুবক প্রধান সারথিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথম এই সময়ে কিছুদিন "শুভসাধিনী" নামে ব্রাহ্মদিগের একটি সভা ছিল। বোধ হয় তাহার সংশ্রবেই কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার "শুভাসাধিনী" পত্রিকা বাহির করিয়া থাকিবেন। ১৮৭০ সাল হইতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অভয় কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার দাস তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। এই সভার উদ্যোগে "অন্তপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। নবকান্ত বাবুই তাহার সম্পাদক হইলেন। ইঁহারা অর্থসংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পাঠেব ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই বিষয়ে ইঁহাদেব কৃতকার্য্যতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টও নাকি ১৫০ টাকা সাহায্য দিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে "বাল্য বিবাহ নিবারিণী সভা" নামে এক সভা স্থাপিত হইল। ঢাকা কালেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভার সভাপতি হইলেন। ইহাতেই প্রমাণ যে, এই সভা সকল শ্রেণীর উদার-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে এই সভার সভ্যগণ "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নবকান্ত বাবু ঐ পত্রের সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করেন। এরূপ তাজা তাজা মনের ভাব প্রকাশক, হৃদয় মনের তন্ময়তা-সূচক পত্রিক আমরা অল্পই পড়িয়াছি। তাহার ফল কোথায় যাইবে! দেখিতে দেখিতে

ঢাকার যুবকদলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহোৎসাহের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিকে ব্রাহ্মযুবকগণ জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া, মুসলমানের সহিত আহারাদি করিয়া সমাজ হইতে বর্জ্জিত হইলেন; এবং ঘোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন, অপর দিকে আশ্রয়গ্রহণার্থিণী কুলীন কন্যাদিগকে ও হিন্দু বিধবাদিগকে আশ্রয় দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার এক একটি ঘটনা যেন কোনও অদ্ভুত উপন্যাসের এক এক পরিচ্ছেদের ন্যায়! এক একটি বিধবা বা কুলীন কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে লাগিলেন। একটি কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিবাহের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করাতে, একজন যুবক, ঐ কন্যার অভিভাবকগণের প্রেরিত গুণ্ডার লগুড়াঘাতে মাথা ফাটিয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলেন। তথাপি তাঁহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না।

আর একটি পলায়িতা ও আশ্রয়ার্থিনী কুলটার কন্যাকে আশ্রয় দেওয়াতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। সৌভাগ্য-ক্রমে ইংরাজ বিচারপতির বিচারে ঐ কন্যার অভিভাবকতা ভার তাহার মাতার হস্ত হইতে লইয়া নবকান্ত বাবুর প্রতি অর্পিত হইল।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ ছিলেন। নিজে ধনী ব্রাহ্মণ গৃহস্থের সন্তান হইয়াও যখন দারিদ্র্যে পড়িলেন, তখন দরিদ্র ভদ্রসন্তানদিগকে পথ দেখাইবার জন্য নিজে জুতার দোকান করিয়া জুতা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রাচীন সমাজের অনেকে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি জ্ঞানে বা পদ-সম্ভ্রমে পূর্ব্ববঙ্গে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু এই কালের মধ্যে ঢাকাতে যতপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহার অধিকাংশের উদ্ভাবনকর্ত্তা। তিনি সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এখানে দিতেছি। বাঙ্গলা ১২৫২, ইংরাজী ১৮৪৬ সালের ১৪ই আশ্বিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ঐ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা জজ আদালতের উকীল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বধর্ম্মানুরাগী ও ব্রাহ্মসমাজ-বিদ্বেষী মানুষ ছিলেন। ১৮৬৫ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, তখন তাঁহার প্রভাব হইতে যুবকদলকে বাঁচাইবার জন্য যে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা স্থাপিত হয় তিনি তাহার মূলে ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুরাগী মানুষদিগকে একত্র করিয়া ঐ নবধর্ম্মকে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু কি বিচিত্র ঘটনা! তাঁহার পুত্রগণই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল! জ্যেষ্ঠ শ্যামাকান্ত ব্যতীত আর তিন পুত্র নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত

ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে নবকান্তকেই নির্যাতন ও দারিদ্র্যের তাড়না বিশেষভাবে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার দেখিয়া পিতা কাশীকান্ত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এমন কি প্রহার পর্যান্ত করিতে বিরত হন নাই। কিন্তু কিছুতেই নবকান্তকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না।

তাঁহার পিতৃবিয়োগের পরে তাঁহার কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পিতা উইল করিয়া গেলেন, যে ছেলে স্বধর্মে না থাকিবে সে তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাইবে না। তদনুসারে নবকান্ত সর্ব্বপ্রকার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য ঘোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িলেন। তিনি প্রথমে ধামরাই নামক স্থানের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে শ্রীনগর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, "স্কুলের সম্পাদক তাঁহাকে বিল সম্বন্ধে একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন।" ঢাকাতে আসিয়া তিনি প্রথমে পোগোস স্কুলে, তৎপরে জগন্নাথ কালেজে শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৬৯ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকাতে গিয়া ৪০ জনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার মধ্যে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় একজন ছিলেন। সে সময়ে ঢাকাতে কিরূপ আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি।

ইহার পরে নবকান্ত বাবু নানা সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার ভবন আশ্রয়ার্থিনী হিন্দু বিধবা ও কুলীন কন্যাগণের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিল। তিনি কৌলীন্য-প্রথা ভঞ্জন, বহু বিবাহ নিবারণ, সুরা-পান ও দুর্নীতি নিবারণ প্রভৃতি সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে অবিরাম পরি-শ্রম করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে রত থাকিতে থাকিতে বাঙ্গলা ১২৯১ সালের ১৪ই আশ্বিন তাঁহার জন্মদিনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কার্য্য ব্যতীত এই কালের মধ্যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীন্য-প্রথা নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মনকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তাহা দশম পরিচ্ছেদে তাঁহার জীবন চরিতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রাজবিধির দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াস বহু পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সেই উদ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সেরূপ সহায়তা পান নাই; রাসবিহারী অশিক্ষিত হইয়াও তাঁহার উৎসাহদাতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রতি হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহুদিন সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির অনুকূল বাক্য শোনা যাইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ

রাজনারায়ণ বসু

প্রকৃত পক্ষে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের মানুষ নহেন। ১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান; এবং সেই সালেই তাঁহার প্রধান কার্য্য আরম্ভ হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ অগ্রেই করা উচিত ছিল। কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ সালের মধ্যে তাঁহার শক্তি বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গদেশীয় জাতীয় চিন্তাতে প্রধান রূপে অনুভূত হয়, এইজন্য এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে, কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বসু বংশে, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্ম হয়। এই বোড়ালের বসুরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী ছিলেন। ইংরাজেরা গোবিন্দপুরে যখন কেল্লা নির্ম্মাণ করেন, তখন তত্রত্য বসু পরিবারকে বাহির সিমলাতে এওয়াজি জমি দিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া দেন। কালক্রমে রাজনারায়ণ বসুর প্রপিতামহ শুকদেব বসু, কলিকাতা হইতে উঠিয়া গিয়া বোড়ালে বাস করেন। ইঁহার পিতামহ রামসুন্দর বসু, দয়া দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পিতা নন্দকিশোর, বসু বংশের সর্ব্বজন-প্রশংসিত গুণসকলের অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং তদুপরি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন, এবং কিছুদিন রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এরূপ কথিত আছে যে, মৃত্যু শয্যাতে শয়ান হইয়া তিনি রামমোহন রায়ের কৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ আনাইয়া পাঠ করাইয়াছিলেন; এবং ইংলণ্ডের ব্রিষ্টলনগরে ওঁকার জপিতে জপিতে যেমন রাজার মৃত্যু হইয়াছিল তেমনি ওঁকার জপিতে জপিতে ইঁহারও মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই পিতার সন্তান। বাল্যকালে বোড়াল গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তখন কলিকাতার দক্ষিণ প্রদেশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্দ্ধমানের গুরু দেখা যাইত। এই গুরুরা আসিয়া ধনী গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। একা গুরু মহাশয় খুঁটি ঠেশান দিয়া বেত্র হস্তে বসিতেন, সর্দ্দার ছেলেরা তাঁর সহকারীর কাজ করিত; নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার সাহায্য করিত; গুরুমহাশয়ের পয়সাদি আদায় করিয়া দিত; তাঁহার পাকাদি কার্য্যের সাহায্য

করিত; পলাতক বালকদিগকে ধরিয়া আনিত ইত্যাদি। এইরূপ পাঠশালে রাজনারায়ণ বসুর শিক্ষা আরম্ভ হইল।

পাঠশালে কিছুদিন শিক্ষা করার পর, সাত বছর বয়সের সময়, পিতা তাঁহাকে কলিকাতাতে আনিয়া আর এক গুরুর পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বসুজ মহাশয় বৌবাজারের শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ পাড়ায় ছোট ছোট স্কুল খুলিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শম্ভু মাষ্টার তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহা অধিক দিন থাকিল না। অচির কালের মধ্যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মহাত্মা হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। এই খানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার প্রতিভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্কুলের বালকগণ মিলিয়া এক সদালোচনা সভা স্থাপন করিল। তাহাতে রাজনারায়ণ বাবু একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেন; এবং তাহার এক অধিবেশনে Whether Science is preferable to Literature—সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান অধিক আদরণীয় কি না—এই বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় সে দিনকার অধিবেশনে হেয়ার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

হেয়ার তাঁহাকে ফ্রী বালকরূপে হিন্দুকালেজে প্রেরণ করেন। এই হিন্দু কালেজ পরে প্রেসিডেন্সি কালেজরূপে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু কালেজে গিয়া তিনি একদিকে যেমন প্রতিভাশালী ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদিগের হস্তে পড়িলেন, তেমনি অপর দিকে একপ সকল সমাধ্যায়ী বন্ধু পাইলেন, যাহাদের দৃষ্টান্ত ও সহবাসে তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। শিক্ষকদিগের মধ্যে সাহিত্যের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডসন ও গণিতাধ্যাপক মিষ্টার রীজের নাম প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। ডি. এল. রিচার্ডসনের বিবরণ অগ্রেই দেওয়া হইয়াছে। রীজ সাহেব এক সময়ে সুবিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সৈন্য দলে সামান্য একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। তৎপরে নানা ঘটনা ও নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দুকালেজের গণিতাধ্যাপকের কার্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গণিতে তাঁহার মত সুপণ্ডিত লোক প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার সংশ্রবে যে কোন ছাত্র একবার আসিয়াছে সেই তাঁহার গণিত-বিদ্যা-পারদর্শিতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু চিরদিন গণিতকে ডরাইতেন; সুতরাং রীজকে যমের মত দেখিতেন।

যাহা হউক এই সময়ে প্রতিভাশালী শিক্ষকের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার

চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল। অপর দিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশ নাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সহাধ্যায়ী রূপে পাইয়া তাঁহার আত্মোন্নতির বাসনা প্রবল হইল। তাহার ফলস্বরূপ তিনি কালেজের ভাল ভাল পারিতোষিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে লাগিলেন।

হিন্দুকালেজে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়া তিনি ১৮৪৪ সালে উত্তীর্ণ হইলেন। পর বৎসর তাঁহার পিতার দেহান্ত হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন; এবং উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে ইংলণ্ডে দ্বারকনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈষয়িক অবস্থা মন্দ হইলে উপনিষদ অনুবাদকের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তাহারও কর্ম্ম গেল। তিনি প্রায় দেড় বৎসর কাল বসিয়া রহিলেন। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়কার স্মরণীয় বিষয় একটি আছে। সংস্কৃত কালেজে যে তিনি কেবল ক্লাসের ছাত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন তাহা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পরবর্ত্তী সময়-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতেন। এই সূত্রে রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে উঁহাদের আত্মীয়তা জন্মে।

১৮৪৮ হইতে ১৮৫০ এই কালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত ধর্ম্ম বিশ্বাসে একটি সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটে; তাহাতে রাজনারায়ণ বাবুর একটু হাত ছিল বলিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে;—সে পরিবর্ত্তনটি এই। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বেদকে আপনাদের ধর্মবিশ্বাসের অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুও সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; এবং প্রচার করিতেন। কিন্তু ডাক্তার ডফ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত এই বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া তাহার ফল স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেও বিচার উপস্থিত হইল। কাশী হইতে চারিজন বেদজ্ঞ ছাত্র ফিরিয়া আসিলে এই বিচার আরও পাকিয়া উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু যখন বেদে অভ্রান্ততাবাদ রক্ষা করা কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহার ফল স্বরূপ বেদের অভ্রান্ততাবাদ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত হইতে পরিত্যক্ত হইল; এবং মানবের ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে নিহিত হইল।

১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান। সেখানে তিনি ১৮৮৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ছিলেন। মেদিনীপুর গিয়া তাঁহার কার্য্যশক্তি অদ্ভুত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। সভার পর সভা এইরূপে এত প্রকার সভা সমিতি করিতে লাগিলেন যে, একবার সেখানকার একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে,—আপনার সভার জ্বালাতে আমরা অস্থির; এইবার সভানিবারণী সভা নামে একটা সভা স্থাপন না করিলে আর চলিতেছে না। ঐ সভার সভ্যদিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও সভার সংবাদ পাইলেই লাঠি সোটা লইয়া উপস্থিত হওয়া।

মেদিনীপুরে অবস্থান কালে রাজনারায়ণ বাবু প্রধানতঃ সাত প্রকার কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন।

(১ম) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন।

(২য়) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ স্থাপন।

(৩য়) জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা স্থাপন।

(৪র্থ) সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন।

(৫ম) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

(৬ষ্ঠ) ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন।

(৭ম) Defence of Brahmoism and of the Brahmo Samaj নামক পুস্তিকা প্রণয়ন।

ইহার প্রত্যেকটির জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেলা স্কুলে তাঁহার পূর্ব্বে একজন ফিরিঙ্গী হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে স্কুলটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহারও মনে উন্নতির স্পৃহা দৃষ্ট হয় নাই। বসুজ মহাশয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই স্কুলটির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে আপনাকে নিয়োগ করিলেন। একদিকে শিক্ষকগণের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; অপরদিকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী করিয়া তুলিলেন। তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনচরিতে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম প্রথম ছাত্রদিগকে শারীরিক শাস্তি দিতেন; কিন্তু ত্বরায় সে পথ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন যে, শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা প্রেমের দ্বারা বালকদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিলে অধিক কাজ করা যায়। সেইরূপে তিনি তাহাদিগকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার ফল আমরা পরবর্ত্তী সময়ে দেখিয়াছি। অতি অল্প ছাত্রকেই গুরুর প্রতি এরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে দেখিয়াছি। উত্তর কালে তাঁহার ছাত্রদিগের অনেকে কৃতি ও যশস্বী হইয়া নানা বিভাগে

নানা কার্য্যে গিয়াছেন। প্রায় সকলেই মেদিনীপুরের ও রাজনারায়ণ বাবুর স্মৃতি হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই ছাত্রেরাই উত্তরকালে উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের গুরুভক্তির চিহ্নস্বরূপ মেদিনীপুরে একটি আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে উপহার দিয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ স্থাপন। কোন্নগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুরের ডিপুটী কালেক্টরের কাজ করেন, তখন তাঁহার উদ্যোগে সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্তু শিবচন্দ্র বাবু কর্ম্মসূত্রে সে স্থান পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে সে সমাজ উঠিয়া যায়। রাজনারায়ণ বাবু ১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে পদার্পণ করিয়াই ১৮৫২ সালে সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; এবং নিজেই তাহার উপাসনাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বলিতে গেলে এতৎসংক্রান্ত কার্য্যই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্যরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত; এই সমাজের সংশ্রবে তিনি যে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া দেশমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। ইহা স্মরণীয় ঘটনা যে, তাঁহার মেদিনীপুরের উপদেশ পাঠ করিয়াই সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অচির কালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে মেদিনীপুর বঙ্গদেশের মধ্যে একটা প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। বসুজ মহাশয় কেবল মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইলেন। অনুমান ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে কৃষ্ণধন ঘোষ নামক একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যুবকের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইল। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুরে গমন করিলেন; এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ সমবেত হইলেন। সে অনুষ্ঠানের তরঙ্গ দেশের অপরাপর দূরবর্ত্তী স্থানেও অনুভূত হইল।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুর বাস কালের প্রধান কার্য্য "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন। এই গ্রন্থ তিনি ১৮৫৩ সালে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। বলিতে গেলে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়াই তিনি গুরুতর শিরঃপীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জন্মের মত অসুস্থ হইলেন। এই গ্রন্থে যে প্রভূত গবেষণা ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য বিষয় জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা। দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এতৎসংশ্রবে তিনি ইংরাজীতে "A society for the promotion of national feeling

among the educated Natives of Bengal" নামে এক প্রস্তাবনা পত্র বাহির করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ প্রস্তাবনা পত্র পাঠ করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মনে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলার ভাব উদিত হয়। এই জাতীয়-গৌরব সম্পাদনী সভা সংক্রান্ত একটি কৌতুকজনক স্মরণীয় বিষয় আছে। সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের বাড়াবাড়ি দেখিয়া উক্ত সভার সভাগ এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পরস্পরের সহিত আলাপে বা চিঠি পত্রাদিতে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিবেন; পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে good morning বা good night এর পরিবর্ত্তে "সুপ্রভাত" ও "শুভরজনী" বলিবেন, কথা বার্ত্তা কহিবার সময় বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী মিশ্রিত করিবেন না, যদি কেহ ভুল ক্রমে ওরূপ করেন, তবে প্রত্যেক ইংরাজী বাক্যের জন্য এক এক পয়সা জারমানা দিতে হইবে।

সুরাপান-নিবারিণী সভার বিষয়ে এইটুকু স্মরণীয় যে, রাজনারায়ণ বাবুর প্রভাবে মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে সুরাপান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে জন্য নাকি তাঁহার প্রতি মাতালদিগের মহা আক্রোশ উপস্থিত হয়। এই মেদিনীপুর বাস কালে তাঁহারই উদ্যোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র দুর্গানারায়ণ এবং তাঁহার মধ্যম সহোদর মদনমোহন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে বিধবা-বিবাহ করেন।

১৮৬৬ সালের মার্চ্চ মাসে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বশতঃ তাঁহার মাথা ঘুর্ণি আরম্ভ হইল। একদিন তিনি আর মাথা লইয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই শিরঃপীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবসৃত হইয়া প্রথমে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন। তিনি কলিকাতাতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র নব্য ও প্রাচীন ব্রাহ্মদল তাঁহাকে ঘিরিয়া লইল। শরীর একটু ভাল হইতে না হইতে তাঁহার আবার শ্রম আরম্ভ হইল। অতঃপর তিনি সাত প্রকার কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন:—(১ম) ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা নিবারণের প্রয়াস; (২য়) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা; (৩য়) সে কাল এ কাল বিষয়ে বক্তৃতা; (৪র্থ) হিন্দুকালেজ ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগের সম্মিলনীর আয়োজন; (৫) বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা; (৬ষ্ঠ) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (An old Hindu's Hope) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ; (৭ম) সারধর্ম্মবিষয়ে গ্রন্থ রচনা।

ইহার সকলগুলিরই প্রভাব বঙ্গসমাজে অনুভূত হইয়াছিল; এবং কোন কোনওটির শক্তি বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালে যখন কতিপয় অনুগত শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা

করিতে আরম্ভ করেন এবং তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই নরপূজার আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সমক্ষেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোনও কোনও আচরণ ঘটে। তাহাতে তিনি (Brahmic Caution, Advice and help) নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে সাবধান করেন; এবং ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নরপূজা নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু এই কালের মধ্যে তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা লোকের দৃষ্টিকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল এরূপ অল্প বক্তৃতার ভাগ্যে দেখা গিয়াছে। ঐ বক্তৃতা যে কারণে ও যে প্রকারে প্রদত্ত হয় তাহা অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। ১৮৭১ সালে ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে তদানীন্তন ট্রেনিং একাডেমির গৃহে উহা প্রদত্ত হইযাছিল। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা ঐ বক্তৃতা দেওয়াইবার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল; এবং ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে এবং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ তদুপলক্ষে তাঁহারা নিজে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসী নহেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু ঐ বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, সুযুক্তি সঙ্গত ও জাতীয়-ভাব-পূর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল। আমার স্বর্গীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সোমপ্রকাশে" লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে হিন্দুকুল-শিরোমণি বলিয়া বরণ করিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে কলির ব্যাস বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন; সুদূর মান্দ্রাজ হইতে ধন্য ধন্য রব আসিতে লাগিল; এবং ইংলণ্ডে টাইমস্ পত্রিকাতে ঐ বক্তৃতার সারাংশ ও তাঁহার অশেষ প্রশংসা বাহির হইল। রাজনারায়ণ বাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। কেশববাবুর পক্ষ হইয়া আমরা কয়েকজন তদুত্তরে বক্তৃতা করিলাম, কিন্তু সে কথা যেন কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না; বরং কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ অহিন্দু বলিয়া হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন।

১৮৭৫ সালে মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের "এমারেল্ড বাউয়ার" নামক উদ্যানে হিন্দু কালেজ ইউনিয়ান নামে হিন্দু কালেজের ভূতপূর্ব্ব ও তদানীন্তন ছাত্রদের এক সামাজিক সম্মিলন স্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু তাহার

প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ঐ সভাতে "হিন্দু কালেজের ইতিবৃত্ত" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে আমরা হিন্দুকালেজের প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক কথা প্রাপ্ত হই।

১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দেওঘর নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গিয়া বার্দ্ধক্য ও শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্বেও দেশের কল্যাণ চিন্তাতে বিমুখ হন নাই। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি "An old Hindu's hopes"—"একজন প্রাচীন হিন্দুর আশা" নামে ইংরাজীতে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে স্বদেশবাসিগণকে এক মহাহিন্দু-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করেন। ঐ গ্রন্থ অনেকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বলিতে গেলে তাহাকে পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অথবা মহাধর্ম্মমণ্ডল নামক সভার পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে। তাহাতে যে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের উদ্দীপনা দেখা যায় তাহা অতীব স্পৃহণীয়।

ইহার পরে তিনি 'তাম্বুলোপহার' নামে বাঙ্গালাতে একখানি ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; এবং সর্ব্বশেষে সারধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে ইংরাজীতে এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে দেখা যায় যে, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিউচ্চ ও উদার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর বস্তুতঃ এই সময়ে তাঁহার নিকটে বসিলে একদিকে তাঁহার ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, অপরদিকে সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বকালের সাধুভক্তগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইত। এক সময়ে তিনি ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছেন; পরক্ষণেই হাফেজের রচনাবলি উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন; আবার হয়ত তৎপরক্ষণেই মাদাম গেওঁর উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-সুধাবনে ভৃঙ্গের ন্যায়, ফুলে ফুলে মধুপান করাই তাঁহার প্রধান কাজ।

এরূপ অবস্থাতে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পূজিত হইয়াছিলেন। একবার দেওঘরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা উপস্থিত—"মশাই কি বৈদ্যনাথে যাবেন?" উত্তর—"হাঁ যাব।" প্রশ্ন—"আপনার পাণ্ডা কে?" উত্তর—"রাজনারায়ণ বসু।" পাণ্ডা হাসিয়া বলিল—"ও ত আমাদের দোসরা বৈদ্যনাথ"। তাঁহার শেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া গিয়া দেখি তাঁহার শুশ্রূষার জন্য একজন খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু নিযুক্ত আছেন; একজন হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার কাছে কয়েক দিন থাকিবার জন্য বৈদ্যনাথের নিকটস্থ তপো পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে, তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবার নিজের গলদেশ হইতে উপবীত লইয়া তাঁহার গলে দিয়া বলিয়াছিলেন,

"রাজনারায়ণ তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমরা তোমার তুলনায় কিছুই নহি।"

এইরূপে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৯ সালে পক্ষাঘাত রোগে তিনি গতাসু হন। ইনি রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সম্মানিত বন্ধু ছিলেন।

আনন্দ মোহন বসু

চরিত্রবান মানুষই একটা জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্ দেশে কত ধন ধান্য আছে, তাহা দিয়া সে দেশের মহত্ত্বের বিচার নহে, কিন্তু সে দেশ কত চরিত্রবান, গুণী, জ্ঞানী, মানুষকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, এই সকলের দ্বারাই সেই মহত্ত্বের বিচার। বঙ্গদেশ যে নব্যভারতে গৌরবান্বিত হইয়াছে তাহা ইহার ধন ধান্যের জন্য কখনই নহে। যে দেশ রামমোহন রায়কে জন্ম দিয়াছে, যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মানুষ দেখা দিয়াছে, যে দেশে দেবেন্দ্রনাথের ঋষিত্ব, কেশবের বাগ্মিতা, রাজেন্দ্র লালের পাণ্ডিত্য, মহেন্দ্রের সত্যানুরাগ, বঙ্কিমের প্রতিভা, কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব, আরও ছোট বড় কত কত ব্যক্তির মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে দেশ কি লোকচক্ষে বড না হইয়া যায়! আনন্দ মোহন বসু, শিক্ষা ও সাধুতাতে এই গৌরবান্বিত দলের একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি একজন প্রধান পুরুষ। সুতরাং তাঁহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে যাইতেছি :—

আনন্দমোহন পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মলোচন বসু। পদ্মলোচন ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারী কাজ করিতেন; এবং পদে ও সম্ভ্রমে বড় লোক ছিলেন। হর মোহন ও মোহিনী মোহন নামে পদ্মলোচন বসু মহাশয়ের আর দুই পুত্র ছিলেন; হরমোহন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং মোহিনী মোহন সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, আনন্দমোহন দ্বিতীয়।

আনন্দমোহনের পঠদ্দশাতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বিধবা মাতা উমাকিশোরীর প্রতি তিন পুত্রের রক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতির ভার পড়ে। তিনি সে ভার সমুচিতরূপেই বহন করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণা নারীর একদিকে যেমন সন্তানদিগের প্রতি প্রগাঢ় বাৎসল্য ছিল, অপর দিকে তেমনি তাহাদের চরিত্রের প্রতি প্রখর দৃষ্টি এবং শাসনশক্তিও প্রচুর ছিল। ফলতঃ এই সময় হইতে তিনি কিরূপে একদিকে দক্ষতার সহিত আপনার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অপর দিকে সন্তানগণের রক্ষা ও শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাহা যখন শ্রবণ করা যায় তখন

বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনে হয় এই সকল রমণী যদি সমুচিত শিক্ষা ও কার্য্য করিবার সুবিধা লাভ করিতেন তাহা হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে এক একটি শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়া দেশের কি মহোপকারই সাধন করিতে পারিতেন!

ধর্ম্ম-পরায়ণতা আনন্দমোহনের মাতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহার পতির মৃত্যুর পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁহার পতির স্মৃতিকে হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থানে ধারণ করিয়াছিলেন। সামান্য কথোপকথনে যদি কেহ তাঁহার স্বর্গীয় পতির নাম উচ্চারণ করিত, উমাকিশোরী তৎক্ষণাৎ বক্তাকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইতে বলিতেন; দুই কর জোর করিয়া নিজ শিরে ধারণ করিতেন; এবং উদ্দেশে স্বর্গীয় কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে অবশিষ্ট কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এরূপ অসামান্য পতিভক্তি কয়জন স্ত্রীলোকে দেখিতে পাওয়া যায়! তৎপরে তাঁহার বংশধরদিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁর সাধুভক্তি এমন প্রবল ছিল যে, তিনি গাড়ি করিয়া পথে যাইবার সময় যদি শুনিতে পাইতেন যে, পথপার্শ্বে একজন মুসলমান পীরের গোর রহিয়াছে, তাহা হইলে কখনই তাঁহার সম্মুখ দিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া যাইতেন না, গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া গলবস্ত্রে সেই গোর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অপর দিকে গিয়া গাড়িতে উঠিতেন। সঙ্গের বালক বালিকারা হাসিয়া বলিত "ঠাকুরমা ওকি, ওযে মুসলমান পীর, তুমি যে হিন্দুর মেয়ে" তখন তিনি বলিতেন—"সাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি রে"? আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাঁহার তিন পুত্রই এই সাধুভক্তি ও উদারতা প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। আর একটি ঘটনা আমাদের স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে। একবার 'সার জন লরেন্স' নামক এক জাহাজে অনেকগুলি জগন্নাথের যাত্রী পুরীতে যাইতেছিল। বঙ্গোপসাগরের মুখে ঝড় হইয়া ঐ জাহাজ জলমগ্ন হয়। সেই জাহাজে বসুজ মহাশয়ের মাতার যাইবার কথা ছিল, কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ যাওয়া হয় নাই। তাঁহার পৌত্র পৌত্রীরা যখন গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিল, বলিতে লাগিল—"ঠাকুরমা, ভাগ্যে তুমি সে জাহাজে যাও নাই, জাহাজ ডুবে এত লোক মরেছে।" তখন সেই সংবাদ শুনিয়া আনন্দ না করিয়া উমাকিশোরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—"হায় না জানি আমার পূর্ব্বজন্মের কি পাপই আছে! আমি কেন সে জাহাজে থাকিলাম না? জগন্নাথের পথে যাদের প্রাণ যায় তারা ত ধন্য।"

বলিতে গেলে শৈশব হইতেই আনন্দমোহন এই সাধুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কোনও সৎ বিষয়ে প্রসঙ্গ হইলেই পিপীলিকা যেরূপ মধুবিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তিনি সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেন; এবং ধর্ম্মের বিধিব্যবস্থা সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেন।

যেমন একদিকে ধর্ম্মানুরাগ তেমনি অপর দিকে আশ্চর্য্য প্রতিভা। পাঠে অত্যল্প বালকেরই এ প্রকার অভিনিবেশ দেখা যাইত। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন নয় বৎসরের অধিক হইবে না তখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া চারি টাকা বৃত্তি পাইলেন; পাইয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ১৮ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; সেজন্য গোলমালে তাঁহার পরীক্ষার পূর্ব্বে তিন মাস পড়া হয় নাই; তথাপি এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে বা ইহার কিছু পরে প্রসিদ্ধ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজে আসেন; এবং এখানে এল-এ. বি-এ. এম-এ. প্রভৃতি সমুদয় পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিতে থাকেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও পারিতোষিকাদি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

ময়মনসিংহে থাকিতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মদিগের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কলিকাতাতে আসিয়া অপরাপর যুবকের ন্যায় তিনিও কেশবচন্দ্রের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন; এবং ১৮৬৯ সালে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অপর কতিপয় বন্ধুর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি এঞ্জিনিয়ারিং কালেজে অঙ্কশাস্ত্রের প্রোফেসারের কর্ম্ম পান। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন; এবং সেই বৃত্তির টাকা বৃথা ব্যবহার না করিয়া ইংলণ্ডগমনে ও নিজ শিক্ষার উন্নতিবিধানে নিয়োগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন।

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন আনন্দমোহন তাঁহার সমভিব্যাহারী হন। ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকার সর্ব্বোচ্চ র‍্যাঙ্গলার উপাধি লাভ করেন। সেখানে বাসকালে তিনি যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন তাহা নহে। ভলন্টিয়ার দলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন; ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির সহিত মিলিয়া ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন, সভাসমিতিতে রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতাদি করিতেন; সুরাপাননিবারণী সভার সহিত যোগ দিয়া সুরাপানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতেন; এবং সর্ব্বপ্রকারে আপনার হৃদয় মনের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত থাকিতেন।

১৮৭৪ সালে তিনি বারিষ্টারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলেন।

ফিরিয়া দেখেন, ব্রাহ্মসমাজে আবার সমর-দুন্দুভি বাজিতেছে। স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন ও সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের আন্দোলন উঠিয়াছে। কিন্তু ওদিকে যুবকদলের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি হ্রাস হইতেছে। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃত্ব হইতে অবসৃত হইয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি লইয়া একান্তে সরিয়া পড়িতেছেন। বসুজ মহাশয় এই অবস্থাতে প্রথমে ছাত্রদলকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ছাত্রদিগের জন্য একটি সভা স্থাপন করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহাদের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত হইলেন। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয় ও নিয়মতন্ত্র-পক্ষীয় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত উভয় বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার ও স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের সাহায্যে স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষীয়গণের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ভারত-মহিলা-বিদ্যালয় পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয় নাম ধারণ করিল, এবং মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইল। এই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় পরে বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া বেথুন কালেজরূপে পরিণত হয়।

এই ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়া কলিকাতাতে আসিলেন; এবং আনন্দমোহনের সহিত মিলিত হইয়া রাজনীতি চর্চ্চাতে নিমগ্ন হইলেন। সেই চর্চ্চার ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা (Indian Association) স্থাপিত হইল। আনন্দমোহন তাহার প্রথম সেক্রেটারি হইলেন; এবং বহুদিন সেক্রেটারি ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন ও নিয়মতন্ত্র-প্রণালী স্থাপনের আন্দোলন পাকিয়া উঠিতে না উঠিতে ১৮৭৮ সালের মার্চ্চ মাসে সুপ্রসিদ্ধ কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া গেল এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া দুইভাগ হইয়া গেল। স্ত্রীস্বাধীনতার দল নিয়মতন্ত্রের দল ও কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদকারী দল, তিন দল মিলিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন।

যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, তাঁহারা আনন্দমোহনকে সারথি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি হইলেন। তৎপরে ইহার কার্য্যে তাঁহার যে প্রকার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম দেখা গেল তাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মানুষে কি এত খাটিতে পারে? ইহার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে চিন্তা ও বিচার করিতে করিতে এক এক দিন রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাইত, আমরা আর বসিতে পারিতাম না, কিন্তু আনন্দমোহনের শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না। আমরা দেখিতাম ইহার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি আপনার বারিষ্টারি ও ধনাগমের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহা না হইলে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে, ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে, তিনি বারিষ্টারি দ্বারা দেশের ধনীদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য হইতে পারিতেন।

ইহার পরে শিক্ষা বিভাগে তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইল। ১৮৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সেনেটের একজন ফেলোরূপে বরণ করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হইতে সিণ্ডিকেটে গেলেন। সিণ্ডিকেটের মেম্বররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষয়ে সহায়তা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিলেন না। ১৮৭৯ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত মিলিয়া তিনি সিটীস্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। ঐ স্কুল ক্রমে সহরের একটি প্রধান কালেজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বসুজ মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ঐ কালেজের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ইহার কার্য্যে তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পুনার ফার্গুসন কালেজের ভ্রাতৃমণ্ডলীর ন্যায় একটি ত্যাগশীল ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করিয়া তাঁহাদের হাতে কালেজটি দিয়া যান; কিন্তু ঐ কালেজ-সংসৃষ্ট বন্ধুগণের প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; অবশেষে কালেজটি ট্রষ্টডীড্ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৪ সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের বিশেষ অনুরোধে তিনি এডুকেশন কমিশনের সভ্য হন; এবং তাঁহার কার্য্য সমাধা করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আপনাদের প্রতিনিধি রূপে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে প্রেরণ করেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত সভার সভ্যরূপে মনোনীত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনাররূপেও মনোনীত হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ কিরূপে একজন মানুষ এত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম যে, যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন, সিটীকালেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে পরিশ্রম করিতেছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে নূতন আইন প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেছেন, ভারতসভাতে রাজনীতির চিন্তা করিতেছেন, তখন আবার বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া দেশের দুর্নীতি ও সুরাপান নিবারণের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। মেট্রপলিটন টেম্পারেন্স ও পিউরিটী এসোসিয়েশানের তিনি সভাপতি ছিলেন। সুরাপান নিবারণ বিষয়ে যত্ন চেষ্টা তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে করিয়া আসিয়াছেন। পঠদ্দশায় ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার সুরাপান নিবারণী সভার সভ্যগণের সহিত মিলিয়া কাজ করিয়াছেন; এখানে প্যারীচাঁদ সরকার ও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত মিলিয়া সুরাপান নিবারণের জন্য খাটিয়াছেন; এবং শেষদশাতে দেহে যত দিন শক্তি থাকিয়াছে, তত দিন ঐক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াছেন।

রাজনীতি বিভাগেও তাঁহার কার্য্য বড় অল্প ছিল না। অগ্রেই বলিয়াছি

পঠদ্দশাতে ইংলণ্ডে গিয়া উদার-নৈতিক ও ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির সহিত মিশিয়া রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিলেন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই; তাই উদ্যোগী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত একযোগে ১৮৮৬ সালে ভারত সভা স্থাপন করিলেন। ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে। তিনি প্রথম কয়েক বৎসর ভারতসভার পরামর্শদাতা, নির্ব্বাহকর্ত্তা, তত্ত্বাবধায়ক সকলি ছিলেন। পরে অপরেরা তাহাতে যোগ দিলে এবং কার্য্যভার গ্রহণ করিলে তিনি কমিটিতে থাকিয়া চিরদিন ইহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। ন্যাসনাল কংগ্রেসের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহার সকল পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন; এবং একবার মান্দ্রাজ অধিবেশনে ইহার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

এ সকল বলিলেও তিনি কিরূপ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাহা বলা হইল না। তিনি যখনি যে স্থানে যে অবস্থাতে থাকিয়াছেন, স্বদেশের হিতচিন্তা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিয়াছে!

১৮৯৭।১৮৯৮ সালে তাঁহার দুই পুত্রকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। তখন বন্ধুজনের পরামর্শে তিনিও স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যের জন্য গেলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়া তাঁহার স্বদেশ-প্রেম তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না। তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া নানা সভাসমিতিতে ভারতের দুঃখের কাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; এবং এদেশের প্রতি ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞগণের ও ইংরাজজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে সেই গুরুতর শ্রমেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পাড়ল। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে দেশবাসিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য টাউনহলে এক সভা করিলেন। সেই সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন কাল শত্রু ধরিয়াছে। সেই যে কি এক রোগ দেখা দিল, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ গেল! মধ্যে মধ্যে অচৈতন্য হইতেন; এবং কোনও বিষয়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবিতে ও খাটিতে পারিতেন না। চিকিৎসকগণ ও পরিবারবর্গ তাঁহাকে চিন্তা ও শ্রম হইতে দূরে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? যে মানুষ চিরদিন আত্মচিন্তা ভুলিয়া স্বদেশের হিত-চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে কি সম্পূর্ণ নিবারণ করিয়া রাখা যায়! ১৯০৫ সালে ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবের সময় তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া প্রায় সমস্ত দিন ব্রাহ্মমন্দিরে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মালোচনার মধ্যে যাপন করিতে গেলেন। রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাঁহার দমদমাস্থ ভবনে ও কলিকাতার বাসগৃহে ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে এক প্রকার বন্দীদশাতে রাখা হইত; যাহাতে চিত্তে

উত্তেজনা হয় এরূপ কথা শোনান হইত না ; এবং ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধব কম সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে শেষকীর্ত্তি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বক্তৃতা। বলিতে গেলে এক প্রকার মৃত্যু শয্যা হইতে লোকে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া গেল। কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতে গিয়া যাহা বলিলেন তাহার প্রত্যেক বাক্য অগ্নি উদগীরণ করিতে লাগিল। মানব-বাক্যের যে এরূপ উন্মাদিনী শক্তি থাকে, লোকে তাহা জানিত না। তিনি কি ভাবে যে ঐ সভাতে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতাতে উচ্চারিত নিম্নলিখিত প্রার্থনা হইতে জানিতে পারা যায়।

প্রার্থনা

And Thou. Oh God of this Ancient land, the protector and saviour of *Aryavarta* and the Merciful Father of us all, by whatever name we call upon Thee, be with us on this day, and as a father gathereth his children under his arms, do Thou gather us under the protecting and sanctifying care.

ঐ বক্তৃতান্তে তিনি একটি ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে এই ব্যক্ত হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, যথাসাধ্য সেই অনিষ্ট ফল নিবারণ করিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছেন।

বলিতে গেলে সেই ঘোষণা পত্র হইতেই বঙ্গদেশের মহা রাজনৈতিক আন্দোলন উঠিয়াছে। আমরা সেই তরঙ্গের মধ্যে বাস করিতেছি। ইহার চরম ফল কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও অনুভব করা যাইতেছে না। আনন্দমোহনের ন্যায় পবিত্র চিত্ত, অকপট স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ও ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট নেতা এখন কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হইত সন্দেহ নাই।

এই ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপনের পর আনন্দমোহন প্রায় এক বৎসর কাল জীবন্মৃতাবস্থাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাহার মধ্যেও বন্ধুবান্ধবের ও পরিবারবর্গের অজ্ঞাতসারে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে লিখিতে ত্রুটি করেন নাই। দেশের যে কল্যাণচিন্তা দিন রাত্রি তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাহা জীবন্মৃতাবস্থাতেও তাঁহাকে ছাড়ে নাই।

অবশেষে ১৯০৭ সালের ২০ আগষ্ট প্রাতে প্রাণবায়ু তাঁহার রুগ্ন ভগ্ন দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ একজন আদর্শ নেতা হারাইল; জননী-জন্মভূমি একজন অকৃত্রিম ভক্ত সেবক হারাইলেন; বঙ্গদেশ একজন প্রতিভাশালী

ধীমান, মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হারাইলেন; এবং আমরা একজন অকপট, উদারচেতা, বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হারাইলাম। দেশের লোক আনন্দমোহনকে বুদ্ধিমান্, যশস্বী, দেশহিতৈষী, সুবক্তা, কেম্ব্রিজ র‍্যাংলার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বারিষ্টার বলিয়া জানিতেন, কিন্তু আনন্দমোহনের গৌরব সেখানে নহে। তাঁহার প্রধান মহত্ব ও প্রধান আকর্ষণ তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ছিল। গোপনে, দৈনিক জীবনে, যাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের মূলে এই কথা ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের ন্যস্ত নিধি স্বরূপ, ইহা তাঁহার কার্য্যেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে তাঁহার ভক্তি অশ্রুপ্লাবিত মুখ আমরা কখনই ভুলিব না। তিনি অতি অন্তরতম আত্মীয়দিগের নিকটও আপনার হৃদয়ের গভীরভাব সকল ব্যক্ত করিতে লজ্জা পাইতেন; পরিবার পরিজনবর্গও সকল সময়ে তাহা জানিতে পারিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া সহরের বাহিরে নির্জ্জন স্থানে গমন করিতেন; এবং দিনের পর দিন ঈশ্বরচিন্তাতে যাপন করিতেন। নিজের দমদমাস্থ ভবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠালয়ে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তায় যাপন করিতেন। সে সময়কার চিন্তা সকল মধ্যে মধ্যে আপনার দৈনিক লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই সকল দৈনিক লিপি দেখিয়া আমরা মহোপকার লাভ করিতেছি। এরূপ ধার্ম্মিক গৃহস্থ, কর্ত্তব্যপরায়ণ পতি, সন্তানবৎসল পিতা, অকৃত্রিম মিত্র, বিনীত ও ঈশ্বর-ভক্ত সাধক ও স্বদেশপ্রেমিক দেশ-সেবক, প্রায় দেখা যায় না। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যজ্ঞানে দৃঢ়তা, ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বর্ণে তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

দুর্গামোহন দাস

প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর জেলার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙ্গালা ১২৪৮ সালে দুর্গামোহন দাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাশীশ্বর দাস। কাশীশ্বর দাস মহাশয় বরিশালে ওকালতি করিতেন। দুর্গামোহন অল্পবয়সে মাতৃহীন হন। তৎপরে কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িয়া বরিশালে নীত হন। সেখানে ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া জুনিয়ার স্কলাসিপ প্রাপ্ত হন। সেই বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় হিন্দুকালেজে আসেন; এবং কলিকাতার উপনগরবর্ত্তী কালীঘাটে তাঁহার পিতৃব্য বীরেশ্বর দাস মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া পড়িতে থাকেন। হিন্দুকালেজে এক বৎসর থাকিয়া তিনি ঢাকাতে প্রেরিত হন। সেখান হইতে সিনিয়ার স্কলার্সিপ পাইয়া আবার কলিকাতায় আসেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন কালে ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড

কাউএলের সংশ্রবে আসিয়া ঐ সদাশয় ধার্ম্মিক পুরুষের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কাউএলকে যাঁহারা কখনও একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানী, গুণী, ধার্ম্মিক, সাধু পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল; এবং সেই কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কাউএল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; এবং নিজ ভবনে সমাগত বালকদিগের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। দুর্গামোহনের সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাউএলের বাড়ীতে যাইতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি পরে বহুকাল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে সুশোভিত করিয়া বাস করিয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভগবান বাবুর ন্যায় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ও কাউএল মহোদয়ের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন।

দুর্গামোহনের চরিত্রের এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেন, লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনা করিতেন না। যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মন ঝুঁকিল, তখন সে পথে পদার্পণের পূর্ব্বে স্বীয়-বালিকা পত্নী ব্রহ্মময়ীকে লইয়া একজন খ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুর বাড়িতে তুলিলেন। কারণ পত্নীকে ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জানান চাই এবং সম্ভব হইলে তাহাকে দীক্ষিত করা চাই। অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি নিজে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ে আরও কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়া দুই জনে এক সঙ্গে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা ঘটান আর এক। ব্রহ্মময়ীকে খ্রীষ্টীয় পাদরীর বাড়িতে রাখিতে গিয়া তাঁহাকে স্বীয় পিতৃব্যের ভবন হইতে তাড়িত হইতে হইল। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল কালীমোহন দাস মহাশয় বরিশালে ওকালতি করিতেন। তিনি তাঁহাকে আশ্রয়হীন জানিয়া বরিশালে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন; এবং তাঁহার হস্তে মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের গ্রন্থগুলি অর্পণ করিয়া তাহা পাঠান্তে খ্রীষ্টান হওয়া বিষয়ে স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দুর্গামোহনের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভ্রম দর্শন করিলেন; এবং পার্কারের প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বভৌমিক একেশ্বর-বাদ অবলম্বন করিলেন।

দীনবন্ধু বাংলা ১২৩৬ বা ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। কালাচাঁদ মিত্র সামান্য বিষয় কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, নিজ পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, সুতরাং তিনি বাল্যে দীনবন্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে সামান্যরূপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়া অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ কর্ম্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিজ আয়ের অনেক সাহায্য হইত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই কাজ করিয়া দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না। তাঁহার মন অধিক জ্ঞান লাভের জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা আপনাকে অসুখী বোধ করিত।

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কর্ম্ম ছাড়িয়া স্বীয় পিতাকে কিছু না বলিয়া গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, এবং একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া অপরের বাসাতে থাকিতে হইত। কিন্তু কোনও ক্লেশই তাঁহাকে স্বীয় অভীষ্ট পথ হইতে বিরত করিতে পারিত না।

দীনবন্ধুর কলিকাতায় আসা ও বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা বিষয়ে একটি কৌতুকজনক ঘটনা আছে। শৈশবে তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "গন্ধর্ব্ব নারায়ণ, লোকের মুখে এই নাম দাঁড়াইল "গন্ধ", সমবয়স্ক বালকদিকের মুখে হইয়া পড়িল "থু থু গন্ধ, গন্ধ"। এই রূপে পিতৃদত্ত নামটি বালকের অশান্তির একটা কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও তাহার জননী বিদ্রূপকারী বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "তোরা একদিন দেখবি ওর গন্ধে দেশ আমোদিত হবে" তথাপি সমবয়স্কদিগের বিদ্রূপে শিশু গন্ধর্ব্ব নারায়ণ নিশ্চয় উত্যক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাতাতে আসিয়া নিজে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। যাঁহার দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় হইতে 'নীলদর্পণ' বাহির হইয়াছিল, তিনি যে নিজে দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, এটা একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। যাহা হউক তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া এরূপ আগ্রহের সহিত আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংসা ও নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর হইয়াই গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন; প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি "মানব-চরিত্র" নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তাঁহার কবিত্ব খ্যাতি তদানীন্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয়। প্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে

বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু তিনিও চরমে বঙ্কিমের ন্যায় পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনাকে আপনার প্রতিভা বিকাশের উপায়রূপে অবলম্বন করেন।

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহির হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডাক বিভাগে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এতৎ সূত্রে তিনি উড়িষ্যা, নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড় প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি রাজকার্য্য বিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই প্রধান প্রধান কাজের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই যুদ্ধ বাধিলে, ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সমুচিত রূপে নির্ব্বাহ করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যোপলক্ষে যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ ও নানা শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ মানব-চরিত্র দর্শন ও এরূপ বিবিধ-সামাজিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় নাই। তাঁহার রচিত নাটক সকলে আমরা এই সকলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

১৮৫৯ সালে যখন নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগের ধর্ম্মঘট চলিতেছিল, তখন দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন। তিনি তৎপূর্ব্বে নিজে অনেক নীল-প্রপীড়িত স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের দুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ওজস্বিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের পরীক্ষিত ছিল। সুতরাং প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে যে আগুন তখন জ্বলিয়াছিল, তাহা তাঁহারও হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি "নীল-দর্পণ" লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, ১৮৬০ সালের শেষভাগে ঢাকা হইতে নীল-দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীদের অনুমতিক্রমেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং রেভারেণ্ড জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নামে মুদ্রিত করেন। তাহা লইয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং সদাশয় লং সাহেবের যে এক হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ঐ এক হাজার টাকা জরিমানা নিজে প্রদান করেন।

প্রতিহিংসোন্মত্ত নীলকরগণ তখন দীনবন্ধুকে ধরিতে না পারিয়া লংকে

কারাগারে দিয়া এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে মারা করিয়া নিরস্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু স্বীয় নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর হইলেন। "নবীন তপস্বিনী", "বিয়ে পাগলা বুড়ো," "সধবার একাদশী," "লীলাবতী," "জামাইবারিক" প্রভৃতি অদ্ভুত হাস্য-রসাত্মক নাটক সকল পরে পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

শেষদশায় তিনি "সুরধুনী-কাব্য" ও "দ্বাদশ কবিতা" নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি দুবারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহার চরম ফল দারুণ বিস্ফোটকে তাঁহাকে শয্যাস্থ করে। সেই রোগেই ১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে গতাসু হন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ান, তখন তাঁহার শেষ গ্রন্থ, "কমলে কামিনী" নাটক যন্ত্রস্থ। এই তাঁর শেষ সাহিত্য রচনা। তিনি সবজন-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার চিরদিনের বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধে বা সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কার্য্যের সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে এড়াইতে পারিতেন না, কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য, এমন কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই।"

বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে তিনি যত স্থানে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরে অনেক কাল বাস করেন। এখানে তিনি স্থায়ীরূপে থাকিবার মানসে একটি বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণনগরে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "সুরধুনী কাব্য" হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা পরাহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন।
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।"

"একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন, দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।" এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কি অকৃত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে! সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি তন্মধ্যে একটি প্রধান এই যে, "তিনিই সাধু যাঁর সঙ্গে বসিলে হৃদয়ের অসাধু ভাব সকল লজ্জা পায় ও সাধু ভাব সকল

জাগিয়া উঠে"। প্রকৃত সাধুর নিকটে বসিয়া উঠিয়া আসিবার সময় অনুভব করিতে হয়, যেরূপ মানুষটি গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষ হইয়া ফিরিতেছি! দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের এরূপ সাধুতা ছিল যে, তাঁহার সহবাসে একদিন যাপন করিয়া আসিলে দশদিন হৃদয় মনের উন্নত অবস্থা থাকিত। এটি স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নৈহাটীর সন্নিহিত কাঁঠালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী-কালেজে পাঠ করেন। সেখানে পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাদুর্ভাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যজগতে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। গুপ্ত কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষয় কুমার দত্তের উৎসাহদাতদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগতে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে "প্রভাকরে" লিখিয়া কাব্যরচনার অভ্যাস আরম্ভ করেন। তখন প্রভাকরে উত্তর প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাক্‌যুদ্ধ "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে প্রথিত হইয়াছে। এরূপ শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে "ললিতা-মানস" নামে একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কালেজে গমন করেন, এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বি. এ. উপাধি সর্ব্বপ্রথমে প্রাপ্ত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত "দুর্গেশ-নন্দিনী" নামক উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ব্বে "বিজয় বসন্ত" "কামিনী কুমার" প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য-পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত "হংসরূপী রাজপুত্র", "চক্‌মকির বাক্স" প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প এবং "আরব্য উপন্যাস" প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। "আলালের ঘরের দুলাল" তাহার

মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

অল্পদিন পরে "কপালকুণ্ডলা" দেখা দিল। যে তুলিকা দুর্গেশ-নন্দিনীর নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুণ্ডলার গাম্ভীর্য্য-রস-পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিল! লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকদিগের শীর্ষ স্থানে স্থাপন করিল।

বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপরদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম "শব-পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা "শব" বলে তাহারা "দাহ" বলে, যাহারা "মড়া" বলে তাহারা তৎসঙ্গে "পোড়া" বলে, কেহই "শবপোড়া" বা "মড়াদাহ" বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে "শব পোড়া মড়াদাহের দল" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে "ভট্টাচার্য্যের চানা" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি যেন চিত্তাকর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লোক চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন তিনি কমোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য নীতি এরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু

দুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং ক্রমে তিরোভাব হইল।

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল। তৎপরে তিনি যে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাব ভাষা ও চিত্রণশক্তির সেই পূর্ব্বকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাঁহার দৃষ্টি ও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল।

শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্মতত্ত্বেব ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনাব প্রকাশিত "সাম্য" নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাব শেষ প্রচারিত এই নবধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্য এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আদর্শ পুরুষ। এই নবভাব ব্যক্ত করিবাব জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত ও ধর্ম-তত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

এদিকে তিনি গবর্ণমেণ্টেব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধ্যে সর্ব-প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রসাদের চিহ্ন স্বরূপ "রায় বাহাদুব" ও "সি. আই. ই." উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সবকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না, কিন্তু প্রতিভাব জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ঘবে পরে এইরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৪ সালেব ৮ই এপ্রেল দিবসে ভবধাম পরিত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

এইকালের মধ্যে উপন্যাস ও নাটক বচনা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পবিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন কবিয়া আর এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে "সোমপ্রকাশের" অভ্যুদয়।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকনাথের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল বৈশাখ মাস, ১৮২০ সাল। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম

উল্লেখ যোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধেই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন।

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথানুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন পাঠ করিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারম্ভে তাঁহার পিতা তাঁহাকে টোল চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়া সংস্কৃত কালেজে যাপন করেন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনের উন্নতি হইয়া ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কর্ম হইতে অবসৃত হন। ইহার পর তিনি ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। দারুণ বহুমূত্র রোগে ধরে। শ্রম করা তাঁহার অভ্যাস ছিল, নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, বসিয়া থাকাকে ঘৃণা করিতেন, সুতরাং ১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় মধ্য প্রদেশের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন। সেই খানেই ঐ সালের ২২ আগষ্ট তাঁহার দেহান্ত হইল।

সোমপ্রকাশই ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি, সোমপ্রকাশই ইঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে; সুতরাং সোমপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতেছি।

১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বীয় পুত্র দ্বারকনাথকে সহায় করিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং অল্প কালের মধ্যেই গতায়ু হন। ঐ যন্ত্র হইতে দ্বারকনাথের লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ হয় প্রথম। যাহা হউক এই দুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা তদানীন্তন বঙ্গীয় পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, এবং দ্বারকানাথের নাম বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে পরিচিত হয়। তৎপরে তাঁহার রচিত বালক-পাঠ্য "নীতিসার," প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের প্রভাব সে সমুদয়কে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদা প্রসাদ নামে তাঁহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাজ যোগান তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল দ্বারকনাথ সম্পাদকতা ভার ও তাঁহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন। কার্য্যকালে সারদা প্রসাদ আসিলেন না, অপরাপর লেখকগণও অদর্শন হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়া গেল। তিনি অধ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসরকাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে, অধ্যাপকতা কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য রাশীকৃত দেশী ও বিলাতী সংবাদ-পত্র, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইত তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন, রাত্রি ৪টার সময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না।

দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি, তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন দশ টাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।

সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি

১৮৬০ হইতে ১৮৭২ পর্যন্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসীগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদা পদার্পণ করিতেন, এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।

পরে ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে মাতলার রেলওয়ে খোলে। মাতাল বা পোর্ট ক্যানিং একটা প্রধান বন্দর হইবে গবর্ণমেণ্টের মনে এই আশা ছিল। গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়া বড় বড় জাহাজ কলিকাতাতে আনা দুঃসাধ্য হওয়াতে, মাতলাতে একটা বন্দর করিবার কথা চলিতেছিল এবং পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানী করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল। শেষে মাতলাকে অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করা হইল। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে খোলাই সার হইল।

মাতলা রেলওয়ে খুলিলেই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাঁহার বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে লইয়া যান এবং সেখান হইতে উহা প্রকাশ করিতে থাকেন। সোমপ্রকাশ সে বিভাগের একটা প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সাহায্যে অনেক সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে, অনেক অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, দেশে গিয়াই বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ বাসগ্রামের নানাপ্রকার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে একটি উচ্চশ্রেণী ইংরাজী স্কুল স্থাপন। ঐ স্কুলটি তিনি নিজের ব্যয়ে ও নিজের চেষ্টাতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক বৎসরে তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহাকে কতই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ হইতে বেতনটি পাইয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া সে বেতনের অধিকাংশ তথাকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দিয়া সামান্য অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

পাপের প্রতি তাঁহার এমন ঘৃণা ছিল যে, গ্রামের পাপাচারী লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁপিত। একবার একজন দুশ্চরিত্র পুরুষ একটি গোপজাতীয়া বিধবাকে বিপথে লইয়া গেল, এবং কিছুদিন পরে তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতে তাড়াইয়া দিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে সেই রমণীর দ্বারা আদালতে নালিস উপস্থিত করাইয়া সেই দুশ্চরিত্র পুরুষের নিকট হইতে ঐ নারীর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া প্রতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার

প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করেন। একদিন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ লিখিতেছিলেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, ঐ ধনী লোকটি সদলে সেই বিধবার বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে যাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়া স্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে সেই ধনীর গ্রীবা ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম বশতঃ তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে গ্রামে তিনি দুর্ব্বলের রক্ষক ও সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

বার্দ্ধক্যে একটি বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের শাসন ও ধর্ম্মের উপদেশ রহিত হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেন। তাঁহার একটি পুত্র এই সময়ে, জপ, তপ, পূজা প্রভৃতিতে কিছু অধিক মাত্রায় মাতিয়া গেল। এমন কি সেজন্য তাঁর জ্ঞান চর্চা, সংসারের কাজ-কর্ম্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন—'ও শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ত, ও যাহা আত্মার কল্যাণকর ভাবিয়াছে তাহা করুক, দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্যদিকে মতি না দিয়ে ধর্মসাধনে মাতিয়া আছে তাহ, ভাল।' সাধারণ মানুষের ধর্ম্মোপদেশের সুবিধার জন্য তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে কাশীতে গিয়া বাস করেন। তীর্থস্থানের দুরবস্থা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। কাশীতে গিয়া কাশীবাসী অনেকের বিশেষতঃ পাণ্ডাগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তিনি হৃদয়ের সেই ভাব ব্যক্ত করিয়া "বিশ্বেশ্বর-বিলাপ" নামে একখানি কাব্যপুস্তক রচনা করেন। তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য করিতে পারিতেন না।

ইহার উপরে ভার্নেকিউলার প্রেস আক্ট (Vernacular Press Act) নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা যখন ইংরাজী কাগজে পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন; তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। এই সময়ে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে নিজ ভবনে ডাকাইয়া, সোমপ্রকাশ তুলিয়া না দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন পরে ঐ গর্হিত আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হইল বটে

কিন্তু পূর্ব্বপ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার পরে তিনি "কল্পদ্রুম" নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অসুস্থতা বশতঃ অধিক কাল রহিল না। চরমে তিনি পীড়িত হইয়া রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে গতাসু হন।

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অল্পদিনের জন্য, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুরুভক্তি ও সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে, সেই অল্পদিনের সম্বন্ধ তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। চিরদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম স্মৃতিতে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্ব সম্পর্কীয় লোকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রচুর পরিমাণে ছিল। সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে দেখিবামাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র বলিয়া প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে লইয়াছিলেন।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

বঙ্গদেশকে যত লোক লোকচক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিমল সত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙ্গালীই দেখাইতে পারিয়াছেন, এরূপ জ্ঞানানুরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া এ জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার নাম নব্যবঙ্গের শিক্ষাগুরুদিগের মধ্যে গণনীয়, সুতরাং আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

কলিকাতার অদূরবর্ত্তী হাবড়া বিভাগের পাইকপাড়া নামক গ্রামে, ১৮৩৩ সালের ২রা নবেম্বর দিবসে মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটি পুত্র কোলে লইয়া ইঁহাকে কলিকাতা নেবুতলাতে ইঁহার মাতামহালয়ে আগমন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই ৩৩ বৎসর বয়সে পাইকপাড়া গ্রামে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন ইঁহার মাতুলদ্বয়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের উপরে ইঁহার রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার পড়ে। এই পারিবারিক দুর্ঘটনার চারি বৎসর পরেই তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তখন পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি উক্ত মাতুলদ্বয়ের স্নেহ যত্নে প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

তাঁহার মাতুলেরা প্রথমে বাঙ্গালা শিখিবার জন্য তাঁহাকে গুরুমহাশয়ের

পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখাইবার জন্য ঠাকুর দাস দে নামক একজন ভদ্রলোককে নিযুক্ত করেন। উত্তরকালে এই ঠাকুর দাস দে যতদিন জীবিত ছিলেন ডাক্তার সরকার তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন, এবং নিজ কার্য্যের সহায়রূপে রাখিয়াছেন।

সরকার মহাশয়ের মাতুলদিগের অবস্থা ভাল ছিল না। ইঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল ট্রাভ্‌লিং প্রিণ্টারের কাজ করিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল এরূপ মনে হয় না।

ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করার পর, তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল তাঁহাকে ফ্রী বালকরূপে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন, তাহার দেড় বৎসর পরে ১৮৪২ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পর্য্যন্ত হেয়ারের স্কুলে ছিলেন। ঐ সালে তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু কালেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত পাঠ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইল, তিনি নানা জ্ঞানের বিষয়ে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। কালেজের পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থ সকলে তাঁর পরিতৃপ্তি হইত না। বিজ্ঞান পাঠের জন্য তাঁহার মন ব্যগ্র হইত। তখন হিন্দু কালেজে বিজ্ঞান পাঠনার রীতি ছিল না, তদনুরূপ আয়োজনও ছিল না। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইবার সংকল্প করিলেন; এবং তাঁহার হিন্দু কালেজের অধ্যাপকদিগের অনুমতে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন।

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পরিণীত হইলেন, এবং ১৮৬০ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার সরকার মেডিকেল কালেজে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৮৫৯/৬০ সালে এল. এম. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসকরূপে বাহির হন। মেডিকেল কালেজে অধ্যয়নকালে, তিনি তাঁহার অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সে সময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য যতগুলি পারিতোষিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অর্জ্জন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল, এবং তাঁহার বহুদর্শিতা ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরকালের মধ্যে সহরের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন।

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্ব্বোচ্চ এম. ডি. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার মান সম্ভ্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় এম ডি. বলিয়া তাঁহার নাম সকলের মুখে উঠিয়া গেল।

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে সহরে একটি

নূতন সভা স্থাপিত হয়। তাহা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশন নামক সভার বঙ্গীয় শাখা। কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণ মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাক্তার সরকার একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তন্নিযুক্ত সেক্রেটারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত সভার একজন সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হন।

যে কারণে ঐ সভার প্রতিষ্ঠাকার্যের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই,—ঐ দিনের বক্তৃতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর দোষ কীর্ত্তন করেন। সেই বাক্যগুলি সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ডাক্তার সরকারের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। তৎপরে উভয়ে সাক্ষাত হইবামাত্রই রাজাবাবু ঐ উক্তিগুলি অবলম্বন করিয়া ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই বিচার বহুদিন চলিতে থাকে। ক্রমে আর এক ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়। একজন বন্ধু (Morgan) মর্গান নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত Philosophy of Homeopathy নামক একখানি পুস্তকের সমালোচনা করিবার জন্য ডাক্তার সরকারকে অনুরোধ করেন। ঐ সমালোচনা 'Indian Field' নামক কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহির করিবার কথা থাকে। কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে গিয়া ডাক্তার সরকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনা মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যে, কার্য্যতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন না দেখিয়া মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল দেখিবার জন্য রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয়া গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থা ও চিকিৎসা বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিলেন। এই রোগীগুলির চিকিৎসা কার্য্য দেখিতে দেখিতে ডাক্তার সরকারের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। হানিম্যানের অবলম্বিত প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে তাঁহারা ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন।

অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জ্জন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি হৃদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ বা প্রচার করিতে

কুণ্ঠিত হইতেন না, অথবা সত্যাবলম্বন বিষয়ে ক্ষতি, লাভ বা লোকের অনুরাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তাঁহার সেই প্রকৃতি অনুসারে, যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসকবন্ধুগণের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার সরকার "চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দ্দিষ্টতা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সত্য-প্রিয়তা, নির্ভীক-চিত্ততা সমুদয় একাধারে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর সর্ব্বজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্ত্তন করিয়া হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংরাজ ডাক্তারগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়া লাল হইয়া গেলেন, ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, 'ডাক্তার সরকার! ডাক্তার সরকার! আর একটা কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির করে দেব।" পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ডাক্তার সরকার উক্ত সভার সহকারী সভাপতি থাকা দূরে থাক, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন না। ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ঐরূপ মতে সায় দিলেন। সভামধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় সভ্যগণের ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল।

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, "আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব তাতে আর কি? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই হবে।" ওদিকে সংবাদপত্রের স্তম্ভ সকল এই বার্ত্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার ররসন তাঁহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ এক বাক্যে তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্য মাটী হইয়া গেল। ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না। পর বৎসরেই তাঁহার Calcutta Journal of Medicine বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা দমে নাই; যাহাকে সত্য

বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—"I was sustained by my faith in the ultimate triumph of truth—অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি সবল ছিলাম।". তাঁহার ভূতপূর্ব প্রোফেসারদিগের অনেকে তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অবাচ্য কুবাচ্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কি ভাবে সমুদয় কটূক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঐ ১৮৬৭ সালে মার্চ্চ মাসে মুদ্রিত তাঁহার ঐ বক্তৃতার ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন ,—

Whatever may now have become the differences between my venerable preceptors of the Medical College and myself, I shall always look back with ecstacy and gratitude on those days when I used to be charmed by their eloquence, pregnant with the words of Science.

আবার ঐ ভূমিকার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন :—

Persecution has already commenced. Professional combination is strong against me, and is likely to be stronger , every one's arm seems to be raised against me ; but I cannot deprive myself of the satisfaction that mine has been, and shall be raised against none. It is probable "my bread will be affected," but I shall never forget the words of Jesus who certainly speaks as man never spake, that as beings, instinct with reason, and made in the image of our Creator, "we must not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God."

সকলে অনুভব করুন যখন তাঁহার বিরোধিগণ কোলাহল করিতেছিলেন এবং তাঁহার প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এই মহামান্য ব্যক্তি কোন জগতে বাস করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে আমি তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতার এক পরিচয় পাই, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত বলিয়া লিখিয়া রাখিতেছি।

আমি তখন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল. এ. পরীক্ষা দিয়া উঠিয়াছি। সে সময় আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেছিলাম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধুতা সূত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে

আনিয়া দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন তাহা নহে, ভ্রাতৃ-নির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই ভবনের স্থায়ী-চিকিৎসক ছিলেন। এল. এ. পরীক্ষা কালে গুরুতর শ্রম করাতে আমার একপ্রকার পীড়া জন্মে। বাসার লোকেরা আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন "আমাদের বাসাতে এই একটা বামুনের ছেলে আছে, এল. এ. পরীক্ষার জন্য গুরুতর শ্রম করে এর কি অসুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়াকরে এর চিকিৎসার ভার নিতে হবে।" ডাক্তার সরকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার ভার লইলেন। বলিলেন,—"তোমার পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখে আমার কাছে পাঠিও।" কিন্তু সে দিন আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার মনটা খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। আমরা যুবকদল তাঁহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু তাঁহার একটা স্বভাব এই ছিল যে, তিনি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধিৎসু হইতেন। সে দিন ডাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থা পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই কি ঔষধ দিলেন?" ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মেডিকেল কালেজে পড়েছেন?"

গিরিশবাবু—না।

ডাক্তার সরকার—তবে এমন আহাম্মুকি করেন কেন? আমি কি ঔষধ দিচ্ছি তাতে আপনার দরকার কি?

এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে, আমাদের সকলের প্রাণে বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণটি ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাঙ্গালাতে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহা তাঁহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্ব্বোক্ত কর্কশ ব্যবহারের জন্য তিরস্কারে পূর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না যে, নিজে ত গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে যাইতেছি, তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার! চিঠিখানি পাঠাইয়া চিন্তা হইল বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আসিবার কথা ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবনাথ ভট্টাচার্য্য তোমাদের বাড়ীতে কে?" তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন, "সেই যে মশাই পাগলা ছেলেটা।" শুনিলাম ডাক্তার সরকার গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ঈশ্বর করুন এমনি পাগলা ছেলে দেশে বেশী হয়। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়া

পরিচর্য্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্র না হইয়াও বন্ধুতা ও প্রীতিসূত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহায্য দানে মুক্ত-হস্ত ছিলেন।

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে লীলাবতী পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। অন্নপ্রাশনের সময় এই পুত্রের নাম চারুচন্দ্র রাখা হয়। সে সময়েও কৃষ্ণনগরের সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

সে সময়ে কিছুদিনের জন্য লাহিড়ী মহাশয় গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধনী পরিবার, মুখুয্যে বাবুদের বাড়ীতে নাবালক পুত্রগণের অভিভাবকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের খ্যাতি দেশমধ্যে এরূপ ব্যাপ্ত ছিল যে, অভিভাবক কাহাকে করা যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে গভর্ণমেণ্টের পরামর্শক্রমে তাঁহাকেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি তদুপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই আপনার স্মৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং গোবরডাঙ্গাতেও যে নিজের স্মৃতি রাখিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহার প্রমাণ স্বরূপ খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৃষ্ণনগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রামতনু লাহিড়ী, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃক গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাঁহার গোবরডাঙ্গায় অবস্থিতি কালে তিনি সর্ব্বদা খাঁটুরা-দত্তবাড়ী ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত সর্ব্ব-বিষয়ে যোগদান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। একজন বিজ্ঞ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোক, চিরপ্রচলিত জাতি, কুসংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া যুবক ব্রাহ্মের সহিত সকল বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহা পল্লীগ্রামের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। তাঁহার এরূপ কার্য্য দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইত ; কিন্তু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নিন্দা-সূচক কোন কথা কেহ ব্যক্ত করিত না। যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, তাঁহার আহ্বানে এমন ব্যক্তিও সে সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কারাপন্ন যে সকল হিন্দুদিগের ব্রাহ্মদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি সেই সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া উদার ভাবে মিশিয়া তাঁহাদিগের সদ্ভাব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থিতিতে এই প্রকারে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।"

১৮৬৯ সালে কলিকাতা সহরে লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, পরলোকগত দ্বারকানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, অন্নদায়িনীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন হয়। অগ্রেই বলিয়াছি দ্বারকানাথ লাহিড়ী উত্তরকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহার গৃহিণী বা কন্যাগণকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে

দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই কন্যা অন্নদায়িনী ও রাধারাণী কলিকাতাতে আনীত হন; এবং লাহিড়ী মহাশয়ের অভিভাবকতার অধীনে রক্ষিতা হন। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় কন্যাকর্ত্তা হইয়া এই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কলিকাতা নিবাসী সুপরিচিত ব্রাহ্ম হরগোপাল সরকারের সহিত অন্নদায়িনীর বিবাহ হয়। এই সময় হইতে ব্রাহ্মদিগের সহিত ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬৯ সাল হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতাতে আসিতেন; এবং প্রায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগের গৃহে বাস করিতেন। সেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত তাঁহার আলাপ ও আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময়ে আমিও তাঁহার সহিত পরিচিত হই। আমার বেশ স্মরণ আছে, যখন তিনি নব ব্রাহ্মদলকে দেখিতেন, তখন আনন্দিত হইয়া সর্ব্বদা বলিতেন, "হায়! রসিককৃষ্ণ ও রামগোপাল যদি এখন থাকিতেন, তাহা হইলে একবার এই যুবকদিগকে লইয়া দেখাইয়া বলিতাম, 'দেখ তোমরা দেশে যেরূপ অগ্রসর দল দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেরূপ দল দেখা দিয়াছে।'"

এই সময়ের কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে আছে। প্রথম, অন্নদায়িনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র যখন বাহির হয়, তখন তিনি আমাদিগকে তাঁহার বন্ধুবান্ধবের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিলেন এবং আমরা তাঁহাদের অনেকের নাম জানিতাম, সুতরাং আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করিলাম; পাঠ করিয়া তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ করিয়া দিলেন। কিন্তু কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ পদস্থ লোকের নাম আমাদের কৃত তালিকা হইতে কাটিয়া দিলেন। আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলাম। কারণ উক্ত ভদ্রলোকটির সহিত যে তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা আছে, তাহা আমরা জানিতাম। এমন কি প্রায় প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন; এবং সেখানে চা প্রভৃতি খাইতেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের তালিকা হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেওয়াতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমাদিগকে কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। এই মাত্র বলিলেন—"তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই, আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ করবো না।" পরে পরম্পরাতে জানিতে পারিলাম, সেই ভদ্রলোকটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা-বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া ব্রহ্মোপাসনা-কালে পার্শ্বের ঘরে বসিয়া তামাক খাইয়াছিলেন এবং হাসিয়াছিলেন বলিয়া বর্জ্জিত হইলেন। লাহিড়ী মহাশয় আমাদিগকে বর্জ্জনের কারণ কোনও ক্রমেই বলিলেন না; কিন্তু শুনিলাম সেই ভদ্রলোককে তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি এমনি হাল্‌কা লোক যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বন্ধুভাবে

ডাকিয়াছে এবং তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র কাজ যাহাকে মনে করে তাহা করিতেছে, তুমি সেই সময়টুকুর জন্তও গাম্ভীর্য্য রাখিতে পারিলে না! আমার ভাইঝীর বিবাহে ঈশ্বরের নাম হইবে আমি তোমাকে কিরূপে ডাকি?"

বাস্তবিক "ঈশ্বরের নাম বৃথা লইও না"—এই উপদেশ তিনি এমনি পালন করিতেন যে, যেমন তেমন অবস্থাতে ঈশ্বরের নাম শুনিতে চাহিতেন না। একবার একজন বন্ধু একজন সুগায়ককে তাঁহার সহিত পরিচিত করিবার জন্ত আনিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চা খাইতেছিলেন। নবাগত ব্যক্তিটি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংগীত করিতে পারেন শুনিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন, "আমাকে একটি গান শোনাতে হবে।" যেই এই কথা বলা, অমনি গায়ক মহাশয় গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"মহাশয়! একটু বিলম্ব করুন, আমি যে ভগবানের নাম শুনিবার অবস্থাতে নাই।" এই বলিয়া চা'র সরঞ্জামগুলি সরাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। তৎপরে চাদরখানি পাড়িয়া গলে দিয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন,—"এখন গান করুন"। ঈশ্বরের নামে সে ভক্তি, সে হৃদয়ের আগ্রহ কি আর দেখিব! একদিনের কথা আর ভুলিব না। সেদিন প্রত্যূষে তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সকলকে লইয়া একটু ভগবানের নাম করিতে হইবে। তাহাই করা গেল। আমরা চক্ষু খুলিয়া দেখি, তিনি কখন উঠিয়া দাড়াইয়াছেন; গলবস্ত্র হইয়া চাদরখানি দুই হস্তের মধ্যে ধরিয়া আছেন, আর খেজুর গাছের নলি দিয়া যেরূপ রস পড়ে, তেমনি সেই শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু দিয়া টপ টপ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সমুদয় মুখখানি প্রেমের আভাতে উজ্জ্বল। আমার যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাদ ভেদ করিয়া উপরকার কোনও লোক হইতে কোনও উন্নত জগতের একটি জীবকে নামাইয়া দিয়াছে। আমি অনিমেষ নয়নে সেই প্রেমোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যেদিন সে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা চিরদিন স্মৃতিতে থাকিবে। এমন মানুষ কি ঈশ্বরোপাসনার সময় লঘুতা দেখিলে মার্জ্জনা করিতে পারেন?

বন্ধুকে বর্জ্জনের কারণ যে আমাদের নিকট কোনও প্রকারেই বলিলেন না, তাহার মধ্যেও একটু কথা আছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার যাহা কিছু বলিবার থাকিত, তাহা সহজে সে ব্যক্তির অসাক্ষাতে অপরকে বলিতেন না। তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে বলিতেন, তাহাতে ফলাফল কিছুই গণনা করিতেন না। এজন্ত তাঁহার পরিচিত আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্যায় করিলে তাঁহাকে অতিশয় ডরাইতেন। কারণ, তিনি বলিবার সময় কিছুই মনের ভাব গোপন করিতেন না।

আর একদিনের কথা স্মরণ আছে। একদিন প্রাতে লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘরে ফিরিবার সময়ে পথে তিনি বলিলেন—"একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকার দিনটা সার্থক করবে?" আমি বলিলাম—"এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে?" তখন তিনি আমাকে একজন খ্রীষ্টীয় পাদরীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া যে ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহার প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ফলতঃ লাহিড়ী মহাশয় যেখানেই অকৃত্রিম সাধুতা দেখিতেন সেইখানেই অকপটে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতেন। তাঁহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান বিচার ছিল না। অনেকদিন এইরূপ হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণনগর হইতে সহরে আসিয়াছেন, শুনিয়া আমরা তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলাম, গিয়া দেখি তিনি বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ী দুই দিন রহিয়াছেন, অথবা কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে আছেন, অথবা কোনও খ্রীষ্টীয় বন্ধুর অতিথি হইয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বন্ধু ছিল; সকল শ্রেণীর লোককেই তিনি ভালবাসিতেন। এই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ, যাহা দেখিয়া আমরা বড়ই মুগ্ধ হইতাম।

১২৭৭ বঙ্গাব্দ (১৮৭০) ৩রা আষাঢ় দিবসে কৃষ্ণনগরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র বিনয়কুমারের জন্ম হয়। তৎপূর্ব্বে ১৮৬৬ সালে আর একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়া অল্প বয়সেই ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে গতাসু হয়।

১৮৭২ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন লাহিড়ী মহাশয় স্ত্রী-স্বাধীনতাপক্ষীয়দিগের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি Sir. J. B. Phear ও তাঁহার গৃহিণীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। স্ত্রী-স্বাধীনতাদলের অগ্রণী হইয়া একবার তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে লইয়া টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন; এবং তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে বসাইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাচীন বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহাকে তামাসা করিয়া বলিলেন—"কি হে রামতনু! বুড়ো বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশলে নাকি?" লাহিড়ী মহাশয় টাউনহল হইতে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"প্যারীর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওরা হালকা লোক, আমি মেয়েদের ত্রিসীমায় আসতে দিলাম না।" ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্যগ্রসর হইয়াও আদব কায়দার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন।

তৎপরে স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয়গণ "হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়" নামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তিনি আপনার দ্বিতীয় কন্যা ইন্দুমতীকে সেই স্কুলে দিলেন। নারী জাতীর প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। নারীগণের

মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের যে পরিবারের অতিথিরূপে বাস করিতেন, সে পরিবারের মহিলাগণের আনন্দের সীমা থাকিত না। কারণ, তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রামের পর, দুপুর বেলা পরিবারস্থ নারীগণকে এক ঘরে একত্র করিতেন; নানা প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া মুখে মুখে তাঁহাদিগকে অনেক ভাল ভাল বিষয় শুনাইতেন। কখনও বা নারীগণের মধ্যে কাহাকেও কোনও একট বিষয় পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। একজন পড়িতেন আর সকলে শুনিতেন; তিনি মধ্যে মধ্যে পঠিত বিষয় অবলম্বন করিয়া মুখে মুখে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের গোচর করিতেন। এইরূপে তিনি দশদিন কোনও গৃহে থাকিলে সেখানকার হাওয়া আর এক প্রকার করিয়া তুলিতেন। কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মন এক উচ্চভূমিতে আরোহণ করিত।

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন "ভারতাশ্রম" নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় অপরাপর পরিবারগণের সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লাহিড়ী মহাশয় মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার যৌবন-সুহৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্র, সুতরাং তাঁহার প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ছিল। কেবল স্নেহ নহে, ঈশ্বর-ভক্ত মানুষ বলিয়া তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি কেশবাবু উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার কোনও একটি কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন, স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না; "ওঃ কেশব কি বললেন, ওঃ কেশব কি বললেন" বলিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। বলিতে কি তাঁহার নিজের ভক্তিভাব এতই অধিক ছিল যে, অতিরিক্ত মনের আবেগ হইত বলিয়া তিনি আমাদের উপাসনাতে অনেক সময় বসিতেই পারিতেন না।

এই ত কেশব বাবুর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয়দিগের হইয়া তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইতে ক্রটী করিতেন না। এই সকল কথা শুনিতে এক এক সময় এত রুক্ষ বোধ হইত যে, অপরের অসহ্য হইয়া উঠিত। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। আশ্রমবাস-কালের একদিনের ঘটনা মনে আছে। একদিন রামতনু বাবু তাঁহার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, কাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগের অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পীড়িত যৌবন-সুহৃদের নাম করিবামাত্র একজন মহিলা বলিয়া উঠিলেন—

"ওমা ওমা, এমন মানুষকেও আপনি দেখতে যান? সে যে লক্ষ্মীছাড়া লোক।" শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। কেন যে ঐ মহিলা ওরূপ বলিলেন তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার সেই যৌবন-সুহৃদটি যৌবনকালে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেই সময় তিনি যেখানেই যাইতেন সেইখানেই তাঁহার স্খলিত-চরিত্র লোক বলিয়া অখ্যাতি হইত। ঐ মহিলাটি সেরূপ কোনও কোনও স্থানে থাকিয়া ঐরূপ অখ্যাতি অনেকদিন শুনিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর তাঁহার স্বভাব-চরিত্র শুধরাইয়া গিয়াছে; তিনি ধর্ম্মচিন্তাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন: তখন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত ও মৃত্যুশয্যাতে শয়ান; এ সকল সংবাদ ঐ মহিলা জানিতেন না। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—"ঠাকরুন! আপনি কেন তাকে লক্ষ্মীছাড়া লোক বললেন, তা আমি জানি। কিন্তু তার সে সব অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে; সে এখন বড় ভাল লোক হয়েছে; কেবল ধর্ম্মের কথা নিয়েই আছে, বিশেষ সে মৃত্যুশয্যাতে পড়েছে, আমার কি যাওয়া উচিত নয়?" এই বলিয়া ঐ ব্যক্তির সহৃদয়তা, ধর্ম্মভীরুতা কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন-স্বরূপ এক একটি গল্প করিতে লাগিলেন। একটি গল্প শেষ হয়, আর ঐ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলেন—"ঠাকরুন ঠিক করে বলুন এতটা আপনি করতে পারতেন কি না?" অমনি ঐ মহিলাটি বিনীতবদনে বলেন—"না এতটা বোধ হয় আমা দ্বারা হতো না।" এইরূপে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া শেষে বলিলেন—"দেখুন ঠাকরুন! আমরা মানুষের মন্দটাই দেখি, ভালটা দেখি না। মন্দ মানুষেরও ভালটা দেখতে হয়। ঈশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন, তাহলে কি আমরা পার পাই?"

এই সময় লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার সুখেই যাইতেছিল। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে পাইয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের অনেক কার্য্যে যোগ দিতেছিলেন। কেবল তাহাও নয়; স্বর্গীয় খ্যাতনামা ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের ভ্রাতা বারাসাতবাসী সুপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেন। তিনি শেষ দশায় এক প্রকার চলৎশক্তি-রহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক সাধুতা ও বিদ্যাবত্তার গুণে তাঁহার ভবন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একটা প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্যামাচরণ দে, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নবরত্নের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭০ সাল হইতে মধ্যে মধ্যে সহরে আসিয়া সেই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেন; এবং সকলের পূজা লাভ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্নের এক প্রধান রত্ন ছিলেন। তিনি বহুকাল বারাসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপরে কলিকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া

শেষে প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রোফেসারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে কালেজের ছেলেদের জন্য বর্ত্তমান ইডেন হষ্টেলের অনুরূপ একটি আবাসবাটি স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূপে তিনি সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা ছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপান নিবারণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এতদর্থে ১৮৬৩ সালে একটি সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে ইংরাজীতে Well-Wisher ও বাঙ্গালাতে "হিতসাধক" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির হইত; তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে প্রতিবাদিত হইত। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই কার্য্যের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। বলিতে কি তিনিই আমাদিগকে সুরাপানের বিরোধী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেশের হিতচিন্তা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহাকে লাহিড়ী মহাশয় বড় ভালবাসিতেন। ইঁহাদের সহবাসে তিনি বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সুখ তাঁহার অধিক দিন থাকিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমার এই সময়ে সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা মেডিকেল কালেজে পড়িতেছিলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন; হঠাৎ সে আশাতে নিরাশ হইতে হইল।

এই সময়ে নবকুমারের যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি স্বীয় পাঠ্য বিষয়ে কৃতী হইবার জন্য গুরুতর শ্রম করিতেন। সে শ্রম সহ্য হইল না। পূর্ব্বোক্ত উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইল। লাহিড়ী মহাশয় সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়া আসিলেন; কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া নবকুমারের বাসাতে গেলেন; এবং মেডিকেল কালেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল ডাক্তার নর্ম্মান চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১৮৫২।৫৩ সালে বালীতে অবস্থান কালে ডাক্তার চিভার্সের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। সেই আত্মীয়তাসূত্রে ডাক্তার চিভার্স এই সময়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবকুমারকে কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসাতে লওয়া হইল। সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা, শুশ্রূষা, যত্নের দ্বারা যাহা হইতে পারে সকলই হইতে লাগিল।

কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম দেখা গেল না। অবশেষে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। নবকুমার কৃষ্ণনগরে গেলেন, সেই সঙ্গে ইন্দুমতীকেও তাঁহার শুশ্রূষার জন্য যাইতে হইল। তিনি হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয়ে অতি উৎসাহের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন এবং সর্ব্বজনের প্রিয়

হইয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের দারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। রোগীর সেবা করা ইন্দুমতীর যেন জন্মগত সিদ্ধবিদ্যা ছিল। যে ইন্দু অপরে পীড়িত হইলে দাসীর মত তাহার সেবা করিতেন, সেই ইন্দু কি আপনার জ্যেষ্ঠের পীড়ার কথা শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? মনে হইল বৃদ্ধা জননীর প্রতি সংসারের সকল কাজের ভার, দাদার সেবা করে কে? তাই পড়াশুনা ছাড়িয়া, ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার বন্ধ করিয়া দুরন্ত পরিশ্রম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কৃষ্ণনগরে গেলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিয়া বিশেষ উপকার না হওয়াতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নবকুমারকে ভাগলপুরে লইয়া যাওয়া হইল। ইন্দুমতী শুশ্রূষার ভার লইয়া সঙ্গে গেলেন।

নবকুমার পীড়িত হওয়া অবধি পরিবার মধ্যে রোগের পর রোগ দেখা দিয়া সমগ্র পরিবারটিকে যেন উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল! লাহিড়ী মহাশয়ের নিজের শরীর ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বদা অসুস্থ থাকিত। এক দিন অন্তর তাঁহার জ্বরভাব হইত। সেই খারাপ দিনে তিনি নড়িতে চাহিতেন না: শয্যাস্থ থাকিতেন। তখন যে ভবনে থাকিতেন সেখানকার মহিলাদিগের কিছু কাজ বাড়িত। দিনের বেলা অধিকাংশ সময়ে একজন না একজনকে নিকটে বসিয়া কিছু না কিছু ভাল বিষয় পড়িয়া শুনাইতে হইত। কলিকাতাতে যখন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা, ইন্দুমতী সঙ্গে থাকিলে ইন্দুমতী, ঐ কাজ করিতেন। এক দিনের ঘটনা বলিতেছি। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি শয়ান আছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্নদায়িনীকে "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেবারকার "ধর্ম্মতত্ত্বে" কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গত-সভার আলোচনার বিবরণ ছিল। সেবারে সঙ্গতে রিপুদমন বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার মধ্যে কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে, "রিপুগুলোর মধ্যে যেন পারিবারিক সম্বন্ধ আছে। একটার ঘাড় ভাঙ্গিলে অন্যগুলোর ভয় হয় বুঝি বা আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে; তারা ভয়ে কম-জোর হইয়া পড়ে।" কেশববাবুর এই উক্তিগুলি ধর্ম্মতত্ত্বে সঙ্গতের আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে তাঁর নাম ছিল না। অন্নদায়িনী যেই কথাগুলি পড়িয়াছেন, অমনি লাহিড়ী মহাশয় "ও কি কথা, এমন কথা কে বললে?" বলিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। জ্বরভাব আর মনে থাকিল না! খারাপ দিন কোথায় পলায়ন করিল! সেই ভাবে একেবারে বিভোর! বাড়ীর মহিলাদিগকে ডাকাইয়া সকলকে সেই কথাগুলি শুনাইলেন। বলিলেন, "ঠিক কথা! ঠিক কথা! একটা প্রবৃত্তিকে যে দমন করে তার পক্ষে অন্যগুলো দমন করা সহজ হয়। এমন কথা কে বললে, এ কেশব না হয়ে যায় না।" মহিলারা ত আর সঙ্গতে যান না, তাঁরা এ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না। তখন আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগের সহিত এক বাড়ীতে

থাকিতাম। যেই আমি বৈকালে বাড়ীতে পা দিয়াছি, অমনি বলিলেন, "ডাক ডাক শিবনাথকে ডাক, শুনি এমন কথা কে বলেছে।" আমার বস্ত্র পরিবর্ত্তনের বিলম্ব সহিল না। আমি গিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন—"যা পড়ে শুনাও ত!" উক্তিগুলি পুনরায় পঠিত হইলে আমি বলিলাম—"ও কথা কেশববাবু বলেছেন।" অমনি আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না,—"দেখেছ, আমি বলেছি, কেশব না হয়ে যায় না; সে বিনা এমন কথা কে বলতে পারে।" সে দিন জ্বরের কথা ভুলিয়া গেলেন; আর শয়ন করিলেন না; আমাদের সঙ্গে রিপুদমন ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিল।

সে সময়ে যে কেবল লাহিড়ী মহাশয়েরই শরীর অসুস্থ থাকিত তাহা নহে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার, তাঁহার চতুর্থ পুত্র বিনয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা লীলাবতীর একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র, ইহাদের কাহারও না কাহারও অসুস্থতার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ততা থাকিতে হইত।

প্রথমে ভাগলপুরে গিয়া নবকুমারের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম দেখা গিয়াছিল। এমন কি তিনি অল্পে অল্পে চিকিৎসা ব্যবসাও আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শরৎকুমারের শরীর অসুস্থ হওয়াতে তাহাকেও আপনার কাছে লইয়া দুই ভাই বোনে তাহার শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে পিতা মাতা অবশিষ্ট পরিবার লইয়া কৃষ্ণনগরে ছিলেন। দিন এক প্রকার সুখেই চলিতেছিল। এমন সময়ে ঐ সালের নবেম্বর মাসে দেশে এক নিদারুণ সংবাদ আসিল। লাহিড়ী মহাশয় তারে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জামাতা তারিণীচরণ ভাদুড়ী হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাশীপুর নামক স্থানে গভর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্সেরির ডাক্তার ছিলেন। কেন যে হঠাৎ আত্মহত্যা করিলেন তাহার কারণ জানিতে পারা গেল না। এই ঘটনাতে লাহিড়ী মহাশয়ের ছিন্ন ভিন্ন পরিবার যেন আরও ভগ্ন হইয়া গেল। লীলাবতী পুত্রটি লইয়া এখন হইতে সম্পূর্ণরূপে পিতার উপরেই পড়িলেন। সেই শোকার্ত্তা কন্যার মুখ দর্শন করিয়া তাঁহার কোমল ও প্রেমিক হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এদিকে এই দারুণ সংবাদ ভাগলপুরে পৌছিলে, নবকুমার ও ইন্দুমতী বৃদ্ধ পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা আসিয়া সকলকে ভাগলপুরে লইয়া গেলেন। কিন্তু ভাঙ্গা কাঁচ যেমন আর জোড়া লাগে না, তেমনি যেন ইঁহাদের ভগ্নপারিবারিক সুখ আর জোড়া লাগিল না। কিছু দিন পরে পরিবার পরিজন বোধ হয় আবার কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন। নবকুমার ও ইন্দুমতী ভাগলপুরেই রহিলেন। ইহার পরেই নবকুমারের পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার যক্ষ্মা ভীষণ আকার ধারণ করিল। এই সময়ে ইন্দুমতী কিরূপে ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী

ভাই-বোনের দৃষ্টান্তের জন্য লিখিয়া রাখিবার মত কথা। পরসেবা যে ইন্দুমতীর স্বাভাবিক ব্রত ছিল, পরের সেবা করিতে পারিলে যার আনন্দের সীমা থাকিত না, তার পক্ষে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরের শুশ্রূষা যে কি হৃদয়ানন্দকর কার্য্য ছিল, তাহা আর কি বলিব। ইন্দুমতী একেবারে দেহ মন প্রাণ সেই কার্য্যে নিক্ষেপ করিলেন। আমি ভাগলপুরের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক দিন ইন্দুমতীর স্নানার্দ্র বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গিয়াছে। নিজে রন্ধনাদি করিয়া ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া, বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইয়া, স্নান করিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে ভ্রাতার কাশীর শব্দ ও কাতরধ্বনি শুনিলেন; চাকর ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, বাবু ডাকিতেছেন।" অমনি দৌড়িয়া গেলেন, ঔষধ খাওয়াইতে ও বাতাস করিতে করিতে অঙ্গের বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গেল। অনেক দিন এমন হইয়াছে যে, রন্ধন করিয়া বেলা দশটার সময় ভ্রাতাকে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়াছেন, কোনও একটা জিনিস বা কাজ মনের মত না হওয়াতে নবকুমার অন্ন ব্যঞ্জন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে ভগিনীর বিরক্তি বা দ্বিরুক্তি নাই, কেবল সেই বিশাল নয়নদ্বয় দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। বলিতে লাগিলেন—"দাদা! তোমার যে খেতে দেরী হয়ে অসুখ বাড়বে।" আবার নূতন অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজের খাওয়া দাওয়া মনে রহিল না। অনেক রাত্রি অনিদ্রা অবস্থায় ইন্দুমতীর চক্ষের উপর দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল। রাত্রে অনিদ্রা দিনে দুরন্ত শ্রম! আমরা সকলেই ইন্দুমতীকে ভালবাসিতাম, যখন তাঁহার এই তপস্যার কথা শুনিলাম, তখন তাঁহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল, কিন্তু এত শ্রম সহিবে না ভাবিয়া সকলেই ভীত হইতে লাগিলাম।

যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। এরূপে ভ্রাতার সেবা আর অধিক দিন চলিল না। অচিরকালের মধ্যে ইন্দুমতী দারুণ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন ধর ধর, ঠেকা ঠেকা পড়িয়া গেল। পায়ে ও মস্তকে দুই স্থানে এক সঙ্গে কৃষ্ণসর্পে দংশন করিলে যেমন হয় লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারের দশা যেন তেমনি হইল। নবকুমারের পীড়া বরং রহিয়া বসিয়া বাড়িতেছিল; চোখে কানে দেখিবার শুনিবার অবসর দিতেছিল; কিন্তু ইন্দুমতীর যক্ষ্মা মণ্ডুকপ্লুতিতে বাড়িতে লাগিল। ১৮৭৭ সালের মধ্যভাগে পীড়া এতই বাড়িয়া উঠিল যে, ঐ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহাকে ভাগলপুর হইতে আরাতে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীলা ব্যতীত অপর সকলে আরাতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আরাতে গিয়া নবকুমার বা ইন্দুমতীর পীড়ার কোনও প্রকার উপশম না হউক, আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা মৃদুমতী, আড়াই বৎসরের বালিকা, সেখানে বিষম জ্বর-রোগে অকালে প্রাণত্যাগ

করিল। এদিকে একমাসের মধ্যেই ইন্দুমতীর জীবনের আশা চলিয়া গেল; চিকিৎসকগণ জবাব দিলেন। এই সঙ্কটাবস্থায় পরম বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে, ইন্দুমতীর অবসান কাল কৃষ্ণনগরে যাপন করিবার উদ্দেশে, লাহিড়ী মহাশয় পরিবার পরিজনকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন ইন্দুর এমন অবস্থা যে, তাঁহাকে হুগলীতে নামাইয়া নৌকাযোগে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইতে হইল।

কৃষ্ণনগরে পৌছিয়া ইন্দুমতী শেষ শয্যা, মৃত্যু-শয্যা পাতিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের পত্নীর কথা আর কি লিখিব। হে পাঠক! যদি মানুষের হৃদয় থাকে তবে একবার ধারণা করিবার চেষ্টা কর, সেই ভগ্নহৃদয়া মাতা কি ভাবে সংসারের কাজ ও পীড়িত সন্তানদের সেবা চালাইতে লাগিলেন। সাধে কি নারী জাতীকে এত শ্রদ্ধা করি, ইন্দুমতী মরিতে মরিতেও কেবল জ্যেষ্ঠ সহোদরের চিন্তাই করিতেন। পিতা বা মাতা নিকটে আসিয়া বসিলে, সুস্থির হইয়া বসিতে দিতেন না; বলিতেন, "তোমরা দাদাকে দেখ, তোমরা দাদাকে দেখ, আমার কাছে বস্‌বার দরকার নেই; আমার কাছে দিদিরা আছেন।" এইরূপ প্রায় প্রতিদিন তুলিয়া দিতেন। ওদিকে নবকুমার বুঝিলেন ভগিনীর আসন্নকাল উপস্থিত; এবং ইন্দু তাঁহার জন্যই মরিতেছে; সুতরাং তিনি নিজের অসুখ ভুলিয়া গিয়া ভগিনীর শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইলেন; বার বার উঠিয়া ভগিনীকে দেখা, সময়ে ঔষধ পড়িতেছে কিনা, যাহা আবশ্যক তাহা হইতেছে কি না, এই সকল সংবাদ লওয়া, নিরন্তর এই কাজ চলিল। ইন্দুর রোগের উপশম কিসে হয় সে বিষয়ে অবিশ্রান্ত মনোযোগ দিতে লাগিলেন। যেন তাঁহার শক্তি থাকিলে মৃত্যুর মুখ হইতে ভগিনীকে ছিঁড়িয়া আনেন। কিন্তু হায় কে কবে মৃত্যুর মুখ হইতে মানুষকে ছিঁড়িয়া আনিয়াছে! ইন্দুর জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ত্বরায় ক্ষীণ প্রভা ধারণ করিল! অবশেষে ১৮৭৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বিষম দিন উপস্থিত হইল। ঐ দিনে মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইন্দুমতী পিতাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিলেন, "দিদি! বাবাকে একবার ডাক।" তখনি রামতনু বাবুকে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন ইন্দু ছট ফট করিতেছেন, ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দু! কেন আমাকে ডেকেছ?" ইন্দুমতী চক্ষু খুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা! আজ আমার কাছে বসো, আজ আমাকে বড় অস্থির কর্‌চে।" লাহিড়ী মহাশয় নিকটে বসিয়া কন্যার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, "ইন্দু! আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আর কিছু করবার নেই, এখন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতনা হতে উদ্ধার করুন।" ইন্দু বক্ষঃস্থলে দুইহাত তুলিয়া বলিলেন—"ঈশ্বর আমাকে ত্বরায়

উদ্ধার কর।” তৎপরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অনুমতি চাহিলেন, “বাবা আমি যাই ?” লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন “যাও”; অমনি ইন্দুমতী বক্ষের উপরে দুই হাত বাঁধিয়া স্থির ভাব ধরিলেন; সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণবায়ু ক্ষীণ দেহযষ্টি ছাড়িয়া গেল।

এই পারিবারিক বিপদে মানুষ দেখিতে পাইল রামতনু লাহিড়ীর মধ্যে কি জিনিস ছিল। ওরূপ সোনার চাঁদ মেয়ে চক্ষের সমক্ষে মিলাইয়া গেল, তাহাতে একটি ওঃ আঃ করা বা শোকাশ্রু বর্ষণ করা কিছুই করিলেন না। প্রত্যুত যখন তাঁহার গৃহিণী “মারে ইন্দুরে !” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তখন দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার মুখ আবরণ করিলেন,—“কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে, অনেক যন্ত্রণা হইতে তিনি তাকে শান্তিধামে নিয়েছেন। এখন অধীর হ’ও না; আর একটি সন্তান এখনো শ্বসছে; তার প্রতি কর্ত্তব্য এখনও বাকি আছে, এখন অধীর হলে তার সেবার ব্যাঘাত হবে; সে যদি আর দু’মাস বাঁচতো আর দশদিন বাঁচবে না; চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই।”

বাস্তবিক! এই বিশ্বাসী সাধুপুরুষ শোক জয় করিয়াছিলেন। আমি একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, ইন্দুমতীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে ইন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপাসনা হইল। উপাসনার মধ্যে লাহিড়ীর মহাশয় হঠাৎ “ইন্দু” বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন; পরে দেখা গেল যে, বস্ত্রাঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। উপাসনা ভাঙ্গিলে উক্ত বন্ধুটিকে বলিলেন—“দেখ আমরা হাজার ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলি না কেন কাজে তাঁকে মঙ্গলময় বলিয়া ধরা কত কঠিন! আমি আজ ইন্দুর জন্য কেঁদে অবিশ্বাস প্রকাশ করিলাম; এটা কি সত্য নয়, আমার ইন্দু এখন তাঁর মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কাঁদি কেন ?” বলিয়া এই ক্ষণিক শোক প্রকাশের জন্য বহু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরেই ধীর স্থির, স্বকর্ত্তব্যসাধনে তৎপর।

এদিকে ইন্দুমতী চলিয়া গেলে নবকুমার প্রাণে এমনি আঘাত পাইলেন যে, তাঁর জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। সেই যে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাঁহাকে ভাল করিয়া হাসিতে দেখে নাই। ইন্দু তাঁহার জন্য কি করিয়াছে, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই আনুপূর্ব্বিক ভাবিতে লাগিলেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার মেজাজ খারাপ হইয়া ইন্দুকে কি ক্লেশ দিয়াছেন তাহা বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত তিনি বালিসে মুখ গুঁজিয়া আছেন, চক্ষের জলে বালিস ভিজিয়া যাইতেছে একবার তাঁহার শয্যার পার্শ্বে একখণ্ড কাগজ কুড়াইয়া পাওয়া গেল, তাহাতে দেখা গেল সেই রুগ্ন, দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হস্তে যেন কি লিখিতেছেন—অধিক লিখিতে পারেন নাই। O! darling Sister! বলিয়া আরম্ভ করিয়া সামান্য দুই এক ছত্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন

না। ভাঁটার জলের ন্যায় তাঁহারও জীবনের শক্তি তিল তিল করিয়া ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সহস্র চেষ্টা ও শুশ্রূষাতে কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে ১৮৭৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সেই দিন উপস্থিত হইল, যে দিন নবকুমারকেও হারাইতে হইল।

সে দিনকার অবস্থাও চিরস্মরণীয়। সে দিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা মানুষে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না। নবকুমারের প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তৎপার্শ্বে শোকার্ত্তা মাতা অচেতন হইয়া রহিয়াছে; একদিকে রামতনুবাবু পল্লীবাসী তাঁহার আত্মীয় সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের একটি পুত্রকে ধরিয়া বাহিরে প্রাঙ্গণস্থিত একটি বেঞ্চের উপরে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। সে যুবকটি নবকুমারকে এতই ভালবাসিত যে, সে শোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছে; কোনও ক্রমেই শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। রামতনু বাবু তাহাকে বলিতেছেন, "সে কি হে! তুমি শিক্ষিত লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমার জেঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত করবে, না তুমিই অধীর হয়ে গেলে?" এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া উপস্থিত। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা সপ্তাহে একদিন আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। ঐজন্য তাঁহাদের একটি সঙ্গত সভার মত ছিল। সেই দিন উক্ত সভার অধিবেশনের দিন। তদনুসারে তাঁহারা উপস্থিত। তাঁহারা জানিতেন না যে, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা না জানিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লাহিড়ী মহাশয় দ্রুতপদে গিয়া বলিলেন, "দেখ আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন হবে না; আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।" সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ ঐ ঘরে পড়ে আছে তোমরা যেও না দেখলে কষ্ট হবে।" শুনে ত সকলে অবাক। শোকের চিহ্নমাত্রও নাই।

বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধু পুরুষ শোকজয় করিয়াছিলেন। ইন্দুমতীর মৃত্যু হইলে আমি শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে একখানিপত্র লিখিয়াছিলাম। আমি ইন্দুমতীকে অতিশয় ভাল বাসিতাম। ইন্দু অনেক সময় কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন; এবং আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমার স্মরণ আছে লাহিড়ী মহাশয়কে পত্র লিখিবার সময়, আমার পত্রখানি নেত্রজলে অনেক স্থলে সিক্ত হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল, আমাকে সেই সেই শব্দ আবার পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট হইতে যখন উত্তর আসিল, তখন আমি অবাক। দুই ছত্রে পত্র শেষ হইয়াছে এবং সে দুই ছত্র এই মর্ম্মে—"প্রিয় শিবনাথ! আমাদের শোকে যে তুমি

এতদূর শোকার্ত্ত হইয়াছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি; কিন্তু এস আমরা সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমার কন্যাকে রোগযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

একজন বন্ধু ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছেন যে, আরা হইতে ইন্দুমতীকে কৃষ্ণনগরে লওয়ার পর তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের পত্রে সর্ব্বদা ইন্দুর সংবাদ পাইতেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই মর্ম্মে লিখিলেন—"তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, ইন্দুমতীর রোগ যন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ সুখে আছে।" পত্র পড়িয়া তাঁহার মনে হইল, সৌভাগ্যক্রমে কোনও অতর্কিত উপায়ে বোধ হয়, ইন্দুমতীর রোগের উপশম হইয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, ঐ সংবাদ ইন্দুর মৃত্যু-সংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুষকে বিগত-শোক হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; এই ত সেই উপদেশ জীবনে ফলিত দেখিয়াছি। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যিনি মনের আবেগ বশতঃ ব্রহ্মোপাসনাস্থলে ভাল করিয়া বসিতে পারিতেন না, যিনি কাহারও সামান্য ক্লেশ দেখিলে এত উত্তেজিত হইতেন, নিজের শোকের সময় তাঁহার এই ধীরতা! প্রকৃত বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষে অসম্ভব সম্ভব হয়।

বলিতে কি, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেহ শোকে অতিরিক্ত কাতর হইয়া কাঁদিলে তাঁহার সহ্য হইত না। সে ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের কথা শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এ বিষয়ে একদিনকার একটি ঘটনা আমার স্মরণ আছে। নবকুমারের ও ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় আসিয়া চাঁপাতলাতে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া কিছু কাল ছিলেন। সেই সময় একদিন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন—"আমাদের পাশের বাড়ীতে একটি ছেলে মারা গিয়াছে, বাড়ীর লোক, পুরুষ স্ত্রী লোক, মিলিয়া কয়দিন কাঁদিতেছে। দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস না থাকলে মানুষের কি দশা হয়! আমি ওঁদের বাড়ীর পুরুষদিগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে বললাম, আপনারা ত পরকাল মানেন, একজন মঙ্গলকর্ত্তা আছেন তাও ত মানেন, তবে এতদিন ধরে এত কান্নাকাটি কেন করেন? তাতে তাঁরা পুনর্জ্জন্ম ও শাস্ত্রের কথা তুলেন; আমি বললাম আমি মূর্খ মানুষ, শাস্ত্র টাস্ত্র জানি না, এই বলে পালিয়ে এসেছি, তুমি শাস্ত্র জান, তুমি কি শাস্ত্রের বচন টচন তুলে ওঁদিগকে বুঝিয়ে দিতে পার, অতিরিক্ত শোক করা ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে উচিত নয়?" আমি বললাম,—"ওঁরা যখন তর্ক তুলেছেন তখন বুঝাতে যাওয়া বৃথা।" বুঝাইতে আর যাওয়া হইল না! আমি এই সাধুপুরুষের ভাব দেখিয়া মনে মনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঘরে আসিলাম।

নবকুমার ও ইন্দু চলিয়া গেলে জননীর নিকট কৃষ্ণনগরের বাড়ী শ্মশানসমান হইল। তিনি কৃষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হইলেন। যেন জীবনের

সকল স্বাদ আহ্লাদ কে হরণ করিয়া লইল। কোথায় গেলে ইন্দু নবকুমারের সন্ধান পান, যেন মন সেইজন্য ব্যগ্র হইতে লাগিল। আর তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে রাখা ভার হইল। ওদিকে কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ আবার বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬৯ সাল হইতে কৃষ্ণনগরের যুবরাজের যে অভিভাবকতা করিতে ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৯ সালে সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৭৯ সালে লাহিড়ী মহাশয় শোকে ভগ্ন ও রোগে জীর্ণ পরিবার পরিজনকে লইয়া যখন কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদের অবস্থা বর্ণনাতীত। গৃহে অগ্নি লাগিলে মানুষ যেমন সে গৃহ হইতে ছুটিয়া পলায়, কোথায় দাঁড়াইবে তাহা জানে না, তেমনি তাঁহারা যেন কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়া আসিলেন, কোথায় দাঁড়াইবেন তাহা জানেন না। লাহিড়ী মহাশয়ের পেনশনের সামান্য ৭৫টি টাকা মাত্র তখনকার সম্বল, তাহাতে আর কত চলে। তৎপরে এত বৎসর ধরিয়া বিপদের উপরে বিপদ হইতেছে, একটা ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আর একটা আসিতেছে, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে তখন তাঁহাদের কি অবস্থা। কিন্তু চরিত্রের সম্পদ যাঁহার আছে তাঁহার অন্য সম্পদ আপনি আসে; জননী ক্রোড়স্থিত শিশুকে বরং পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু জগজ্জননী চরণাশ্রিত দীন ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই সাধু পুরুষের জীবনে তাহার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মন লইয়া সহরে আসিলেন বটে, কিন্তু এখানে তাঁহাকে অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধা দানে তৃপ্ত করিবার জন্য অনেক হৃদয় প্রস্তুত ছিল। তন্মধ্যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য, তাঁহার পুত্রাধিক, স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। বলিতে সুখ হইতেছে, লিখিতে হৃদয় শ্রদ্ধাভরে নত হইতেছে, ইনি আপনার গুরুকে পিতৃসম জ্ঞানে যাহা করিয়াছেন, সন্তানে তাহার অপেক্ষা অধিক করিতে পারে না। বহুকাল হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ব্ববিধ সাহায্যের জন্য ইঁহার হস্ত উন্মুক্ত হইয়াছিল। নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইয়া ইনি মাসে মাসে তাঁহার যাহা প্রয়োজন হইত জ্যেষ্ঠের ন্যায় যোগাইতেন; অনেক বিপদে লাহিড়ী

মহাশয়কে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সেই শোকার্ত্ত পরিবার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীচরণ বাবু স্বীয় ব্যয়ে বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে ইঁহাদিগকে স্থাপন করিলেন; এবং সর্ব্ববিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থে এত লোকের জীবন চরিত দিয়াছি ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত না দিয়া নিরস্ত থাকি কিরূপে? বলিতে কি এমন নীরব সাধুতা, এরূপ ধর্ম্মভীরুতা ও এরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই সকল মানুষ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের গৌরব! শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাম যে দেশে সম্মানার্হ হইয়াছে তাহা এইরূপ মানুষদিগকে দেখাইতে পারা যায় বলিয়া।

কালীচরণ ঘোষ

১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। দুই বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়; এবং ৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। ইঁহার পিতা, গদাধর ঘোষ, গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুদের সরকারে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহাদের চারি সহোদরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইঁহার পিতৃব্য শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের উপরে পড়ে। ৮ বৎসর বয়সের সময় হইতে দ্বিতীয় সহোদর অম্বিকাচরণ ঘোষের সহিত ইনি বিদ্যা শিক্ষার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। অম্বিকাচরণ অল্পকালের মধ্যে কৃষ্ণনগর কালেজের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়া উঠেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সুবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তের সহাধ্যায়ী ও সমকক্ষ ছিলেন। এই দুই জনে এমনি প্রীতি ছিল যে, কৃষ্ণনগরে জনশ্রুতি আছে যে, যে দারুণ বসন্ত রোগে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয় সেই রোগের মধ্যে যুবক উমেশচন্দ্রের অভিভাবকগণ যাহাতে তিনি পীড়িত বন্ধুর নিকটে না যান সেই জন্য তাঁহাকে ঘরে দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু উমেশচন্দ্র ঘরের চাল ফুঁড়িয়া পলাইয়া গিয়া অম্বিকাচরণের সেবা করেন। এই ঘটনা তখনকার এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বীটন (বেথুন) সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি ইহার উল্লেখ করিয়া উমেশচন্দ্রকে প্রকাশ্য সভাতে প্রশংসা করেন।

১৮৫০ সালে ২০ বৎসর বয়সে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর পর কালীচরণ কৃষ্ণনগর কালেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৭৫ সালে সেখান হইতে সিনিয়র বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে আসেন। ১৮৬০ সালে বি. এল. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ওকালতী কাজ তাঁহার ভাল লাগিল না, তাই সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬১ সালে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে পদোন্নতি হইয়া নানাস্থানে বাস করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতার উপনগরে আলিপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। সম্মানের সহিত

এখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নড়াইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ প্রেরিত হন। সে কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ সালে আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ১৮৮২ সালে কলিকাতার হ্যারিসন রোড ও খিদিরপুরের ডকের জমি কিনিবার ভার তাঁহার উপরে পড়ে। এ কার্য্য তিনি দক্ষতা সহকারে নিষ্পন্ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাভাজন হন। বিষয় কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া ১৮৯২ সালের এপ্রেল মাসে তিনি পেনশন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; এবং কলিকাতাতে বাস করিতে থাকেন। পেনশন লওয়ার পর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। ১৮৯৪ সালের ৩রা মে দিবসে কলিকাতার বাটীতে হৃদ্রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামখানা ত এই গেল। কিন্তু তিনি কি মানুষ ছিলেন তাহা সংক্ষেপে বলিবার নহে। তাহা দেখিয়া আমরা সর্ব্বদাই বলিতাম উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। পাঠদ্দশাতেই বারাসতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের কন্যা কুন্তীবালার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহের ঘটক ছিলেন; তিনিই কৃষ্ণনগরে গিয়া পাত্র দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুন্তীবালার অল্পবয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। তখন নবীনকৃষ্ণের ভ্রাতা বঙ্গসমাজে জ্ঞান ও সাধুতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের প্রতি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে। কালীকৃষ্ণ বাবু নিজে যত্নপূর্ব্বক কুন্তীবালাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! সুখের সমুদয় উপকরণ যখন বিদ্যমান, তখন এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া ১৮৬৯ সাল হইতে চিরজীবনের জন্য কালীচরণ বাবুর পারিবারিক সুখ বিনষ্ট হয়। ঐ সালে অকালে এক পুত্র হারাইয়া কুন্তী উন্মাদ-রোগগ্রস্তা হন। তদবধি কালীচরণ বাবুর গৃহ শান্তিহীন হইয়া যায়। উন্মাদ-রোগগ্রস্তা পত্নীকে লইয়া প্রাণভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস করিতে হইত। তখন হইতে তাঁহার যে ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে।

আর একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখিবার যোগ্য। তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহৃদয়তা। একদা কুন্তী তাঁহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গোঁ ধরিলেন যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবেন না। অন্যে আহার করাইতে গেলে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অন্নের গ্রাস লইতেন না। এই সংবাদ যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে গেল, তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তা আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেয়ে মারা যাবে, আমি দু'বেলা গিয়া খাওয়াইয়া আসিব।" তিনি সত্য সত্যই কয়েক মাস ধরিয়া দু'বেলা আসিয়া কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন। আমরা ইহা দেখিয়াছি। ইহা মিত্র পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ সুযোগ্য

জামাতা কালীচরণের প্রতি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক মাত্র।

পত্নীর উন্মাদরোগ-প্রাপ্তির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কালীচরণ বাবু কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। আহারে বিহারে পোষাকে পরিচ্ছদে, কেহ তাঁহাকে বিলাসের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে দেখে নাই। কেবল জ্ঞান-চর্চ্চা, সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

একদিকে কালীচরণ বাবু অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, দুই জনেই এই সময়ে ভগ্ন লাহিড়ী পরিবারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইঁহারা কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতনু বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারকে ডাকিয়া মেট্রপলিটান কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাগিল। পুত্রের সাহায্যে কলিকাতাতে ইঁহাদের দিন একপ্রকার চলিতে লাগিল।

আর এক সাধু পুরুষের নাম এই খানেই উল্লেখ করা উচিত। ইনি সে সময়কার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইঁহার নাম শ্যামাচরণ (দে) বিশ্বাস। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সম্মুখেই ইঁহার ভবন; সুতরাং প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইঁহার ভবনে সর্ব্বদা গমন করিতেন। সেখানে প্রায় প্রতিদিন এই সকল মহাজনের একটি সুহৃদ্‌গোষ্ঠির অধিষ্ঠান হইত। শ্যামাচরণ বাবু নিজে সাধু, সদাশয়, সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী ও অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে সকলেই ভাল বাসিত। এমন কি আমরা তখন কালেজের ছেলে, আমরাও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। তিনি কিরূপে স্বীয় ভ্রাতা বিমলাচরণ বিশ্বাসের গুরুতর ঋণভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া, নিজের উচ্চ বেতন ও পদ সত্ত্বেও, চিরদিন টানাটানির মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ন্যায় যুবকগণের আদর্শ স্থল ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর সহিত গভীর প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময় যখনি তিনি কলিকাতায় আসিতেন তখন আর কোথাও থাকুন না থাকুন, বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে দুই চারিদিন বাস করিতেন। অন্যত্র থাকিলেও প্রতিদিন একবার সে ভবনে পদার্পণ করিতেন। সে ভবন তাঁর নিজের ভবনের ন্যায় ছিল। সে কেবল শ্যাম বাবুর সহৃদয়তার গুণে। যে সহৃদয়তা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়কে সেবা করিয়া আসিয়াছিল, সেই সহৃদয়তা তাঁর কলিকাতায় আসার পরে যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। লাহিড়ী মহাশয় সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাঁহাদের বন্ধুতা লাভ করিয়া আপ্যায়িত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ বিশ্বাস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

আর একজন বঙ্গসমাজের রত্নস্বরূপ ব্যক্তির সদাশয়তা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই সময় বঙ্গবাসীর সুপরিচিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সময় নাই, অসময় নাই, এই পরিবারের, বিশেষতঃ লাহিড়ী মহাশয়ের, কোনও অসুখের কথা শুনিবামাত্র নিজ শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা গণনা না করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত এই অকৃত্রিম প্রীতি ও সদ্ভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

লাহিড়ী মহাশয়কে কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া কালীচরণ বাবু কয়েক বৎসরের জন্য নড়াইলের জমিদার পরিবারের ম্যানেজার হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। শরৎকুমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু ত্বরায় তাঁহাকে সেই সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহাকে বৃদ্ধ পিতার চিন্তাভার লঘু করিবার উদ্দেশে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিজ কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং নিজের শ্রম, মিতব্যয়িতা ও সততার গুণে সবিশেষ উন্নতি করিয়া তুলিলেন ; তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিলেন সে সময় গুরুতর আভ্যন্তরীণ বিবাদে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সামান্য উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইলে, অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র হন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের মে মাসে ঐ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ ও নব নব কার্য্যের উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় কোনও দলের মানুষ ছিলেন না। চিরদিন তিনি দলাদলির বাহিরে থাকিয়া যেখানেই অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়াছেন সেই খানেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহাকে অসত্য বা অন্যায় মনে করিতেন তাহার প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার প্রকৃতিগত উদারভাবে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার ভাব ব্যক্ত করিতে ক্রুটি করিতেন না। তাঁহার তৎকালীন দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন যে, একদিন তিনি "ভারতাশ্রমে" বেড়াইতে গিয়া, কেশব বাবুর গৃহিণীর সমক্ষেই উক্ত বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়া, হয়ত কেশব বাবুর পত্নীকে ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন।

লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিয়া যে সকল ব্রাহ্মসমাজের নব

আন্দোলনের মধ্যে পড়িলেন, তাহা নহে। ইঁহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় তাঁহার কলিকাতা আসিবার সমকালেই পঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাট্স্কি আসিয়া বোম্বাই সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থিওসফিকাল সোসাইটি স্থাপন করেন। প্রাচীন হিন্দুভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা উক্ত উভয় সভার লক্ষ্য হওয়াতে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বিষয়ে দেশের সর্ব্বত্রই আলোচনা উপস্থিত হয়। এই আলোচনার তরঙ্গ ক্রমে আসিয়া বঙ্গদেশকে অধিকার করে।' এখানে কোনও কারণে হিন্দুসংবাদ-পত্র "বঙ্গবাসী" ও ব্রাহ্মসংবাদ-পত্র "সঞ্জীবনী" এই উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটনা হইয়া বঙ্গবাসীর পরিচালকদিগের প্রযত্নে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন উঠে। প্রধানতঃ তাঁহাদেরই উদ্যোগ ও প্রয়াসে, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি কয়েকজন সনাতনধর্ম্ম-প্রচারক কলিকাতাতে পদার্পণ করেন; এবং নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের উত্তরে ব্রাহ্মসমাজের দিক হইতেও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে মহা বাক্যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধ ক্রমে মফস্বলেরও নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের স্রোত এখনও চলিয়াছে, এবং দেশের লোকের মনে স্বদেশীভাবকে জাগ্রত করিয়াছে। ইহার পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া সনাতনধর্ম্মের পুনরুত্থানের ভাবকে আরও প্রবল করিয়াছেন।

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাবে ধীর স্থির থাকিয়া কলিকাতাতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার একজন অনুগত শিষ্য একদিন বলিলেন—"তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সত্যই তাঁর ঈশ্বর'। ঠিক কথা, সত্যকে তিনি ঈশ্বর জানিয়া সেবা করিতেন। জানিতেন, সত্য-পরায়ণতা মানবের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যেখানে সত্য সেইখানেই ঈশ্বর। তিনি কি ভাবে সত্যের অনুসরণ করিতেন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :—

একদিন গিয়া দেখি লাহিড়ী মহাশয়ের মন যেন উত্তেজিত। কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন—"দেখ, আমার বোধ হয় পরোক্ষভাবে পাপী হচ্ছি।" প্রশ্ন—"ব্যাপারটা কি?" উত্তর—"আমাদের বাড়ীতে পীড়া আছে, মুরগী টুরগী সর্ব্বদা রাঁধতে হয়, আমি আশ্চর্য্য মনে করি আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ তা রাঁধতে আপত্তি করে না; কিন্তু সে যে বাহিরে অন্য লোকের কাছে তাহা স্বীকার করে তা বোধ হয় না, হয়ত মিথ্যা কথা বলে। আমরা ঐ গরীব লোককে প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা বলাচ্ছি, এতে কি আমরা পাপী নই?" উত্তর—"বাহিরের লোকের কার বা মাথা ব্যথা পড়েছে যে, আপনার বাড়ীর ভিতরে কি রাঁধে না রাঁধে তার খবর লয়। আপনার যদি মনে

এতই বাধে তা হলে অন্য জেতের রাঁধুনী রাখতেই পারেন।" উত্তর—"আমি ত তা রাখতে চাই, গৃহিণীর জন্য পারি না।

উত্তরপাড়া স্কুলে তিনি যখন হেডমাষ্টার তখন তাঁহার চাকরাণী একদিন শিশু নবকুমারকে ভুলাইবার জন্য বলিল—"থাম, থাম, মিঠাই দিব," এই বাক্যে শিশু থামিল। কিন্তু বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গিয়া চাকরাণীর হাতে পয়সা দিয়া বলিলেন, "তুমি যখন মিঠাই দেব বলেছ তখন মিঠাই এনে দিতেই হবে, তা না হলে ছেলে মিথ্যে বলতে শিখবে!" এই বলিয়া চাকরাণীকে মিঠাই আনিয়া দিতে বাধ্য করিলেন।

ভাগলপুর হইতে আর একজন বন্ধু আর একটি ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে লাহিড়ী মহাশয় তদানীন্তন প্রসিদ্ধ উকিল অতুলচন্দ্র মল্লিকের ভবনে সর্ব্বদা যাইতেন। এক দিন তিনি ভবনে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে মল্লিক মহাশয়ের ভৃত্য প্রভুর আদেশে তাঁহার নিজের জন্য গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিতেছে। লাহিড়ী মহাশয় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় ভৃত্যকে গুড়গুড়ি সরাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি অন্তর্হিত হইল। কিন্তু ঘটনাটি লাহিড়ী মহাশয়ের নেত্রগোচর হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিয়া মল্লিক মহাশয়কে বলিলেন—"তুমি তামাক কেন সরাইলে? যদি তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ কার্য্য মনে কর, কাহারও সম্মুখে খাইও না, আর যদি নিষিদ্ধ না মনে কর, সকলের সমক্ষেই খাইতে পার।" মনের কথাটি এই জগতের সহিত ব্যবহারে খাঁটি থাকিতে হইবে, রাখ ঢাক আবার কি।

ইহার অনুরূপ তাঁহার জীবনের আর একটি ঘটনা আছে, যাহাতে যুগপৎ তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর কলেজে কর্ম্ম করিবার সময় একদিন তাঁহার দেরাজ হইতে একটি জিনিস চুরি যায়। প্রথমে মধু নামক একজন ভৃত্যের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি মধুকে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু কলেজের লোকের নিকট সে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং মধুকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক দিন পরে, সে দ্রব্যটি ঘরের পাওয়া যায়। তখন লাহিড়ী মহাশয় মধুকে ডাকিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন—"মধু, অমুক জিনিসটি তুমি চুরি করিয়াছ মনে করিয়া আমি মনে মনে তোমাকে চোর ভাবিয়াছিলাম এবং অপরের নিকট সে কথা বলিয়াছিলাম, তুমি আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

ফলতঃ তাঁহার পরিবার পরিজনের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার শেষ দশায়, কলিকাতাবাস কালে, পরোক্ষভাবে অসত্য ও অসাধুতার প্রশ্রয় দেওয়া লইয়া সময়ে সময়ে মহা অশান্তি ঘটিত। একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে; তার হাব ভাব দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের বিরক্তি বোধ হইল, পরিবারদিগকে বলিলেন—"ওর স্বভাব চরিত্র

ভাল নয় ওকে কেন বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেও, ওর কাছে মাছ নিও না।" তাঁহারা হয়ত বলিলেন—"পয়সা দেব, জিনিষ নেব, তার স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?" কোনও লোক কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিয়া গিয়াছে, পরে যদি জানিতে পারিতেন যে, সে ঠকাইয়া গিয়াছে বা মিথ্যা বলিয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে আর গৃহে আসিতে দিতেন না বা তাহার নিকট কিছু লইতেন না। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলিত,—"জিনিসটার দর ত আমরা জানি, হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে নেওয়া যাক্, কে আবার বাজারে যায়।" তিনি বলিতেন,—"না, তা হবে না, ও অসৎ লোক, ওর সঙ্গে কারবার করা হবে না।"

আমাদের অনেকের চক্ষে এতটা করা বাড়াবাড়ি মনে হইতে পারে, কিন্তু সত্যপরায়ণতা যাঁর জীবনের মহামন্ত্র ছিল, চিরদিন সর্ব্বপ্রযত্নে যিনি সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

যাহা হউক, কালক্রমে তিনি বিবাদ বিসম্বাদের অতীত হইয়া, সর্বসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার এখন হইতে পিতার স্কন্ধের ভার নিজস্কন্ধে লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নবকুমারের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখিবার ভার তাঁহার উপরে পড়িয়া গেল। সহোদরসহোদরার মৃত্যু, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বার বার অস্বাস্থ্য, পরিবারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এইরূপ নানা [illegible] শরৎ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল. এ. পড়িবার জন্য [illegible]। কিন্তু সংসারের এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁহার কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু এ পদ গ্রহণ করিয়াও তিনি ত্বরায় অনুভব করিলেন যে, ঐ পদের যে স্বল্প আয় তাহাতে আর কুলাইতেছে না; সহৃদয় বন্ধুগণের উপরে বার বার ভার স্বরূপ হইতে হইতেছে। তখন তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ও বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার ভাল বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করা স্থির করিলেন, এবং ১৮৮৩ সালে ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যবসাতে বিশেষ উন্নতিলাভ হইবে এই আশায় তাঁহার পিতার অনুরক্ত ছাত্র ও চিরবন্ধু কোন্নগরের বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু তাঁহার উৎসাহদাতা হইলেন; এবং শরৎকুমার উক্ত ব্যবসায় এক বৎসর চালানর পর তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ণচন্দ্র বসুকে কিছু টাকা দিয়া ঐ কারবারের অংশীদার করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে লাহিড়ী মহাশয়ের নাম যে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন জানিয়া অনেক গ্রন্থকার ও অপরাপর লোক তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর

হইলেন। দেখিতে দেখিতে ইঁহাদের কারবার ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৮৫ সালের শেষে শরৎকুমারের বৈষয়িক অবস্থা এরূপ হইল যে, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালেজের কাজ পরিত্যাগ করিয়া কারবারে আপনার সমুদয় সময় দিতে সমর্থ হইলেন, এবং ১৮৮৭ সালে পূর্ণচন্দ্র বসুর অংশ ক্রয় করিয়া আপনি সমগ্র কারবারটির মালিক হইলেন।

এদিকে বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল বটে কিন্তু পরিবারে যে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আর থামিল না। লাহিড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার অনেক দিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। একটি বিশেষ ভাল বোধ হওয়াতে লাহিড়ী মহাশয় সপরিবারে [illegible] গিয়া কিছুদিন ছিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, [illegible] আবার প্রবল [illegible] প্রকাশ পাইল, [illegible] আবশ্যক হইল। [illegible] পীড়ার উপশম হইল না [illegible] ১৮৮৫ সালের [illegible] অকালে [illegible] হইল। সকলে [illegible] ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহারা [illegible] ফিরিলে [illegible] জন্য লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে [illegible] ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন [illegible] বলিলেন—"[illegible] উপর [illegible] সেই [illegible] কেন বল। এই [illegible] বল না [illegible] করেন সে কয়েকটি এখনও রাখিলেন [illegible] আমরা কি করিতে পারি! না বাঁচা তাঁহার জন্যই তাঁকে [illegible] নিকৃষ্ট মানুষ, জগতের সুখের উপরে আমার কি অধিকার [illegible]।"

এই স্বর্গীয় বিনয় তাঁহার প্রকৃতির একটি [illegible] জয়নগরের প্রথমোক্ত বন্ধুটি লিখিয়াছেন—"রামতনু [illegible] উত্তরপাড়া স্কুলের হেড মাষ্টার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে, আমাকে সেখানে ভর্তি করিবার প্রস্তাব হয়। আমার পিতা লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃৎ কে. এম. ব্যানার্জি মহাশয়ের পত্র লইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যান। বাবা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, কে. এম. বানার্জির পত্র লইয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রথমে মস্তকের উপরে রাখিয়া বলিলেন, "আমার গুরুর পত্র"। যিনি একজন সহাধ্যায়ীকে এত ভক্তি করিতে পারেন, তাঁহার বিনয়ের কথা কি বলিব।"

যাহা হউক, বিনয়কুমারের শোক ক্রমে পুরাতন হইল। শরৎকুমারের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত ভাল হইল। চিন্তার ভারটা লঘু হওয়াতে সকলেরই মন অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে লাগিল। ১৮৮৭ সালের প্রারম্ভে শরৎকুমারের বিবাহ হইল। জননী নব পুত্র-বধূর-

মুখ দর্শন করিয়া সন্তান শোক কিয়ৎপরিমাণে ভুলিতে লাগিলেন। যথা সময়ে, ১৮৮৯ সালে নববধূর এক কন্যার মুখ দর্শন করিলেন। কিন্তু হায়! জননী সে সুখ অধিকদিন সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার দশ বার দিন পরেই বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন।

জীবনের এতদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী যখন চলিয়া গেলেন, তখন বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার জন্য আরও দুঃখ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন।

যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রিয় বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ সালে তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার গর্ডন ইয়ং-এর সহিত বিবাদ করিয়া সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন উক্ত পদ ত্যাগ করার পর গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেকগুলি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থের আয় হইতে মাসে মাসে তিনি অনেক টাকা পাইতেন। যেমন আয় তেমনি ব্যয়—দুই হস্তে দান। নিজের জন্য তাঁহার যৎসামান্য ব্যয় ছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানের ন্যায় বাস করিয়াছেন। সে জন্য নিজের উপার্জ্জিত অর্থের অধিক ব্যয় হইত না। সখের মধ্যে পুস্তকের সখ ছিল। ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করা, উৎকৃষ্টরূপে বাঁধান ও সযত্নে রক্ষা করা, ইহা তাঁহার শেষ দশার একটা প্রধান কাজ হইয়াছিল।

১৮৬৬ সালে যখন মিস কার্পেণ্টর এদেশে আগমন করেন তখন তাঁহাকে লইয়া বালি-উত্তরপাড়ার কোনও বালিকা বিদ্যালয় দেখাইতে যাইবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। তদবধি তাঁহার পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিছুই ভাল করিয়া পরিপাক হইত না। তদবধি যে এত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তাহা কেবল মনের জোরে বলিলে হয়।

সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া ১৮৯১ সালের ২৮শে জুলাই ফুরাইয়া গেল। ঐ সালের ঐ দিবসে তিনি এলোক হইতে অবসৃত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া গেলে, লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয়ের আর এক গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে এতদিন ছিলেন, হঠাৎ সে বাহু কে সরাইয়া লইল! তিনি মুখে কিছু বলিলেন না; শোক প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু মর্ম্মস্থানে একটা শূন্যতা রহিয়া গেল। তাহা ত অনিবার্য্য! যৌবনের প্রারম্ভে যে বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, তাহা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ছিল; ইহা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অল্প বন্ধুতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার তীব্র বিচারে পার পাইয়া চিরদিন তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা, অধিক লোকের পক্ষে সম্ভব

হয় নাই। কিন্তু এই লাহিড়ী মহাশয়ের শিশু-সুলভ বিনয় ও বিশুদ্ধ সাধুতার পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

সাগরকূলে তীরদেশে জাহাজখানি একাধিক রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ থাকে; যে দিন অকূলে ভাসিবার সময় আসে সে দিন কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দেখা যায়, এক একটি করিয়া রজ্জুর বন্ধন উন্মোচন করিতেছে। ঐ একটি রজ্জু খুলিয়া লইল, লোকে বলিল—"এইবার জাহাজ ছাড়বে"। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটি খুলিল; আবার ধ্বনি উঠিল "এই ছাড়ে রে", কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটি খুলিল, তখন মানুষ উন্মুখ, এইবার অকূলে যাত্রা করিবার সময় আসিল। লাহিড়ী মহাশয়ের যেন সেই দশা ঘটিল! যে সকল রজ্জুদ্বারা তিনি আমাদের এই পৃথিবীর সহিত বাঁধা ছিলেন, বিধাতা একে একে সেগুলি খুলিয়া লইতে লাগিলেন, আমরা উন্মুখ হইতে লাগিলাম এইবার অনন্তধামে যাত্রা করিবার সময় আসিতেছে। অথবা বোধ হয় আমাদেরই ভুল! তিনি কোনও রজ্জুর দ্বারা আমাদের এ জগতের সহিত বাঁধা ছিলেন না। বাস্তবিকই তিনি পদ্মপত্রের জলের ন্যায় আমাদের এ পৃথিবীতে বাস করিতেছিলেন, তাহা না হইলে কি এখানকার সুখ দুঃখের এত অতীত হইয়া এরূপে বাস করা যায়?

সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া যাওয়ার অল্পদিন পরেই আর এক আঘাত আসিল। ঐ ১৮৯১ সালের ৭ই অক্টোবর দিবসে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। রামতনু বাবু আপনার সহোদর ভ্রাতাদিগকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। কনিষ্ঠের পীড়া হইলে তাঁহার মন অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, এ শোক সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে না; কিন্তু ঈশ্বর যখন প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইলেন, তখনও সেই ঈশ্বরেচ্ছাতে আত্ম-সমর্পণের ভাব, সেই অপরাজিত ধৈর্য্য। কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় কিরূপ সর্ব্বজনের প্রিয় ছিলেন তাহা অগ্রে বর্ণন করিয়াছি। সেই গুণধর সহোদরের বিয়োগ-দুঃখ কিরূপ তীব্র হইবার সম্ভাবনা, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের অন্তরে যাহাই থাকুক, এ শোকও তিনি জয় করিলেন। তাঁহার ধীর স্থির প্রশান্ত ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ ভাবের কিছুই ব্যত্যয় ঘটিল না। তিনি ধীরচিত্তে নিজের প্রস্থানের দিনের অপেক্ষায় রহিলেন।

অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা দারুণ আঘাত আসিল। তাঁহার প্রাণের প্রিয় কালীচরণ ঘোষও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে কালীচরণ যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অনুরক্ত পুত্রের ন্যায়, বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই কালীচরণ যখন চলিয়া গেলেন তখন লাহিড়ী মহাশয় নিশ্চয় মনে মনে বলিয়া থাকিবেন—"হে বিধাতা, এ

অধমকে আর কত দিন সংসারে রাখিবে?" আর বাস্তবিক লাহিড়ী মহাশয় সেই হইতেই যেন জরাজীর্ণ ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন।

দিন দিন পুত্র শরৎকুমারের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৯৫ সালে তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কলিকাতার হ্যারিসনরোডে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ পিতাকে স্থাপন করিলেন; দাস দাসীর দ্বারা পরিবৃত করিয়া দিলেন; পরিচর্য্যার অবশিষ্ট রহিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতী এবং পুত্রদ্বয়, শরৎকুমার ও বসন্তকুমার, সর্ব্বান্তঃকরণে পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। বধূমাতা তদ্গত-চিত্ত হইয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! আমাদের মনে হইত লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণ যেন কিছুতেই বসিতেছে না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া যেন কোন দেশে যাইতে চাহিতেছে। সর্ব্বদা বাড়ীর বাহিরে যাইতে চাহিতেন, যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে দেখিতে চাহিতেন, আমাদের কাহারও না কাহারও বাড়ীতে যাইতে চাহিতেন; মধ্যে মধ্যে প্রিয়াশিষ্য ক্ষেত্রমোহন বসুর বাড়ীতে গিয়া দুই এক দিন যাপন করিতেন; কিন্তু তাঁহার শরীরে বল ছিল না বলিয়া পরিবার পরিজন অনেক সময়ে যাইতে দিতেন না। তাহা লইয়া অনেক দিন বিবাদ উপস্থিত হইত।

বোধ হয় এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন যে, সচরাচর লোকে নিজের প্রতি অপর লোকের ব্যবহারের কি ত্রুটী হইল তাহাই দেখে। ঐ অমুক আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহায্য করিল না, অমুক আমার খবর লইল না, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু সাধুদের প্রকৃতি অন্য প্রকার; অপরের ব্যবহারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি তত নয়, যত নিজেদের ত্রুটীর প্রতি। আমি অমুককে দেখিলাম না, ঐ অমুকের খবর লওয়া হইল না, এই সময় অমুককে সাহায্য করা উচিত ছিল, করা হইল না, ইত্যাদি। রামতনু লাহিড়ীতে আমরা এই সময়ে তাহাই দেখিতাম। অনেক দিন গিয়াছে তাঁহাকে দেখা হয় নাই, অনুতপ্ত অন্তরে যাইতেছি, ভাবিতেছি যাঁহাকে প্রতিদিন দেখা উচিত তাঁহাকে এতদিন পরে দেখিতে যাইতেছি, মুখ দেখাইব কি করিয়া; কিন্তু যেই উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়াছি, অমনি, আর এক ভাব।—"ওহে দেখ, আমার কি অপরাধ হয়ে যাচ্ছে? মা লক্ষ্মীরা আমাকে এত ভালবাসেন, আমি যে একেবার গিয়া তাঁহাদিগকে দেখে আসবো, তা হয় না। তোমরা কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত তোমরা কি সর্ব্বদা আসতে পার! আমারই গিয়ে দেখে আসা কর্ত্তব্য।" মনে ভাবিলাম, হা হরি। উল্টো বিচার! একেই বলে শিষ্টতা! একেই বলে সাধুতা! ঠিক! ঠিক! যিনি পরের ভালটা ও নিজের মন্দটা দেখেন তিনিই সাধু।

লাহিড়ী মহাশয় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, তখনও তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের পূজিত দেবতাগুলির প্রতি সজাগ প্রেম। এই

সময়ে আমরা দেখা করিতে গেলেই তিনি একটা বিষয়ে দুঃখ করিতেন, হেয়ারের স্মৃতি কেউ ভাল করিয়া রাখিল না। বলিতে গেলে তাঁহারই প্ররোচনাতে হেয়ার এনিভার্সারি কিছু কাল উঠিয়া যাওয়ার পর আবার আরম্ভ হইল। তাঁহারই প্ররোচনাতে সিটী কালেজের তদানীন্তন সুযোগ্য অধ্যক্ষ ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কালেজের দীঘির মধ্যে হেয়ারের সমাধি মন্দিরের সন্নিকটে প্রতিবৎসর ১লা জুন দিবসে হেয়ারের স্মরণার্থ সভা আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ যাক না যাক বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়কে পালকী করিয়া লইয়া যাইতে হইত। আমরা [illegible] দেখিতাম একখানি চেয়ারে বা বেঞ্চে ভক্তিভাবে বসিয়া আছেন। [illegible] বাল্যকালে [illegible] কৃতজ্ঞতায় প্রাতিদ [illegible] উত্তর [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] কারণ, পরব্রহ্মে মানুষ [illegible] এই কৃতজ্ঞতা [illegible] হেয়ারের স্মরণার্থ [illegible] ছিলেন।

[illegible] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁহার [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁহাকে [illegible] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible] গৃহে [illegible] উপস্থিত [illegible] প্রাচীন ভাবে প্রাচীন [illegible] [illegible] দেবগণ [illegible] [illegible] করিলেন।

ইহার [illegible] ১৮৯৮ সালের প্রারম্ভে একদিন [illegible] হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। [illegible] হইতে হইল। ওদিকে জীবনের শক্তি দিন দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, [illegible] অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন; স্মৃতির বাতাস গড়িতে লাগিল; আমরা তাঁহাকে হারাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। অবশেষে ঐ সালের [illegible] আগষ্ট দিবসে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

"রামতনু লাহিড়ী চলিয়া গেলেন"—এই সংবাদ যখন সহরের লোকের কর্ণগোচর হইল, তখন সকল দলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের, লোক দ্রুতপদে শরৎকুমার লাহিড়ীর ভবনের অভিমুখে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে হ্যারিসন রোডে, শরৎকুমারের গৃহের সম্মুখে, জনতা! আমরা উপরে গিয়ে দেখি বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় চিরনিদ্রাতে অভিভূত আছেন। যে মুখ কতবার ভক্তিঅশ্রুতে সিক্ত বা ধর্মোৎসাহে প্রদীপ্ত বা পাপের প্রতি বিরাগে আরক্তিম দেখিয়াছি, সেই মুখ সেই মুহূর্তে সুপ্তমীন হ্রদের ন্যায়, অথবা মাতৃ-ক্রোড়ে নিদ্রিত শিশুর মুখের ন্যায়, নিরুপদ্রব শান্তিতে পরিপূর্ণ! চাহিয়া চাহিয়া রহিলাম, মনে হইল সেই দেবশিশু জগৎ-জননীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হায়! এ জীবনে কত মানুষ হারাইলাম, মানুষ আসে মানুষ যায়, সকল মানুষ ত মধুর স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে স্মৃতি রাখিয়া যান না! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়াছি যাঁহারা যাইবার সময় প্রাণে কিছু রাখিয়া গিয়াছেন,—যাঁহারা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তরাত্মা বলিয়াছে, "হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইয়াছিলাম, এমন মানুষ আর কি দেখিব!" সে দিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিলাম, আর ভাবিলাম এই সেই দলের একজন মানুষ গেলেন।

যথা সময়ে আমরা বহুসংখ্যক ব্যক্তি নগ্নপদে তাঁহার মৃত-দেহ বহন করিয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেদিন কি কেবল শরৎকুমার ও বসন্তকুমার পিতৃকৃত্য করিতে গেল? তাহা নহে; আমরা অনেকে পিতৃকৃত্য করিতে গেলাম। পথে আরও অনেক লোক জুটিল। জনতা দেখিয়া লোকে বলে—"কে যায়? কে যায়?"—উত্তর—"রামতনু লাহিড়ী যান?" অমনি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে একই বাণী—"যাঃ, দেশের একটা সাধুলোক গেল।" রোমের পোপ অনেক খ্রীষ্টীয় নর নারীকে সাধু উপাধি দিয়েছেন—ইঁহাকে সাধারণ লোকে "সাধু" উপাধি দিয়াছিল। ক্রমে আমরা শ্মশান ঘাটে পৌঁছিয়া তাঁহার নশ্বর দেহ চিতানলে অর্পণ করিলাম; অবিনশ্বর যাহা, তাহা অমৃতের ক্রোড়ে আশ্রয় অগ্রেই লইয়াছিল।

যথা সময়ে শরৎকুমার ও বসন্তকুমার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। যে মঙ্গলময় পুরুষের প্রতি লাহিড়ী মহাশয় জীবদ্দশায় অবিচলিত আস্থা রাখিয়াছিলেন, তাঁহারই অর্চনাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সভাস্থলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মিঃ কে. জি. গুপ্ত প্রভৃতি পরলোকগত সাধুর অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধস্থলে একজন বন্ধু আমাকে কানে কানে একটি চমৎকার কথা বলিলেন। তাহা এই—"ওরূপ চরিত্রের আলোচনা করিবার সময় ইহা দেখিতে হইবে অপরে তাঁহাদিগকে কি ভাবে দেখিয়াছে, তাঁহাদের কোন কোন বিষয় স্মৃতিতে রাখিয়াছে। ইঁহারা অধিক কিছু না করিলেও যে স্মৃতি রাখিয়া যান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ।" ঠিক কথা! ঠিক কথা! মহাজনের সহিত সামান্য মানবের তুলনাতে যদি অপরাধ না হয়, তাহা হইলে বলি, কোটি কোটি নরনারীর পূজিত বুদ্ধ বা যীশু জগতে কি কাজ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের কাজের কথা বলিতে গেলে দুই কথাতেই শেষ হয়। কিন্তু সেখানে তাঁহাদের মহত্ত্ব নহে; লোকে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া, তাঁহাদের কাছে বসিয়া, যাহা দেখিয়াছিল ও যাহা মনে রাখিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতি তেমনি শত শত হৃদয়ে রহিয়াছে। এইমাত্র প্রার্থনা সেই স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে বাস করুক ও আমাদের চক্ষের আলোক হউক।

অতিরিক্ত

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুর পত্র

১। ইংরাজী সন ১৮৫২ সালে রামতনু বাবু উত্তর পাড়ায় ইংরাজী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বর্দ্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যখন উত্তরপাড়ায় আসেন তখন তাহার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাকে বেশী বয়সের দেখাইত। ১৮৫৬ সালের শেষে এক বৎসরের অবসর লইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি সপরিবারে নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে ত্বরায় তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৮৫৮ সালে কলিকাতার দক্ষিণ রসা স্কুলের তিনি প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখান হইতে অল্প দিন মধ্যে তিনি বরিশাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। বরিশালে প্রায় এক বৎসর কাল থাকিয়া কৃষ্ণনগর কালেজের স্কুল বিভাগে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক বাসস্থান কৃষ্ণনগরে বাস করিতে লাগিলেন। এখান হইতে দুই বৎসরের অবসর লইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য ভাগলপুরে বাস করেন। সেই খান হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পেনশন পাইবার প্রার্থনা করেন। অভিপ্রায় ছিল শেষ জীবন ঐ নগরে অতিবাহিত করেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত বেলেডাঙ্গা নামক পল্লীতে যে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে বাস করিতেন। পরে ম্যালেরিয়া জ্বরের তাড়নায় ১৮৮০ সালে সপরিবার কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার লাহিড়ীর কলিকাতার বাড়ী প্রস্তুত হইলে তাহাতে দুই বৎসর বাস করিয়া তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

২। তিনি উত্তরপাড়ার স্কুলে নিযুক্ত হইবার পর নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সামান্য বেতনে ঐ স্কুলে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। রামতনু বাবুও তাঁহার অনুরূপ সহকারী পাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাঁহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। স্কুলের উন্নতি সাধন জন্য তাঁহারা দুইজনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ নাই। ঐ সময়ে স্কুলে প্রায় ২৫০ ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের

নাম, বাড়ী; অভিভাবক কে, তাঁহার অবস্থা কেমন, এ সকল সমাচার অল্প দিনের মধ্যে রামতনু বাবু অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন।

৩। আমরা যে কালে স্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটবল, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি খেলা ছিল না। কিন্তু অঙ্গ চালনার উপযোগী অন্য প্রকার খেলা অনেক ছিল। মুগকোট আর কপাটী বেশী চলিত। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে কিম্বা টিফিনের সময়ে স্কুল ভূমিতে খেলা হইতেছে দেখিলে রামতনু বাবু প্রায় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে হার জীতের মীমাংসা করিয়া দিতে হইত।

৪। উত্তরপাড়ার স্কুল বাটীর উপরতলে রামতনু বাবু থাকিতেন। নীচে স্কুল হইত। পাঠের সময় কোন ঘরের দরজা বন্ধ থাকিত না কিন্তু সকল কেলাশের পাঠ সুচারু রূপে চলিত। কোন কেলাশ হইতে একটু গোলমাল শব্দ তাঁহার কানে গেলে অমনি আপন স্থান হইতে উঠিয়া সেখানে যাইয়া দাঁড়াইবা মাত্র সব সুশৃঙ্খল হইয়া যাইত। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম থাকিত না। সমস্তক্ষণ সমভাবে মনযোগী থাকিতেন; স্কুলের বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর ভিতর রাখিতেন। স্কুলগৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেই বোধ হইত যে, এখানে একটি মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

৫। আহারের পর মানসিক চিন্তা অস্বাস্থ্যকর, এই জন্য স্কুল বসিলে ছাত্রদের প্রথমে হস্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন; এই সঙ্গে বানান শুদ্ধির কার্য্যও হইত। তিনি নিজে কি সুন্দর লিখিতেন, লেখার প্রত্যেক টান যেন তাঁহার অন্তর হইতে বাহির হইত। তাঁহার এত বয়স হইয়াছিল কিন্তু লিখিবার সময় কখনও হাত কাঁপিত না।

৬। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া আরম্ভ হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ আবৃত্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণ শুদ্ধি ও যতিচ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবৃত্তি করিতে হইত। তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে ত্রুটি করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাঁহার আবৃত্তি-গুণে আমাদের বোধ গম্য হইয়া যাইত। আবৃত্তির পর পাঠের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। শব্দের প্রতি-শব্দ বলিতে পারিলে ব্যাখ্যা হয় না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের অর্থ বলা হইত। তার পর প্রশ্ন দ্বারায় লেখকের ভাব ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের আনুষঙ্গিক যাহা কিছু থাকিত সে সমস্ত আলোচিত হইত। সময়ে সময়ে এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইত যে, অবশেষে চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে হইত আমরা কোন কোন পথ দিয়া পর্য্যটন পূর্ব্বক পাঠ্য বিষয় হইতে এত দূরে বিচরণ করিতেছি। এমন করিয়া পড়িতে গেলে বেশী পাতা শেষ হয় না।

৭। ছাত্রেরা যাহাতে আপন যত্নে শিখে, যাহাতে লেখাপড়ার প্রতি

তাঁহাদের সুরুচি জন্মে এবং যাহাতে তাহারা শিক্ষার ফল কার্য্যে পরিণত করিতে পারে এই সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন তোমাদের মনঃসিংহকে উত্তেজিত করিতে পারিলে আমার কার্য্য সফল হয়। পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত ইংরাজী কবি বরণ্‌স, কাউপর, টমসন এবং কাম্বেল হইতে কতগুলি সুন্দর ও সরল কবিতা বাছিয়া আমাদের পড়াইতেন। মিল্টন হইতে অনেক অংশ পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা যাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় যত্নশীল ছিলেন। যখন তিনি কোনও কবিতা আবৃত্তি করিতেন তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইত; এবং হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ হইত। তাঁহার সঙ্গে আমাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। কতদিন বোধ হইত টিফিনের ঘণ্টা বড় শীঘ্র বাজিয়া গেল। ছাত্রদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল। যেন সকলের মন সূত্রে গাঁথিয়া আপনার হাতের ভিতর ধরিয়া রহিয়াছেন। আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ এই শক্তির মূল। উত্তরপাড়ার স্কুলগৃহে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর ফলকে তাঁহার জনৈক ছাত্র অতি বিশদ ভাবে তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকাশিত করিয়াছেন।

৮। তাঁহার অধ্যাপনার অনুরূপ বিবরণ, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে বলিয়া সেই ছত্রগুলি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আরনল্ড সাহেবের জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"Every pupil was made to feel that there was work for him to do—that his happiness as well as his duty in doing that work well. Hence an indescribable zest was communicated to a youngman's feeling about life: a strange joy came over him on discovering that he had the means of being useful, and thus of being happy, and deep respect and ardent attachment sprang up towards him who had taught him thus to value life and his own self and his work and mission in this world. All this was founded on the breadth and comprehensiveness of Arnold's character as well as its striking truth and reality, on the unfeigned regard he had for work of all kinds, and the sense he had of its value both for the complex aggregate of society and the growth and perfection of the individual. রামতনু বাবুকে বঙ্গদেশের আরনল্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৯। ছাত্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সহিষ্ণু ছিলেন। যদি ছাত্র প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাঁহার শত দোষ ক্ষমা করিতেন।

কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না; বরং দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহার কথা মিথ্যা কিম্বা প্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে তাঁহার বিরক্তির সীমা থাকিত না।

১০। অধ্যাপনা এবং অধ্যয়ন যে কি গুরুতর কার্য্য তাঁহার অনুগ্রহে আমরা তখন যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তখন যে একটি শ্রেষ্ঠতম কার্য্যে আমরা নিযুক্ত ছিলাম এবং এই কার্য্য সম্পাদনের উপর আমাদের ভাবী জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিবে এই জ্ঞানও তাঁহার কৃপায় কতক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম।

১১। এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্ত্তমান ছিলেন। বারাসাতে প্যারীচরণ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোয়ালিয়াতে হরগোবিন্দ সেন এবং হাওড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইঁহারা রামতনু বাবু অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপনায় তাঁহারা কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন কি না তাহা সন্দেহ। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার বড় গুণগ্রাহী ছিলেন।

১২। রামতনু বাবুর অধ্যাপনা শ্রেষ্ঠতম হইবার আর একটি কারণ ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সর্ব্বদা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভের জন্য যে প্রকার অধ্যবসায় ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি জীবনের উৎকর্ষ সাধন জন্য ততোধিক করিতেন। নিরন্তর এই উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল; এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার এই আশার নিবৃত্তি হয় নাই।

১৩। হিন্দু কালেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কালেজে প্রথমে তিনি শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সমপাঠীরা বড় বড় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনিও ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের মত কার্য্য পাইতেন। কিন্তু স্বদেশে উত্তম শিক্ষকের কি গুরুতর অভাব তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে, তাহা মোচন করিবার জন্য ধন মানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন; এবং কায়মনোচিত্তে এই কার্য্য চিরজীবন করিয়াছিলেন।

১৪। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি অধ্যাপনার যে আদর্শ দেখাইয়া যান তাহার কিয়দংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

১৫। রামতনু বাবু দীর্ঘাকার কিম্বা খর্ব্বাকার পুরুষ ছিলেন না, যৌবনকালে বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অকালে তাঁহার শরীর শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের হাত টিপিয়া বলিতেন, baby bones! তাঁহার যৌবনকালের যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে না যে, ইহা তাঁহার ছবি, কারণ ঐ ছবিতে তাঁহার বদনমণ্ডল উপর নীচে লম্বা

দেখায়। কিন্তু আমরা কখন তাঁহার ওরূপ চেহারা দেখি নাই। আমরা যত দিন দেখিয়াছি তাঁহার মুখমণ্ডল গোলাকার দেখিয়াছি। চেহারার এত পরিবর্ত্তন অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে ঘটিয়াছে কি না বলিতে পারি না। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার একখানি ছাপার ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাকে যত স্থূলাকার দেখায় বস্তুত তিনি তত স্থূলাকার ছিলেন না।

১৬। শরীর রক্ষার জন্য তিনি সাতিশয় যত্নবান ছিলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেন ঈশ্বর যাহা কৃপা করিয়া দিয়াছেন তাহা অবহেলা করিয়া কেন হারাইব। এই যত্নের গুণে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং কোন প্রকার পীড়ায় কখনও কষ্ট পান নাই। আহারাদি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন এবং খাদ্য সামগ্রীর দোষ গুণ বিবেচনায় বড় বিচক্ষণ ছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল সবল ছিল। তাঁহার দাঁত একটি বই পড়ে নাই। শ্রবণশক্তি এমন সুশিক্ষিত ছিল যে, কোন শব্দের উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম হইলে বোধ হইত যেন তাঁহার কর্ণকুহরে আঘাত লাগিল। বৃদ্ধ বয়সে বালকের ন্যায় নিদ্রা যাইতেন। রাত্রিতে কেমন ঘুমাইয়াছিলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিতে হাসিতে বলিতেন একবারও পাশ ফিরিতে হয় নাই।

১৭। যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতেন কখন নিষ্কর্ম্মা থাকিতেন না ; কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। পত্র লেখা, Diary লেখা, অভ্যাগত বন্ধুগণের সহিত আলাপ করা, শিশুসন্তানদের সহিত খেলা এবং কাক ও চড়াই পাখীদের রুটীর টুকরো খাওয়ান, এমনতর একটা না একটা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। যদি কোনও কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইতেন তবে বন্ধুগণের বিষয় চিন্তা করিতেন। ৺রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহার সহিত গাঢ় হৃদ্যতা ছিল। শুনিয়াছি যে, রামগোপাল বাবুর মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত মহোদয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্মানার্থ যে সভা হয় তাহাতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে রামতনু বাবুর বক্তৃতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক নামক তাঁহার অন্য এক বন্ধুর উপর তাঁহার সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় দেখিতেন এবং তাঁহার শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না।

১৮। এত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বড় অমায়িক ভাব ছিল। তাহাদের নাম বাড়ী আর কি উপলক্ষে কোন স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এত সমাচার কি করিয়া তাঁহার মনে থাকিত বলিতে পারি না। একদিন দুই তিনটি ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাহাদের দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন তোমাদের চিনিয়াছি কিন্তু নাম মনে পড়ে না। তোমরা

বরিশাল স্কুলে কোন কেলাসে পড়িতে। তাঁহারা বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রায় ২৭ বৎসর পর তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

১৯। তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ থাকিত দেখিলে বোধ হইত যেন আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে, হৃদয়ে ধরে না। সাংসারিক বেদনা তাঁহার ভাগ্যে কিছু কম পরিমাণে পড়ে নাই। অভিভূত করা দূরে থাকুক উহা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। আমি দূরে থাকিলে আমাকে পত্র লিখিতেন; একখানি চিঠির কাগজ লইয়া তাহাতে প্রত্যহ খানিক খানিক লিখিতেন। চারি পৃষ্ঠা পূর্ণ না হইয়া গেলে পত্র ডাকে দিতেন না। এমন এক পত্রে এই সমাচার পাইলাম—Poor Nabacoomer died yesterday. পত্রখানি কয়েকদিন ধরিয়া লিখিতেছিলেন। একদিনের বিবরণে ঐ কথা লেখা ছিল। তাহার পর দুই একদিনের বিবরণ লিখিয়া পত্রখানি ডাকে দেন। নবকুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২০। ইংরাজি সাহিত্যের তিনি একজন উচ্চতর গুণগ্রাহী ছিলেন। ইদানীং নিজে পুস্তক পড়িতে পারিতেন না। পড়িয়া শুনাইলে বড় সুখী হইতেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পুস্তক তাঁহার নিকট আদরণীয় ছিল। কোন মহৎ ভাব অথবা অসাধারণ সাহস কিম্বা অধ্যবসায়ের বিবরণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত হইয়া বসিতেন, তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত; এবং সেই স্থানটি পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিতেন। সময়ে সময়ে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে, আর শুনিতে পারিতেন না, পাঠ কা বন্ধ করিতে হইত।

২১। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে এক দিন তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। সাক্ষাৎ করিতে গেলে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেন তাহা করিলেন না। দুর্ব্বলতা বশতঃ ঐরূপ কাতর হইয়াছিলেন। কি প্রকারে এ জড়তা আশু নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া আমেরিকার স্বাধীনতা সম্বন্ধে চ্যাটাম সাহেবের বিখ্যাত বক্তৃতার প্রথম বাক্যটি আবৃত্তি করিলাম। শুনিবামাত্র তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং পরবর্ত্তী দুই তিনটি বাক্য নিজেই আবৃত্তি করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন; পরে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ের কথা কহিয়া বিদায় দিলেন।

২২। রামতনু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বেলেডাঙ্গার বাটীতে কয়েকবার গিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ৺কালীচরণ লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয় ও তাঁহার মাতুলপুত্র ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেওয়ান মহাশয় দুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহারা কি অমায়িক লোক ছিলেন! চিকিৎসা সম্বন্ধে ও প্রদেশে কালীচরণ বাবুর এমন সুখ্যাতি ছিল যে, লোকে ভাবিত তাঁহার দর্শন পাইলেই রোগীর অর্দ্ধেক রোগ আরাম হইয়া যায়। দেওয়ান মহাশয় যেমন সুশ্রী ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন। অনেক

যত্ন সহকারে তিনি গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার গলাও বড় মধুর ছিল। অনুরোধ করিতেই তিনি গান শুনাইতেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার ন্যায় প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরল। কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺হরিতারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামতনু বাবুর একজন ছাত্র ও পরমবন্ধু ছিলেন। তিনি পুত্রের ন্যায় রামতনু বাবুর সমস্ত অভাব মোচন করিতে সাধ্যমত ত্রুটী করিতেন না। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। তিনি স্বর্গগত আনন্দভরে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

২৩। রামতনু বাবু কোন প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; এবং জীবনের প্রত্যেক কার্য্য তাঁহারই কার্য্য মনে করিয়া সম্পাদিত করিতেন। উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান অথবা সময় ছিল না। তাঁহার উপাসনার মর্ম্ম—

... ...But I lose
Myself in Him, in light ineffable!
Come then, expressive silence, muse His praise.

২৪। যখন উত্তরপাড়ার স্কুলে নিযুক্ত হন তাহার পূর্ব্বে তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে সামান্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। একদিকে পিতামাতা, কুটম্ব স্বজন এবং সমাজ, অপরদিকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম। দুই দিকেই গুরুতর টান। একটি টান ছিন্ন না করিলে আর রক্ষা নাই। এই সঙ্কটে পড়িয়া কোনদিক আশ্রয় করিবেন তাহা স্থির করিতে তাঁহাকে কি দারুণ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কারণ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সমাজবন্ধন অতিশয় দৃঢ় ও নিষ্ঠুর ছিল। কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহারে চুলমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে, তিনি অপর সাধারণ সকল লোকের বক্র দৃষ্টিতে পড়িতেন। এমন সময়ে কর্ত্তব্যের উপরোধে, পিতামাতা ও সমাজের টান ছিঁড়িয়া সর্ব্বত্র উপহাসাস্পদ হইয়া, কুটুম্ব স্বজনের চক্ষুঃশূল হইয়া এবং দাস দাসী বর্জ্জিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা, অসীম সাহসের কার্য্য তাহার সন্দেহই নাই। এমন সংগ্রাম সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহাদের ঘটে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া মৃতপ্রায় হইয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। অনেকে সন্ধি স্থাপন করিয়া কৃত্রিম শান্তি লাভে প্রবোধিত হন। অবশেষে অনেক মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিয়া রামতনু বাবু সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন। সত্যের এবং কর্ত্তব্যের জয় হইল, তিনিও শান্তিলাভ করিলেন।

২৫। যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা তাঁহার ইষ্টমন্ত্রের অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছিল। "Do what is right and leave the rest to God." এই মন্ত্রের উচিত কার্য্য তাঁহার জীবনের প্রতিপদেও সম্পাদিত হইত।

২৬। প্রকাশ্যে তাঁহার জীবন যেন একটি তরঙ্গ-শূন্য স্রোতস্বতী মৃদুমন্দ

গমনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কিরূপ দারুণ সংগ্রাম চলিয়াছিল, কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা অথচ সহিষ্ণুতা সহকারে, তিনি মনোবৃত্তি সকলের প্রশমন করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যের পথে প্রণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। অন্তরে এরূপ আলোড়িত হইয়াও, তিনি সর্ব্বদা বালোচিত আনন্দ ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে ধ্রুবতারার ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া, চির-জীবন ইষ্টমন্ত্রের সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

২৭। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার জীবনচরিতের সামান্য আভাস মাত্র। আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইঁহার মহত্বের সহস্রাংশের একাংশও বুঝিতে পারি নাই এবং যৎকিঞ্চিৎ যাহা অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহার শতাংশের এক অংশও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

২৮। যখন দেশে পুরাতন কুপ্রথা সকল তিরোহিত হইবে, যখন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সকল ঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, তখন **"we shall turn our eye again, and to more purpose, upon this passionate and dauntless soldier of a forlorn hope, who. * * * * * * * * * * * waged against the conservation of the old impossible world so fiery battle ; waged it till he fell,—waged it with such splendid and imperishable excellence of sincerity and strength."**

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু দাস
কলিকাতা, সন ১৩১০ সাল, ৩০এ কার্ত্তিক

FROM

AULD LANG SYNNE—SECOND SERIES

I C

BY THE RIGHT HON. PROFESSOR MAX MULLER :

RAMTONOO LAHIRI

Ramtonoo* was born in 1813, and must therefore have been older than Debendranath Tagore, who is generally considered as the Nestor of the Brahma-Samaj.

He was a pupil of David Hare, who had undertaken the philanthropic work of educating native youths, and after spending a few years at his school, he was admitted into the Hindu College at Calcutta, which was established in 1817 as the first fruit of the annual vote of £10,000 for educational purposes insisted on by the English Parliament. The teacher who chiefly influenced the youngmen was D. Rozario, who, though branded by the clergy as an infidel and as a devil of the Thomas Paine School, was worshipped by his pupils as an incarnation of goodness and kindness. It was Christian morality, as preached by D. Rozario, that appealed most strongly to the heart of Ramtonoo and his fellow-pupils, many of them very distinguished in later life the fathers and grandfathers of the present generation of Indian reformers. Ramtonoo became a model among his friends in all matters pertaining to morality and conscience, penitence and sincerity being the watchwords of his early career, vice and hypocrisy the constant objects of his denunciation, both among his equals and among those of higher rank and authority. Even the founder of the Brahma-Samaj did not escape his reproof, on account of what he considered want of moral courage to act up to his convictions. As to himself, he denounced caste as a great social and moral evil, and silent submission to superstitious customs as reprehensible weakness. In order to shame those who denounced beef-eating as sinful, he and his friends would actually parade the streets with beef in their hands, inviting the people to take it and eat it. The Brahmanical thread which was retained by the members of the Brahma-Samaj as late as 1861, was openly discarded by him as early as 1851. And we must remember that in those days such open apostasy was almost a question of life or death, and that Rammohun Roy was in danger of assassination in the very streets of Calcutta. It is true that European officials respected and supported Ramtonoo, but

---

*Ramtonoo is probably meant for Ramtanu, body of Rama, but when a name has once become familiar in the modern Bengali form, I do not always like to put it back into its classical Sanskrit form.

among his own countrymen he was despised and shunned. However, he continued his career undisturbed by friend or foe, and guided by his own conscience only. Poor as he was, he desired no more than to earn a small pittance as a teacher in public and private schools. Later in life he was attracted to the new Brahma-Samaj, and became a close friend of Keshub Chunder Sen. When he saw others who spent much time in prayer he considered them as the most favoured of mortals, for pure and conscientious as he was, he felt himself so sinful that he could but seldom utter a word or two in the spirit of what he considered true prayer before the eyes of the Lord. While cultivating his little garden he was found lost in devotion at the sight of a full-blown rose and while singing a hymn in adoration of God, his whole countenance seemed to beam with a heavenly light. One of his friends tells us that one morning early he rushed into his room like a mad man and dragged him out of bed, saying that when the whole nature was ablaze with the light and fire of God's glory, it was a shame to lie in bed. He took the sleeper to the next field, and pointing his fingers to the rising sun and the beautiful trees and foliage, he recited with the greatest rapture—what ? Not a hymn of the Veda but some verses from Wordsworth When his end approached, his old friend Debendranath Tagore went to take leave of him, and when he left him, he cried : "Now the gates of heaven are open to you and the gods are waiting with their outstretched arms to receive you to the glorious region." Did not ld Vedantist really say "the gods" ? I doubt it, unless he used the language of Maya, as we also do sometimes, knowing that his friend would interpret it in the right sense. I see, however, that Mozoomdar also speaks of his spirit reposing in his God—showing how the old habits of thought and old words cling to us and never lose their meaning altogether.

Many more names might be mentioned, but to us they would hardly be more than names Debendranath Tagore is the only one left who could give us a history of that important religious movement in India, and of the principal actors in it. But he is too old now to undertake such a task. The others, to use the language of their friends, have, like the stars that rise in the Eastern sky, after completing their appointed journey, sunk below the visible horizon of death, to pass from the hemisphere of time to that of eternity ! But though their names may be forgotton their good works will remain for "Good deed," as they say in India, "never dies."

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী

নির্ঘণ্ট